ছেঁড়া তার

ছেঁড়া তার

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ — ১৯৬৩

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১৩৮, বিধান সরণী

কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ

দেবাশীষ রায়

সারা বিকেলটাই আজ প্রায়নির্জন বাংলোর বারান্দায় বসে ছিল ঋতি। সময়ের চিহ্নলাঞ্ছিত কাঠের ইজিচেয়ারটায়। শুভময়ের এখানে এলে তার আর কাজই বা কী। হয় পড়ে পড়ে গড়াও বিছানায়, নয় বাংলোর হাতায় এলোমেলো ঘোরো, কিংবা রাস্তা টপকে ঝলক দেখে এস সরু নদীটাকে। অথবা গালে হাত দিয়ে ঠায় বসে থাক। ক্বচিৎ কখনও অন্য কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের বউ টউ এসে শুভময় মৈত্রর কলকাতাবাসী গৃহিণীর সঙ্গে খানিক গল্পগাছা করে গেল, তো সে উপরি পাওনা। এখানে কাগজ কলমও ছাই ছুঁতে ইচ্ছে করে না ঋতির, মাথাটাই কেমন ভোম মেরে থাকে যেন।

আজ ঋতি বসে বসে দেখছিল, কেমন করে ফুরিয়ে আসে দিন। কিংবা বলা যায় তার চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল দিনটা। একটু আগেও ফুটে ছিল একটা নরম বিকেল, হলুদ আলো দোল খাচ্ছিল পাতায় পাতায়, সোনালি রোদ্দুর তিরতির কাঁপছিল সবুজ ঘাসে। তারপর সূর্য রং বদলাল। সে ডুবে যাওয়ার পরও পশ্চিম আকাশে হালকা গোলাপি আভা লেগে রইল কিছুক্ষণ। আকাশ বিবর্ণ ক্রমশ। পাখিরা ফিরছে বাসায়। বাংলোর নৈঃশব্দ্য ভেঙে গাছে গাছে এখন তাদের অনন্ত কিচিরমিচির। পাতলা কুয়াশা মেখে এক্ষুনি ঝুপ করে নেমে আসবে অন্ধকার, ঋতি জানে। এসব মুহূর্তে বুকটা কেমন ভারী হয়ে আসে ঋতির। ভাল লাগে না কিছু। কান্না পায়। কেন যে পায়?

কাঠের গেটে শব্দ। শুভময় ফিরল কোর্ট থেকে। সঙ্গে খাসপিওন ভবানী। কাঁধে ঝোলাব্যাগ, হাতে শুভময়ের ব্রিফকেস। দেহরক্ষীটি কোথায়? বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল না তো! নাকি শুভময় তাকে আগেই ছেড়ে দিয়েছে আজ?

মোরাম বিছনো পথটুকু মন্থর পায়ে পেরিয়ে এল শুভময়। একটু-বা ঝুঁকে। কুঁজো হয়ে। ধাপিতে পা রেখে থামল। গলা ঝেড়ে বলল, —গায়ে একটা চাদর জড়াওনি কেন?

ঋতি আলগা ভাবে বলল, —শীত তো নেই তেমন।

—তা হোক, বছরের এই সময়টাতে কিন্তু হুট করে ঠান্ডা লেগে যায়।

উদ্বেগটা কি আন্তরিক? নাকি বলতে হয় বলে বলা? কথা খুঁজে নেওয়া? শুভময়ের সুরটা ধরতে পারল না ঋতি। বলল, —আমার অত পুতুপুতু শরীর নয়।

ভবানী ব্রিফকেস রাখতে ঢুকে গেছে ভেতরে। শুভময় উঠে বারান্দাতেই বসল। বেতের চেয়ারে। নিচু হয়ে জুতো ছাড়ছে।

ঋতি আড়চোখে দেখছিল শুভময়কে। জিজ্ঞেস করল, —আগে চা খাবে? না হাতমুখ ধুয়ে?

—আগেই খাই।

—আজ একটু বেশি টায়ার্ড মনে হচ্ছে?

—হুম্। গোটা বারো হিয়ারিং ছিল। লাস্ট কেসটায় তো ফসল কাটার লাঠালাঠি নিয়ে টানা চল্লিশ মিনিট ডিপোজিশান। এজলাস থেকে নামতে না নামতেই একগাদা অফিসের কাজ। এর এটা ফরোয়ার্ড কর, বিল সই ... মাথা ধরে গেছে।

—অফিসের কাজগুলো কাল সকালে করতে পারতে।

—ফেলে রাখব? চেয়ারে হেলান দিয়ে শুভময় চুলে আঙুল চালাল, —যাক গে, তোমার কেমন কাটল বলো?

—মন্দ কী। যেমনটা আশা করেছিলাম, সেরকমই।

ব্যঙ্গটা কি বুঝল শুভময়? এসব সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কি শুভময়ের আর আছে আদৌ? ঋতির তো মনে হয় না। ভাবতে তার অবাক লাগে একসময়ে এই মানুষটার প্রেমে সে হাবুডুবু খেয়েছে। ছ্যাবলা চ্যাংড়া না হলেও শুভময় যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল, ঠাট্টা-ইয়ার্কি বুঝত, হাসত, রসিকতা করত, আর এখন মাত্র বিয়াল্লিশেই কেমন বুড়োটে মেরে গেছে। সর্বক্ষণই গোমড়া, সারাক্ষণই ভাবিত। দুঃখ মনোবেদনা যেন আর কারও নেই! তার জন্য জীবনের সমস্ত স্বাভাবিকতাকে বিসর্জন দিতে হবে?

ঋতি আর কথায় না গিয়ে অন্দরে এল। ব্রিটিশ আমলের বড়সড় বাংলো, ভেতরটাও বেশ ছড়ানো ছেটানো। তিন তিনখানা পেল্লাই ঘর, খাওয়ার জায়গা, কিচেন, স্টোররুম, পিছনে আর একটা বারান্দা, উঠোন, সারভেন্টস কোয়ার্টার, পাহারাদারের ডেরা— রীতিমতো সুচারু বন্দোবস্ত। উলুবেড়িয়া, মাথাভাঙা, রামপুরহাট, কালিম্পং, কোথাওই আগে এমন বাংলো পায়নি শুভময়। পাওয়ার কথাও নয়। মহকুমার বিচারবিভাগীয় প্রধান হয়ে এই তার প্রথম পোস্টিং। উলুবেড়িয়াতে তো কলকাতা থেকেই যাতায়াত করত, বাকি

সর্বত্রই হয় বাড়ি ভাড়া করে থাকা, নয় সরকারি কোয়ার্টার। তুলনা করলে এ তো স্বর্গপুরী।

রতন রান্নাঘরে। ভবানীও। দুজনে কথা বলছিল গলা নামিয়ে। ঋতিকে দেখেই দুজনে তটস্থ, থেমে গেছে বাক্যালাপ। রতনকে অবশ্য চায়ের কথা বলতে হল না, সে আগেই গ্যাসে চড়িয়ে দিয়েছে কেটলি। নিজেও একটু চা খাবে ঋতি। খায় এ সময়ে। তবে শুভময়ের মতো তার দুধ চিনির হ্যাঙ্গাম নেই, সে খায় প্লেন লিকার। গরম জলে চা-পাতাটুকু থাকলেই হল।

ভবানী বেরিয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে। হাত কচলাতে কচলাতে বলল, —শুনলাম কালই আপনি চলে যাচ্ছেন ম্যাডাম?

—হুঁ। ঋতি অল্প হাসল, —কলকাতায় কাজকর্ম তো আছে।

—এবারও কি গতবারের মতো ... পাঁশকুড়া হয়ে ... ট্রেনে ...?

—ভাবছি। ... এখান থেকে কলকাতায় ডাইরেক্ট একটা ভাল বাস চালু হয়েছে শুনলাম?

—খুবই ভাল বাস ম্যাডাম। মহানন্দা। লাক্সারি কোচ। পাঁশকুড়া ছাড়া কোথাও স্টপেজ নেই, আড়াই ঘণ্টায় ধর্মতলা পৌঁছে দেবে।

—তাই? মাত্র আড়াই ঘণ্টা?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। চড়ে খুব আরাম পাবেন, আর কোনও দিন ট্রেনে যেতে ইচ্ছে করবে না। বছর পঞ্চাশ বাহান্নর ক্ষয়াটে চেহারার লোকটা বিনয়ে গদগদ, —ঠিক সকাল সাতটায় ছাড়ে ম্যাডাম। আমি আপনাকে একেবারে বাসে বসিয়ে দিয়ে আসব।

তার মুখ থেকে হ্যাঁটুকু শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে ভবানী। ঋতি হেসে ফেলল, —আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

রতন চা ভেজাচ্ছে। ফুটন্ত জলে চামচ নাড়তে নাড়তে কর্তৃত্বের সুরে বলল, —দেখ ভবানীদা, পেছনের সিট যেন না হয়। ম্যাডামের ঝাঁকুনি লাগবে।

—সে কি আমি জানি নাকো? বলে দিতে হবে?

—আহা, চটো কেন ভবানীদা? তোমার যে আক্কেল বলে কিছু নেই, এ কথা তল্লাটের কে না জানে! রামকে ডাকতে বললে তুমি শ্যামাকে এনে হাজির কর। আগের সাহেবের কাছে তো তুমি উঠতে বসতে গাল খেতে।

—ভাল হবে না বলছি রতন। আমার সম্পর্কে উল্টোসিধা বলবে না।

খুনসুটি বেধে গেছে। হাসি চেপে ঋতি সরে এল। বারান্দায় ফিরে দেখল

শুভময় স্থির বসে এখনও। মাথার ওপর একটা কালচে ধোঁয়ার বলয়। আওয়াজ হচ্ছে পিনপিন।

হালকা বিরক্তির সুরে ঋতি বলল, —ওফ্, মশা বটে এখানে!

শুভময় কী যেন ভাবছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, —উঁ?

—বলছি, তোমার গায়ে চামড়া টামড়া নেই? মশার কামড় টের পাচ্ছ না?

শুভময় হাত নেড়ে শূন্যে পাক খাওয়া মশার ঝাঁক তাড়াতে তাড়াতে বলল, —ইদানীং খুব বেড়েছে। সিজন চেঞ্জের সময় তো। ঠান্ডাটা পুরোপুরি পড়লে হয়তো খানিকটা কমবে।

—তখনই নয় সারা সন্ধে এখানে থেকো। এখন ঘরে এস। এই বারান্দায় এখন আমি আর এক মুহূর্ত তিষ্ঠোতে পারব না।

—চলো।

জুতো জোড়া হাতে নিয়ে ঋতির পিছন পিছন বসার ঘরে এল শুভময়। টিউবলাইট জ্বলছে না, ভোল্টেজ নেই। বাল্‌বের আলোও কেমন মরা মরা। ঘরের যৎসামান্য আসবাব— বেতের সোফাসেট, কাচ বসানো বেতের সেন্টার টেবিল, বুককেস, চাকা লাগানো টেবিলে টিভি, টেলিফোন, কলকাতার নিলামঘর থেকে ঋতির কেনা স্ট্যান্ড ল্যাম্প, ম্যাড়মেড়ে আলোয় সবই কেমন মলিন মলিন লাগে। এরকম অনুজ্জ্বলতা ঋতির একদমই বরদাস্ত হয় না। কে জানে, শুভময়ের এখন হয়তো এটাই পছন্দ।

ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল ঋতি। বিকেল থেকে জানলাও বন্ধ, মশার উপদ্রব এড়াতে। সুইচবোর্ডে মসকিউটো রিপেলেন্ট লাগিয়ে দিয়েছে রতন। তাতেও সামাল দেওয়া যাবে না বলে মশকনিবারণী ধূপ জ্বালিয়েছে বুককেসের নীচে। ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে ঘরে, বাতাসে তার ঝাঁঝাল ঘ্রাণ।

রতন চা রেখে গেল। শুভময়ের মুখোমুখি বসে কাপে চুমুক দিল ঋতি। নাক কুঁচকোল, —এহ্, বড্ড কড়া করে ফেলেছে। লিকার চা'টা রতন করতেই পারে না।

শুভময় যেন শুনতে পেল না। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, —তুমি এবারও খুব বোর হলে, তাই না ঋতি?

পুরনো বস্তাপচা প্রশ্ন। উত্তর না দিয়ে ঋতি বলল, —ওহো, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। দুপুরে তোমাদের সিভিল কোর্টের বিপ্লব সেনগুপ্তর বউ এসেছিল। গল্প করে গেল ঘণ্টাখানেক।

শুভময় একটু যেন সহজ এবার। ঈষৎ লঘু স্বরে বলল, —বকবক করে কানের পোকা বার করে দিয়েছে তো?

—তা কেন, আমার তো মণিমালাকে বেশ লাগে। জড়তা নেই, খোলামেলা কথাবার্তা বলে, জলি, মিশুকে ...

—কী জানি, আমার তো মনে হয় শুধু নিজের গুণপনা জাহির করার চেষ্টা।

—গুণ থাকলে তা চেপে না রাখাই তো সুস্থতার লক্ষণ। আরও শুনে ভাল লাগল, ওর হাজব্যান্ডও নাকি ওকে খুব এনকারেজ করে।

—বিপ্লবের কালচারে ন্যাক আছে। এক সময়ে কবিতা লেখার বাতিক ছিল তো।

—কবিতা লেখাটা বাতিক?

—না না, তা বলিনি। শুভময় ঢোক গিলল, —বিপ্লব কবিতা লেখার ব্যাপারে তোমার মতো সিরিয়াস নয়। এক সময়ে পাসটাইম ছিল, জুডিশিয়াল সার্ভিসে এসে শখ শিকেয় উঠেছে।

ঋতি চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড দেখল শুভময়কে। তারপর বলল, —এবার মণিমালা নাকি ওদের কোয়ার্টারে বড় করে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেছিল?

—ওই আর কি। আমরা ম্যাজিস্ট্রেটরাই মেনলি ইনভাইটেড ছিলাম। আর কয়েকজন ওর চেনা পরিচিত। মণিমালাই গান গাইল, মণিমালাই আবৃত্তি করল, মণিমালার মেয়ে নাচল ...

—শুধু মণিমালা?

—আরও দু' চারজন গেয়েছে গান। এখানে এসে মণিমালা কী একটা লেডিজ ক্লাব মতো করেছে, তারাই মিলে ...

—তুমি আমায় বিজয়া সম্মিলনীর কথা বলনি তো?

—বলিনি, না?

—আমি আজ মিছিমিছি অপ্রস্তুতে পড়লাম।

—অপ্রস্তুতের কী আছে?

—তোমাকে নাকি বারবার বলেছিল আমাকেও একটা খবর দেওয়ার জন্য! তুমি নাকি বলেছ আমি ওইদিন ব্যস্ত থাকব ...!

—তা বলেছি। শুভময় একটু চুপ থেকে বলল, —কিন্তু তোমাকে বললেই কি তুমি আসতে?

—আসতাম কি আসতাম না সেটা পরের কথা। অ্যাট লিস্ট ব্যাপারটা আমার জানা থাকলে ...।

কথা শেষ হল না, ভেতর দরজায় ভবানী। গলা বাড়িয়ে বলল, —আমি তা হলে আজ যাই স্যার?

শুভময় অবাক মুখে বলল, —তুমি এখনও আছ?

—আজ্ঞে, রতন একটু চা খেয়ে যেতে বলল।

—অ। ... তা এসো এবার। আর হ্যাঁ, বার লাইব্রেরিতে আমার রিকুইজিশান দেওয়া আছে, কাল ফার্স্ট আওয়ারেই বইগুলো এনে রাখবে। ভুলে যেও না।

ঢক করে ঘাড় নাড়ল ভবানী, তবে দরজা ছেড়ে নড়ল না। গলা খাকারি দিয়ে ঋতিকে বলল, —ম্যাডাম, আমি তা হলে কাল সাড়ে ছটায় চলে আসছি। আপনি রেডি থাকবেন।

শুভময়ের ভুরুতে ভাঁজ, —কেন? ম্যাডামের সঙ্গে তোমার কী দরকার?

—আজ্ঞে, ম্যাডামকে কাল সকালে মহানন্দায় তুলে দেব। উনি এবার বাসে ফিরবেন।

—তার জন্য তুমি বাড়ি থেকে দু' মাইল পথ ভেঙে এখানে আসবে? ভোরবেলা? শুভময় জোরে জোরে মাথা নাড়ল, —না না, প্রশ্নই আসে না। আমি সকালে হাঁটতে বেরই, আমিই ধরিয়ে দেব।

—আমার কোনও অসুবিধে হবে না স্যার, বিশ্বাস করুন।

—ভবানী, বাড়ি যাও। সন্ধে হয়ে গেছে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ভবানী। শুকনো মুখে। ভিতু ভিতু চোখে দেখছে ঋতিকে, চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

ভবানী চলে যাওয়ার পর ঋতি অপ্রসন্ন মুখে বলল, —এটাই তোমার বাড়াবাড়ি। মিছিমিছি লোকটাকে হার্ট করলে। বয়স্ক মানুষ ... মুখ ফুটে একটা রিকোয়েস্ট করেছে ... তাও কিছু প্রাপ্তির আশায় নয় ...

শুভময় শান্ত গলায় বলল, —তুমি তো জানো ঋতি, অফিসের লোককে দিয়ে পারসোনাল কাজ করানো আমি পছন্দ করি না। বিকজ, দিস ইজ আন-এথিকাল।

—হুঁহ্, এথিকস্! দিনকে দিন তোমার ছুঁচিবাই বাড়ছে।

শুভময় কথাটা যেন গায়েই মাখল না। কাপ নামিয়ে চটি গলাল পায়ে, চলে গেছে শোওয়ার ঘরে।

একটা অক্ষম ক্ষোভে ছটফট করছিল ঋতি। বাক্যে বাক্যে টক্কর বাধলে তাও কিছুটা ঝাঁঝ বের করে দেওয়া যায়, কিন্তু সে সুযোগ কি শুভময় দেয়

কখনও? এরকমই সুড়ুত করে কেটে পড়বে, এবং চলবে সে নিজের মর্জি মতোই। এত কীসের নীতিজ্ঞান শুভময়ের? নীতি নীতি করে কী পেয়েছে? ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলতে পারবে না বলে ওকালতি শুরু করেও ছেড়ে দিল, পরীক্ষা দিয়ে ঢুকল এই হাকিমি পেশায়। সেখানেও সর্বক্ষণ ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ভাব। উকিল টুকিলদের সঙ্গে মিশব না, নেমন্তন্ন করলেও পারতপক্ষে তাদের বাড়ির ছায়া মাড়াব না ... পাছে কেউ পরিচিতির সূত্রে সামান্যতম সুযোগ নিয়ে ফেলে! পাবলিক ফাংশান এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, সাধারণ মানুষের থেকে দূরে দূরে থাকে, সাদাসাপটা বন্ধুত্বও করবে না কারুর সঙ্গে। কেন? না এতে নাকি আইনের চেয়ারে বসার জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তাতে বাধা পড়ে! নিরপেক্ষতা নাকি ক্ষুণ্ণ হয়! শুভময়ের কাছে আইন একটা মূর্তি। যার দু' চোখ বাঁধা, হাতে নিক্তি ঝুলছে। ওই মূর্তিটাই শুভময়ের জীবনে ধ্রুব সত্য, তার বাইরে সব কিছুই মিথ্যে। তা এত যে নীতিজ্ঞানের ধ্বজা ওড়ায়, তাতে কি মুগ্ধ হয়েছে কেউ? দুনিয়ার সবচেয়ে ওঁচা ওঁচা পোস্টিংগুলো তো শুভময়ের জন্যই তোলা থাকে। উলুবেড়িয়া থেকে যখন মাথাভাঙায় বদলি হল, কত মিনতি করেছে ঋতি, গিয়ে একটু ধরাধরি কর ... পাত্তা দিল ঋতিকে? এগারো মাসের বাচ্চা নিয়ে ঋতিকেও ছুটতে হল ওই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়। শুভময় যদি মাথাভাঙা যাওয়াটা ঠেকাতে পারত, তা হলে হয়তো মুনিয়া আজও বহাল তবিয়তে ...

ঋতির বুকটা মুচড়ে উঠল। সেই ছুরিবেঁধা যন্ত্রণা। সেই রক্তক্ষরণ। মুনিয়া চলে গেছে আজ প্রায় ন' বছর, তবু কেন যে মনে হয় এই তো সেদিন ...!

দু'-তিনবার হিক্কা তুলে নিজেকে সামলাল ঋতি। নাক টানছে। আঁচলে চোখ মুছে সেন্টার টেবিলের তলা থেকে ম্যাগাজিন হাতে নিল একটা। ইংরিজি পাঁচমেশালি পত্রিকা, রাজনীতির কচকচানিই বেশি। নেড়েচেড়ে রেখে দিল যথাস্থানে। ভোল্টেজ বেড়েছে খানিকটা, উঠে গিয়ে টিভি অন করে ফের বসল সোফায়। রিমোট টিপে চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। একটা বাংলা সিরিয়ালে থামল। অর্থহীন প্রলাপ যত, তবু এও ভাল। মনের ছবি আড়াল করতে সামনে একটা চলমান ছবি তো রাখতেই হয়।

রতন কাপ ডিশ নিতে এসেছে। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, —ম্যাডাম, জলখাবার তৈরি করে ফেলব?

ঋতি যেন এখনও ঘোরে। বিড়বিড় করে বলল, —জলখাবার...?

—আপনি যে বললেন চাউমিন বানাতে। আমি নুডলস্ সেদ্ধ করে ফেলেছি।

—ও। ঋতি সোফার পিঠে মাথা রাখল, —শোওয়ার ঘর থেকে আমার সিগারেট আর লাইটারটা এনে দাও তো।

শুধু প্যাকেট আর লাইটার নয়, অ্যাশট্রেটাও এনে সেন্টার টেবিলে রেখেছে রতন। নীল কাচের সুদৃশ্য ছাইদান। ও ঘরে সাহেবের ড্রয়ারে তোলা থাকে, মেমসাহেব এলে তবে বেরোয়। শুভময়ের ধূমপানের অভ্যেস চলে গেছে।

ঋতি সিগারেট ধরিয়েছে। তামাকের আবেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে, ধীরে ধীরে হালকা হচ্ছে মাথা। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে তো, ভাল লাগছে বেশ। আহ্, আরাম।

রতন চলে যায়নি। অপেক্ষা করছিল। বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, —ম্যাডাম, চাউমিনে ডিম দেব তো?

—দাও। তোমার স্যার যেভাবে খায়, সেভাবেই বানাও।

ঘুরতে গিয়েও থামল রতন, —রাতের রান্নার কী হবে ম্যাডাম?

ঋতি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, —মানে?

—আপনি আজ রাঁধবেন বলেছিলেন?

—ও হ্যাঁ। মুরগির একটা প্রিপারেশান করব ভাবছিলাম। তুমি মশলা-টশলা সব রেডি করে ফ্যালো।

—কী কী লাগবে ম্যাডাম?

—ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কা এনেছ তো?

—হ্যাঁ, আপনি যে রকম বলেছিলেন। ধনেপাতা সাত আট আঁটি ...

—আর আদা রসুন?

—আছে। বেটে ফেলব?

—আলাদা আলাদা করে। আর ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা আমি একসঙ্গে মিক্সিতে দেব। মুরগি কতটা আছে?

—এই ধরুন, কিলো মতন।

—ঠিক আছে। ফ্রিজ থেকে বার করে রাখ। তোমার চাউমিন হলে আমি কিচেনে যাচ্ছি।

আজকাল আর রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না ঋতির। কলকাতায় লোক আছে রান্নার, সেই যা পারে করে। মা-ও শখ করে বানায় টুকিটাকি। ঋতি নৈব নৈব চ। মঙ্গলা ডুব মারুক, মা'র শরীর খারাপ থাকুক, ঋতি বরং বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে নেবে, তবু হাতা-খুন্তি সে ধরবে না। কিন্তু শুভময়ের কাছে এলে দু'-একটা পদ সে বানিয়ে ফেলে কখনও সখনও। সময়ও কাটে, লাগাতার

অনভ্যাসের বদলও আসে একটু।

সিগারেট শেষ করে টিভির ভলিউম সামান্য কমাল ঋতি। ভেতর বারান্দা থেকে একটা কথোপকথনের আওয়াজ ভেসে আসছে। শুভময় কী যেন বলছে কাকে। রতনকে কী? উঁহু, হোমগার্ড ছেলেটার গলা। ঢুকল কোনখান দিয়ে? উঠোনের দরজা? ছেলেটা বাংলোর পাহারাদার বটে, তবে তাকে দেখা যায় না বিশেষ, আড়ালে-আবডালেই থাকে বেশির ভাগ সময়। কী বলছে ছেলেটা শুভময়কে? ক্ষণিক কান পেতে শোনার চেষ্টা করল ঋতি। বুঝতে না পেরে ফের মন দিয়েছে টিভিতে।

দু'-চার মিনিট পরেই শুভময় এল। অফিসের পোশাক ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরেছে। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে সে এখন অনেকটা তরতাজা। হাতে ধরা রিডিং গ্লাসের খাপটা টেবিলে রাখতে রাখতে তরল গলায় বলল, —বসন্তটা বেজায় উড়ু উড়ু হয়েছে।

হোমগার্ড ছেলেটির নাম মনে পড়ে গেল ঋতির। বসন্তই তো। বসন্ত বেরা। আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করল, —কেন? সে আবার কী করল?

—আজও তার ছুটি চাই। রাতে বাড়ি যাবে। ... এই নিয়ে এ মাসের ফোর্থ ডে।

—রোজ রোজ এখানে পড়ে থাকতে ভাল লাগবেই বা কেন? সংসারের ওপর নিশ্চয়ই টান আছে ...

—ভৃৎ, বিয়ে থাই করেনি, তার সংসার! রতন বলছিল, ব্যাটার নাকি খুব যাত্রা দেখার নেশা।

—আজও বুঝি যাত্রা দেখতে গেল?

—বলল তো বিয়েবাড়ি। খুড়তুতো বোন, না জাড়তুতো বোন, কার বিয়ে। কে জানে হয়তো ধাপ্পা মারল।

—মানুষকে এত অবিশ্বাস করো কেন?

—প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস না করাটাই আমার পেশা ঋতি।

দুম করে রেগে যেতে গিয়েও ঋতি হেসে ফেলল আচমকা। বলল, —অর্থাৎ বিয়ের কার্ড তোমায় পেশ না করলে তুমি ওর কথা মানবে না, তাই তো?

শুভময়ও হেসে ফেলল। গরম গরম চাউমিন পৌঁছে গেছে টেবিলে, সঙ্গে এক জোড়া সসের বোতল। চিলি। টোম্যাটো। ঋতি টোম্যাটো সস ছোঁয় না, শুভময়ের চিলিতে অনীহা, যে যার পছন্দসই বোতল উপুড় করল প্লেটে। খাচ্ছে।

টিভিতে খবর চলছিল, শুভময় চোখ রেখেছে পরদায়। সমাচার দেখতে দেখতে বলল,— কলকাতা তো দেখছি ভোল পাল্টে ফেলছে! নিত্যনতুন মার্কেট, সুপারমার্কেট, ফ্লাইওভার...

—দেওয়ালির দিন আর একটা মাল্টিপ্লেক্স ওপেন হল। শপিং মল, প্লাস ছ' ছ' ছখানা সিনেমাহল। বিশাল বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্সও উঠছে ধড়াধ্ ধড়। আঠাশ তলা, পঁয়ত্রিশ তলা...

—হুম্। কংক্রিটের খাঁচা। কংক্রিটের খোপে খোপে মানুষ।

—খাঁচার মানুষদের খাঁচা ছাড়া গতি কী! প্লেট শেষ করে ঠোঁট মুছল ঋতি। আর একখানা সিগারেট ধরিয়েছে। পথেঘাটে খায় না বলে দিনভর নেশাটা নিয়ন্ত্রণে থাকে, সন্ধের পর থেকে ধূমপানের মাত্রাটা তার বেড়ে যায়। খানিকটা ধোঁয়া গিলে বলল, — তোমাকে একটা কাজের কথা বলে রাখি শোনো। আমরা বোধহয় একটা জমি পেতে চলেছি।

শুভময় অস্ফুটে বলল, —আমরা...?

—আমরা মানে আমরা। আমি, দীপকদা, অলকানন্দা, দেবাশিস, করবীদি, রেণু... মানে আমাদের কো-অপারেটিভ।

—তোমাদের কো-অপারেটিভ তৈরি হয়ে গেছে?

—বা রে, তোমাকে আগের বার কলকাতাতেই তো বললাম, আমরা রেজিস্ট্রেশানের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। লাল ফিতের গিঁট পেরিয়ে ওই কাজটা কমপ্লিট। নভেম্বরের থার্ড উইকে চিঠিও পেয়ে গেছি। গভর্নমেন্ট আমাদের নামটাই অ্যাক্সেপ্ট করেছে। ঋদ্ধি।

—বাহ্, খুব ভাল। মৃদু উচ্ছ্বাস দেখাল বটে শুভময়, তবে মুখে যেন তেমন খুশি ফুটল না। একটুক্ষণ নীরব থেকে জিজ্ঞেস করল, —তার মানে তোমরা সব কবিরাই...?

—তা কেন। গদ্যলেখকও আছে। দীপকদা। করবীদিও পেন্টার। অলকানন্দা আবৃত্তি করে। আমরা চেয়েছি মোটামুটি সবাই যেন কালচারাল পারসন হয়। একমাত্র ভানুবাবুই যা অড ম্যান আউট ঢুকে পড়ল। আর ভানুবাবুর সোর্সে প্রদীপ। তা এক-দুজন তো এরকম থাকতেই পারে। বলো?

—হুঁ।

—ভানুবাবুর বিস্তর চেনাজানা। গভর্নমেন্ট লেভেলে কত কানেকশান। ইনফ্যাক্ট, ভানুবাবুই জমিটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিচ্ছে। ঋতি ছাই ঝাড়ল, —

আর প্রদীপ তো কন্সট্রাকশান লাইনের। সাইটে কাজকর্ম দেখার জন্য নিজেদের একজন তো থাকা জরুরি। ঠিক, কি না?

—বটেই তো। ...জমির লোকেশানটা কোথায়?

—দুটো তিনটে সাইট আছে, তার মধ্যে একটা। মোটামুটি ধরো ইস্টার্ন বাইপাসের আশেপাশে।

—দাম কত পড়বে?

—এখন কী করে বলব! গভর্নমেন্ট আগে জমি অ্যালট করুক, তারপর তো...। পাঁচ কাঠার প্লট হলে একরকম প্রাইস, আট কাঠা হলে আর এক রকম। এটুকু বলতে পারি, জমিতে পার হেড লাখ খানেকের কমই লাগবে।

—ও।

শুভময়ের মুখ কি ফ্যাকাশে হয়ে গেল হঠাৎ? ঋতি সরু চোখে পড়ার চেষ্টা করল শুভময়কে। কেন যে কলকাতায় বাড়ি ঘর করার কথা উঠলেই মিইয়ে যায় লোকটা? অথচ কলকাতাতেই তো জন্মেছে, স্কুল কলেজ সবই শুভময়ের কলকাতায়, তার বাপ দাদারাও এখনও সেখানে বিরাজমান...।

ঋতি নীরস গলায় প্রশ্ন করল, — তোমার কি প্ল্যানটা পছন্দ নয়?

—না না, ভালই তো। শুভময় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —চমৎকার আইডিয়া।

—কতকাল আর ভাড়া দিয়ে দিয়ে থাকব, বলো? এবার তো আমাদের একটা নিজস্ব কিছু দরকার। ঘরবাড়ি না হোক, ফ্ল্যাটই সই।

—নিশ্চয়ই। ... টাকাটার প্রয়োজন হলে মাস খানেক আগে বোলো। পি-এফ লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেব।

—মাস খানেক কেন, বেশিই সময় পাবে।

শুভময় তবু ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে। ঋতি প্লেট দুটো তুলে নিয়ে রান্নাঘরে এল। কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে কাজে। হাতে হাতে সাহায্য করছে রতন। কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতার পেস্ট বানিয়ে ফেলল ঝটপট। আদা রসুন গোলমরিচ মাখানোই ছিল মুরগিতে, কড়ায় তেল দিয়ে কষিয়ে নিল মুরগি, তারপর ধনেপাতা-কাঁচালঙ্কার মিশ্রণটা দিয়ে নেড়েচেড়ে প্রেশার কুকারে ঢালল। চামচে একটু তুলে চেখে দেখল নুন ঝাল ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। ব্যস্, এবার দুটো সিটি দিলেই নিশ্চিন্ত। রতন আটা মাখতে বসেছে, তাকে খাওয়ার আগে একটু স্যালাড বানিয়ে ফেলতে বলল। রতন অবশ্য রোজই বানায় স্যালাড, তবুও।

ঠান্ডা লাগছে অল্প অল্প। শোওয়ার ঘরে এসে পাতলা গুজরাটি চাদরটা নিল

ঋতি। মোবাইল ফোনটাও। চাদর গায়ে জড়াচ্ছিল, তখনই একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল বাইরে। কে যেন স্যার স্যার করে ডাকছে। এখন কে এল শুভময়ের কাছে?

উহুঁ, শুভময় নয়, ঋতির কাছেই এসেছে আগন্তুক। পরেশ জানা। শুভময়ের কোর্টের পেশকার। হাতে ঋতির জন্য বড় হরলিক্সের বোতলভর্তি গাওয়া ঘি। ঋতি বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আড়ে আড়ে শুভময়কে দেখছিল। শুভময় ভাবলেশহীন।

ঋতিই আপত্তি জুড়ল, —এসব আবার আনতে গেলেন কেন? আমি ঘি-টি খাই না।

বছর পঁয়তাল্লিশের তেল চুকচুকে গোলগাল চেহারার পরেশ মাখন সুরে বলল, —এ বাজারের ঘি নয় ম্যাডাম। আমার নিজের গোয়ালের গোরুর দুধের ঘি। মাঠা জ্বাল দিয়ে একেবারে ঘরে তৈরি। আমার পরিবার স্বহস্তে বানিয়েছে।

—তা হোক। তবু...

—না নিলে আমার পরিবার ভারী দুঃখ পাবে ম্যাডাম। আপনি এসেছেন শুনে আমায় কালই বলে রেখেছিল, আজ ঘরে ঢুকতেই ধরিয়ে দিল বোতলটা। বিকেলে কড়া থেকে তুলেছে। দেখুন, এখনও কুসুম কুসুম গরম আছে।

—বুঝলাম। কিন্তু ঘি তো আমার চলে না। ডাক্তারের বারণ।

—আপনি না খান পাঁচজনকে খাওয়াবেন। আমার পরিবারের হাতের সুখ্যাতি হবে।

পরেশ রীতিমতো নাছোড়বান্দা। ঘিয়ে অরুচি, ডাক্তারের নিষেধ, বয়ে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে, কোনও ওজর আপত্তিই শুনছে না। ঋতি বেশ বিরক্ত হচ্ছিল। জানে সাহেবের বাড়িতে ভেট নেওয়ার চল নেই, তবু কেন আনে এরা? নয় নয় করে শুভময়ের তো এখানে আট ন' মাস হয়ে গেল, এখনও চিনল না শুভময়কে?

পরেশের সঙ্গে দড়ি টানাটানির ফাঁকে কখন যেন উঠে গেছিল শুভময়। ফিরেছে ঘরে, হাতে মানিব্যাগ। গম্ভীর গলায় বলল, —কত দেব পরেশবাবু?

যেন তেলেগু বা মালয়ালম শুনল পরেশ। চোখ গোল গোল করে বলল, —কী বলছেন স্যার?

—না বোঝার মতো বোকা আপনি নন পরেশবাবু। কতটা আছে ঘি? এখানে কেজি কত করে যাচ্ছে?

—সে আমার পরিবারকে পাঠিয়ে দেব, তাকেই নয় জিজ্ঞেস করে নেবেন।

—ভণিতা ছাড়ুন পরেশবাবু। দামটা বলুন।

—বিশ্বাস করুন স্যার, এ আমার জিনিস নয়। পরেশ দু' হাতে কান ধরল, —এই ঘিয়ের দাম নিয়েছি শুনলে আপনার বউমা আমায় আদাছ্যাঁচা করবে। একান্তই যদি দিতে চান, তো তার হাতেই না হয়...

শুভময়ের মুখ থমথমে হয়ে গেছে। বুঝি এক্ষুনি ফেটে পড়বে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার আগে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ঋতির মাথায়। শুভময়ের পার্স থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে পরেশের হাতে গুঁজে দিয়েছে আচমকা। মিষ্টি মিষ্টি হেসে বলল, —আপনিও কিন্তু না বলবেন না পরেশবাবু। এটা আমি দিচ্ছি। ঘিয়ের দাম নয়, ছেলেমেয়েদের একটু মিষ্টি খাওয়াবেন।

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। গুটিয়ে গেছে পরেশ। ফ্যালফ্যাল তাকাতে তাকাতে চলে গেল ঘর ছেড়ে। ম্যাডামকে একটা নমস্কার জানাতেও ভুলে গেল।

রাত্রে বিছানায় শুয়েও তখনকার দৃশ্যটা মনে পড়ছিল ঋতির। হাসিও পাচ্ছিল। মোক্ষম জব্দ হয়েছে আজ লোকটা। শুভময় বলছিল, পরেশ লোকটা নাকি মোটেই সুবিধের নয়। পয়সা খেয়ে কেসের ডেট উল্টোপাল্টা করে দেওয়া, ফাইল হাপিশ, এসব নাকি পরেশের বাঁয়ে হাত-কা খেল্। অল্পবিস্তর বদনাম প্রায় সব পেশকারেরই আছে, তবে পরেশের তুলনায় তারা নেহাতই শিশু। বিপুল সম্পত্তি বানিয়েছে পরেশ। বেনামে বাস বার করেছে, গাড়ি কিনেছে, এখন চড়া সুদে টাকাও খাটায়। লোকটাকে সামলে-সুমলে রাখতে শুভময়ও নাকি জেরবার।

ঋতি তার মান বাঁচাল বলে আজ বুঝি একটু খুশিই হয়েছে শুভময়। হয়তো বা খানিক কৃতজ্ঞও। কিন্তু ঋতির আর তাতে কী আসে যায়। সম্পর্কের নদীটাই যেখানে শুকিয়ে গেছে, সেখানে আর কীসের জোয়ার-ভাঁটা!

খাওয়া দাওয়ার পরেই ও পাশের ঘরটায় আইনের বই খুলে বসেছে শুভময়। কেস স্টাডি করছে। ও ঘরের টিউবলাইটের আলো উঁকি দিচ্ছে এ ঘরে, শুষে নিচ্ছে নাইটল্যাম্পের নীলাভ দ্যুতি। জানলার বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে অবিরাম। একটা রাতচরা পাখি টিঁ টিঁ করে উঠল কোথাও। ঠান্ডা বাড়ছিল।

সুজনিটা ভাল করে গায়ে টানল ঋতি। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করছে কলকাতায় কী কী কাজ আছে কাল।

পৌঁছেই স্নান-টান সেরে সোজা বুটিক। বোলপুর থেকে রসিদ মোল্লার আসার কথা, কাঁথাস্টিচের ওপর নতুন কয়েকটা ডিজাইন দেখাবে বলেছে। মনে করে ওসমানকেও একবার তাড়া লাগাতে হবে। সেই যে এক ডজন সালোয়ারস্যুটের অর্ডার নিয়ে গেল, এখনও ডেলিভারি দেওয়ার নাম নেই। সন্ধেবেলা বাংলা অ্যাকাডেমিতে একটা আমন্ত্রণ আছে। পাবলো নেরুদার কবিতার ওপর আলোচনাসভা। গেলেও হয়, না গেলেও হয়। শুকনো শুকনো বক্তৃতা গিলে কী লাভ! তবে রেণু সুধন্য সোমদত্ত দেবাশিসরা আসবে হয়তো, দেখা হলে আড্ডা জমতে পারে কিছুক্ষণ। বাড়িও চলে আসা যায় অবশ্য। সন্ধেবেলা নয় একটু কাগজ কলম নিয়ে বসবে। পূর্ব দিগন্ত বইমেলা সংখ্যার জন্য কবিতাগুচ্ছ চেয়েছে, সোম মঙ্গলবারের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে শৌণককে...

ভাবনায় ছেদ পড়ল। সন্তর্পণে মশারি তুলে শুভময় বিছানায় ঢুকছে।

ঋতি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, —এত তাড়াতাড়ি আজ কাজ শেষ?

ঈষৎ চমকেছে শুভময়, —তুমি এখনও ঘুমোওনি?

অর্থহীন প্রশ্ন। ঋতি সাড়াশব্দ করল না।

শুভময় চুপচাপ বালিশে মাথা রাখল। চিত হয়ে শুয়েছে, বুকের ওপর দুটো হাত। একটু পরে বলল,— তোমার টাকাটা খামে রাখা আছে। আলমারিতে, সামনেই। কাল যাওয়ার সময়ে মনে করে নিয়ে নিও।

ঋতি ঘুরে শুল, —এ মাসটায় আর লাগবে না। পুজোয় তো কাজ ভালই পেয়েছিলাম। পেমেন্টও মোটামুটি এসে গেছে। বাড়িভাড়া দোকানভাড়া মিটিয়েও হাতে এখনও আছে কিছু। চলে যাবে।

—ও। ... তাও দরকার হলে বোলো।

—বলব।

ব্যস্, আর কোনও কথা নেই। নিঃসাড়ে পড়ে আছে শুভময়, চোখ বুজে। শুভময়ের শরীরের গন্ধ পাচ্ছিল ঋতি। চেনা, আবার যেন অচেনাও।

গন্ধটা কি একটু তাপ ছড়াল ঋতির শরীরে? হঠাৎই? সুজনি থেকে হাত বার করে শুভময়কে আলতো ছুঁল ঋতি।

ঋতির স্পর্শ পেয়েই শুভময়ের শরীর পলকে আড়ষ্ট। হিম হিম।

ঋতি হাত সরিয়ে নিল।

দুই

নিজের চেম্বারে বসে শুভময় টিফিন সারছিল। ফুলকো ফুলকো লুচি আর ফুলকপির চচ্চড়ি। রতন দিয়ে গেছে একটু আগে, চচ্চড়ি এখনও আগুন গরম। শুভময় ঠান্ডা খাবার ভালবাসে না, রতন জানে।

তেষ্টা পাচ্ছে অল্প অল্প। গ্লাসের ঢাকা খুলে এক চুমুক জল খেল শুভময়। বাজারে কপি ওঠার পর থেকে মনের আনন্দে দেদার কপি খাইয়ে চলেছে রতন। ফুলকপি আর বাঁধাকপি, বাঁধাকপি আর ফুলকপি। তা খাওয়াক, এ অঞ্চলের কপির স্বাদটা তো মন্দ নয়। কিন্তু রোজ রোজ এই লুচি পরোটা কেন? অম্বল হয়, পেটের বারোটা বাজে...। নাহ্, রতনকে বারণ করতে হবে। টিফিনে রুটি দিতে কেন যে সংকোচ বোধ করে ছোকরা!

পাশেই ভবানী। বিনীত স্বরে বলল,—এবার তা হলে চা দিয়ে যেতে বলি স্যার?

—একটু আদা হবে চায়ে?

—আপনি বললেই হবে।... ঠান্ডা লেগেছে নাকি স্যার?

—হুম্। গলাটা খুসখুস করছে। মর্নিং ওয়াকে বেরনোর সময়ে আন্দাজ করতে পারিনি। একটা কমফর্টার নেওয়া উচিত ছিল।

—ঝপ করে শীতটা বেড়ে গেল, তাই না স্যার? তাও তো এখনও পৌষ মাস পড়েনি।

—হুম্।

—এখানে স্যার এটাই আপনার প্রথম শীত। খুব সাবধানে থাকবেন স্যার। কাশি একবার ধরে গেলে কিন্তু ছাড়বে না।

—হুম্।

—বাংলোয় তুলসীগাছ আছে না স্যার?

আছে কি? শুভময় ঝট করে মনে করতে পারল না। সে প্রকৃতিপ্রেমিক নয়, গাছপালার প্রতি তার তেমন টান নেই। বাংলোর পিছনে আমগাছ আছে একটা, সম্ভবত একটা জামরুলগাছও। সামনে কাঁঠালিচাঁপা, আর মাঝারি সাইজের নিম। বাদবাকি সবই তো ঝোপঝাড়। তাদের মধ্যে কী থাকতে পারে তুলসীগাছ?

লুচি চিবোতে চিবোতে হাত উল্টে দিল শুভময়,—কী জানি।

—আগে তো ছিল...। না থাকলেও প্রোব্লেম নেই স্যার। আমি ঘর থেকে...।

বলতে বলতে হঠাৎ হোঁচট খেয়েছে ভবানী,—মানে, আপনি যদি অনুমতি করেন স্যার তবেই...। তুলসীপাতা আর মধু কিন্তু কাশির অব্যর্থ দাওয়াই।

ভবানীর দ্বিধামাখা মুখটা দেখে হেসে ফেলল শুভময়,—ঠিক আছে, দিয়ে যেয়ো রতনকে।

বিগলিত মুখে চা আনতে গেল ভবানী। শুভময় লুচি শেষ করে টিফিন কেরিয়ার বন্ধ করল। হাত মুছল সরকারি তোয়ালেতে। ভবানীকে তুলসীপাতা আনতে অনুমতি দেওয়াটা কি উচিত কাজ হল? এও কি সরকারি পদের অপব্যবহার নয়? সাহেবকে তুষ্ট করার জন্যই তো ভবানী...! আবার হেসে ফেলল শুভময়। ঋতির সেদিনের বিদ্রূপটা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। সত্যিই কি সে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন? নইলে ভবানী তার গাছ থেকে সামান্য কটা পাতা ছিঁড়ে আনবে, তাতেও এত হিসেব নিকেশ? কী আর করা, যার যা স্বভাব!

—শুভময়দা, আসব?

দোলদরজার ওপারে সরোজ। জুনিয়ার সহকর্মী। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট!

শুভময় গলা ওঠাল,—আরে, এসো এসো। তুমি কবে থেকে এত ফরমাল হলে?

বছর পঁয়ত্রিশের সুপুরুষ সরোজ মজুমদার সামনের চেয়ারে বসল,—আপনার টিফিন হয়ে গেছে তো?

—ও শিওর। শুভময় টিফিন কেরিয়ারটা টেবিল থেকে নামিয়ে দিল, —এখন চায়ের প্রতীক্ষায়।... বলো, তোমার কী খবর?

—একটা অড প্রবলেম নিয়ে এসেছি শুভময়দা।

—কী হল?

—একটু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে দাদা।... আমার ফার্স্ট পোস্টিং ছিল রানাঘাটে। ওখানে থাকার সময়ে স্কেল রিভিশান হল। সে সময়ে আমার তেরো হাজার সাতশো কুড়ি টাকা থোক জমা পড়েছিল পি-এফে। আমার রেগুলার পি-এফে যে টাকাটা জমা পড়ে, সেটা বাদ দিয়ে। পরের বছর পি-এফ স্টেটমেন্টে দেখলাম গড়বড় আছে। দীপ্তেন সান্যালের একটা একচল্লিশ হাজার জমা পড়েছিল, সেটাও ঢুকে গেছে আমার অ্যাকাউন্টে। রঘুনাথদা তখন রানাঘাটের এস-ডি-জে-এম, উনি রেক্টিফাই করার জন্য চিঠিও দিলেন। কিন্তু সে বছরই আমার কুচবিহার ট্রান্সফার হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে ফার্স্ট যে অ্যাকাউন্ট স্লিপটা পেলাম, তাতে দেখি উল্টো বিপত্তি। দীপ্তেনবাবুর ওই একচল্লিশ হাজারের সঙ্গে আমার তেরো হাজারও বেরিয়ে গেছে। কুচবিহার

থেকেও আবার চিঠি গেল, আমিও কলকাতা এসে পি-এফ অফিসে দেখা করে একবার বললামও। ওরা বলল হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কী, এখনও সেই ভুল টেনে যাচ্ছে। মোস্ট স্ট্রেঞ্জ থিং ইজ দ্যাট, দীপ্তেনবাবুর অ্যাকাউন্টে কিন্তু আমার তেরো হাজারটা যায়নি। আমি খবর নিয়েছি।

—বুঝলাম। আমাকে আবার একটা চিঠি পাঠাতে হবে, তাই তো?

—শুধু চিঠিতে হবে না দাদা। মনে হয় কাউকে দিয়ে একটু পারসুও করাতে হবে।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। রঘুনাথবাবুর চিঠির সঙ্গে তোমার ট্রেজারি স্লিপের একটা কপি কি গিয়েছিল?

—তা তো বলতে পারব না। পাঠাতে হয় নাকি? ওদের কাছে তো অরিজিনাল ট্রেজারি স্লিপ নিশ্চয়ই গেছে!

—সে হয়তো হারিয়ে টারিয়ে ফেলেছে। কিংবা থাকলেও সেটা আর খুঁজে দেখবে না। ভুলটা ওদের হতে পারে, দায়টা তোমার। অতএব তোমাকেই আবার সাপ্লাই করতে হবে।

ভবানী চায়ের দোকানের কিশোরটিকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে। শুভময়ের আলমারি খুলে দু' সেট ঝকঝকে কাপডিশ বার করল। নিজ হাতে সযত্নে কেটলি থেকে চা ঢেলে বাড়িয়ে দিল দুই সাহেবকে। মাসিক বন্দোবস্ত, এক্ষুনি এক্ষুনি দাম মেটানোর ঝামেলা নেই, চলে গেল কিশোরটি। ভবানীও সহবত মেনে দোলদরজার বাইরে।

সরোজ কাপে চুমুক দিল,—বাহ, এ যে আদা চা!

—ভাল বানিয়েছে?

—চলেবল্। শীতকালে বেশ লাগে।... শুভময়দা, আমার কেসটার তা হলে কী করা যায়?

—আগে রানাঘাট থেকে ট্রেজারি চালানের কপিটা তো আনাও। তারপর নয় কাউকে পাঠাব কলকাতায়।

—সমস্যা। গভীর সমস্যা। সরোজ চা শেষ করে চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াল,—রানাঘাটের এস-ডি-জে-এম এখন কে শুভময়দা?

শুভময় ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু। বলল,—সম্ভবত অমিতাভ পাইন।

—ফোন নাম্বার আছে আপনার কাছে?

—বিপ্লব সেনগুপ্তর কাছে থাকতে পারে। ওর ফোন নাম্বার জমানোর হবি আছে।

—দেখি তা হলে খোঁজ করে।

সরোজের প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভবানীর প্রবেশ। যেন মুখিয়ে ছিল ঢোকার জন্যে। নাক মুখ কুঁচকে বলল,—একটা মেয়েছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় স্যার।

—আমার সঙ্গে? কে?

—চিনি না স্যার। খালি ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ কাঁদছে।

—কাঁদছে? কেন?

—কী করে বলব স্যার! শুধু এক কথা, পাঁচ মিনিটের জন্য হুজুরের সঙ্গে দরকার! আসপদ্দা কত, ঢুকে পড়ছিল! আমি আটকেছি।

—ঠিক করেছ। এবার জানিয়ে দাও এভাবে ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে দেখা করা যায় না। নিয়ম নেই।

—তাও বলেছি স্যার। মহা ঘ্যানঘেনে মেয়েছেলে, শুনছে না।

মুহূর্তের জন্য ভাবল শুভময়,—কোর্টে আসতে বলে দাও। ওখানেই শুনব।

—যে আজ্ঞে স্যার।

বাইরে গিয়ে জোর ধমক ধামক শুরু করেছে ভবানী। শুনতে শুনতেই চেয়ার ছাড়ল শুভময়। এজলাসে ওঠার সময় হয়ে গেছে। চেম্বারের মধ্যে দিয়েই আদালতকক্ষে যাওয়ার দরজা, লম্বা লম্বা পায়ে এগোল সেদিকে।

কোর্টরুমটা মোটামুটি বড়ই। আগেকার দিনের বাড়ি। কাঠামো মজবুত, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দৈন্যদশা প্রকট এখন। স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের কলি ফেরেনি বহুকাল, উঁচু সিলিং-এর কড়িবরগায় কালচিটে ঝুল জমে আছে। চাপা গুঞ্জনের সঙ্গে একটা চোরা দুর্গন্ধও যেন টের পাওয়া যায়। এজলাসের ঠিক পিছনে, দেওয়ালে ঝুলছেন মহাত্মা গাঁধী। সম্ভবত হাসছেন তিনি, তবে বোঝে কার সাধ্য।

কাঠের ঘেরাটোপে উচ্চাসনে আরূঢ় শুভময়। নীচে, শুভময়ের সামনেটায়, জাবেদা খাতা আর লাল লাল ফাইলের গাদায় নধরকান্তি পরেশ জানা। তার পাশেই স্টেনোগ্রাফার নিলয় ধাড়া। আইনজীবীরাও উপস্থিত, জিভ শানাচ্ছে। হাজির দু'চারজন বাদী বিবাদী। দরজার বাইরে নিয়মমাফিক এক পুলিশ কনস্টেবল আইনের প্রহরায়। মুখে খৈনি পুরে বন্দুকধারী অলস দৃষ্টি বোলাচ্ছে চতুর্দিকে।

দ্বিপ্রাহরিক বিরতির পর শুরু হল আদালত। প্রথমেই পুলিশ প্রোডাকশান। মহকুমার বিভিন্ন থানায় ধৃত আসামিদের তোলা হয়েছে কাঠের খাঁচায়। বেশির

ভাগই পেটি কেস। অপরাধ শুনেই টকাটক শাস্তির বিধান হাঁকছে শুভময়। কোনওটা বা একটু বেশি মনোযোগ দাবি করে, তাদের ডেট দিয়ে দিচ্ছে। জামিনও পেল কয়েকজন, কেউ বা ফের চলে গেল পুলিশের হেফাজতে।

কাজ করতে করতেই আচমকা শুভময়ের নজরে পড়ল ভবানী ঢুকছে কোর্টরুমে, সঙ্গে এক মহিলা। অল্পবয়সি, জোর চব্বিশ-পঁচিশ। পরনে সস্তা দামের ছাপা শাড়ি, হাতে শাঁখা পলা, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। ভবানী অভিভাবকের ভঙ্গিতে কী যেন বলছে মেয়েটিকে, জড়োসড়ো পায়ে দু-এক পা এগোচ্ছে মেয়েটি, আবার থমকে থমকে যাচ্ছে।

চকিতে পরিস্থিতিটা পড়ে নিল শুভময়। এই তা হলে ভবানীর সেই মেয়েছেলে? বিচারকক্ষে সবার সামনে আর্জি জানাতে সংকুচিত বোধ করছে মেয়েটি? হতেই পারে। কালিম্পং আর মাথাভাঙায় বার কয়েক এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে শুভময়কে। বেজায় বিপদে পড়ে নালিশ জানানোর জন্য মরিয়া হয়ে কোর্টে চলে আসে মেয়েগুলো, কিন্তু আদালতে ঢুকে কেউ শুধু কেঁদেই চলে, কেউ বা দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ হয়ে, মুখ দিয়ে বাক্যি সরে না। ফৌজদারি কার্যবিধির দুশো নম্বর ধারা অনুযায়ী এদের অভিযোগ শোনার এক্তিয়ার শুভময়ের আছে বই কী, শোনাটাও সে কর্তব্য বলে মনে করে। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এদের পেট থেকে কথা টেনে বার করতে হয় তাকে।

পুলিশ লক আপের আসামিদের গতি করে দিয়ে হাতের ইশারায় মেয়েটিকে ডাকল শুভময়। পরেশও দেখেছে মেয়েটিকে, সেও হাঁক ছাড়ল,—এদিকে এসো, এদিকে এসো। স্যার ডাকছেন শুনতে পাচ্ছ না?

কুণ্ঠিত পায়ে মেয়েটি সামনে এল। মাথা নামিয়ে আঁচলে চোখ মুছছে।

শুভময় জিজ্ঞেস করল,—আপনি কি কিছু বলতে চান আদালতকে?

মেয়েটি ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

—তা হলে তো আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে।

সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল মেয়েটি। পলকের জন্য শুভময়ের মনে হল মেয়েটির চোখ দুটি ভারী সুন্দর। গভীর কালো মণি, ঘন আঁখিপল্লব।

এক্ষুনি অন্যান্য কেসের হিয়ারিং শুরু হবে। উকিলবাবুরা ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। একজন বলল, —এই, দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও যাও, কাঠগড়ায় চলে যাও। ওই দিকটায় গিয়ে ওঠো।

মেয়েটি হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল,—আমার উকিল দেওয়ার ক্ষমতা নেই হুজুর।

শুভময় নরম গলায় বলল,—উকিল লাগবে না, আপনি কাঠগড়ায় যান। বুঝি বা একটু ভরসা পেল মেয়েটি। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের কর্মচারী যান্ত্রিক ভাবে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছে তাকে, যা বলব সত্য বলব। সত্যি বই মিথ্যা বলব না।

শুভময় প্রশ্ন শুরু করল,—নাম কী আপনার?

—তাপসী। তাপসী পাত্র।

মেয়েটির শ্যামলা কপালে সিঁদুরের চাকা টিপ। একটু বা ধেবড়ে আছে টিপটা। সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে শুভময় জিজ্ঞেস করল,—স্বামীর নাম?

—স্বামী দেখে না হুজুর।

শুভময় মনে মনে বলল, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। নইলে কি আর তুমি ছুটে আসো!

মুখে বলল,—তবু নামটা বলুন।

—অরুণ পাত্র।

—থাকেন কোথায়?

—আমি? না আমার স্বামী?

—আপনারা কি আলাদা থাকেন?

—সে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে হুজুর। মেয়েটি ফের ফুঁপিয়ে উঠল,—সে থাকে ক্ষীরপাই। আমি মেয়ে নিয়ে মতিপুরে আছি। মা'র কাছে।

মতিপুর জায়গাটা শুভময়ের হাল্কা হাল্কা চেনা। এই মহকুমা শহরের একেবারেই লাগোয়া। সকালে ওই পথেই সে হাঁটতে যায় রোজ।

গলা ঝেড়ে শুভময় বলল,—এবার বলুন কী বলতে চান?

—আমার স্বামী আমায় খাই-খরচা দেয় না হুজুর। আদালতের কথাও সে মানছে না। দেড় বছরের মেয়ে নিয়ে আমার কী করে চলবে হুজুর?

—আদালত থেকে খোরপোষের হুকুম হয়েছিল? তার মানে আপনি আগে মামলা করেছিলেন?

—আমি কোত্থেকে করব হুজুর! পেটই চলে না। মেয়েটা নাক টানল,—আমার এক মামাতো দাদা ছিল, সে-ই উকিলবাবুদের ধরে করে আদায় করে দিয়েছিল। দাদা চার মাস আগে চাকরি পেয়ে কলকাতা চলে গেছে, তারপর থেকে আর একটা পয়সাও ঠেকাচ্ছে না। চাইতে গেলে দূর দূর করে খেদিয়ে দেয়।

ফের কান্না। ফের মুখে আঁচল। ফের কেঁপে কেঁপে উঠছে মেয়েটা।

—আহ্, শান্ত হোন। শুভময় মৃদু ধমক দিল,—আপনার কাছে আদালতের হুকুমের কোনও কাগজপত্র আছে?

—আছে হুজুর। নারায়ণদা আমায় দিয়ে গেছে।

ব্লাউজের তলা থেকে কাপড়ের একটা বটুয়া বার করল মেয়েটা। বটুয়ার অভ্যন্তর থেকে একটি দোমড়ানো কাগজ।

উঠে গিয়ে কাগজটা নিয়েছে পরেশ। সাবধানে ভাঁজ খুলে দেখল একবার, তারপর বাড়িয়ে দিয়েছে শুভময়কে। হ্যাঁ, কোর্ট অর্ডারেরই কপি বটে। আগের এস-ডি-জে-এম তমাল সিংহরায় আদেশ দিয়েছিল। সি-আর-পি-সি'র একশো পঁচিশ ধারা মোতাবেক শ্রীঅরুণ পাত্র শ্রীমতী তাপসী পাত্রকে প্রতি মাসে সাতশো টাকা করে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবে...

কাগজটা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে শুভময় জিজ্ঞেস করল,—কোন মাস থেকে পাচ্ছেন না টাকা?

—ভাদ্র মাস থেকে হুজুর।

—অঘ্রান তো এখনও শেষ হয়নি...তার মানে তিন মাস?

—হ্যাঁ হুজুর। আমার আর চলছে না।

—আপনার কোনও রোজগারপাতি নেই?

—বলার মতো কিছু নয়। মা আর আমি বড়ি আচার তৈরি করে বিক্রি করি। টাকার অভাবে তাও বন্ধ হওয়ার জোগাড়। কাঁচামাল কিনতেও তো এক দুশো টাকা লাগে।

—মা আর বাচ্চা ছাড়া আর কে আছে বাড়িতে?

—আর কেউ নেই। বাপ তিন বছর হল মারা গেছে।

—আপনি তাঁদের একটিই মেয়ে?

—দুই দিদি আছে। বড়দিদির বিয়ে হয়েছে নাড়াজোলে, ছোটদিদির শ্বশুরবাড়ি হাউর।

—উম্। তা স্বামী টাকা দিচ্ছে না কেন? রোজগারপাতি নেই?

—খুব আছে। রাধানগর কোল্ড স্টোরেজে কাজ করে। তিন-চার হাজার টাকা পায়।

—সে কী? তা হলে এমন করছে কেন? সে কি আবার একসঙ্গে ঘর করতে চায়?

—চাইলেই বা যাব কেন হুজুর! মেয়েটি যেন একটু ফুঁসে উঠল,—সে তো আবার বিয়ে করেছে।

—বিয়ে? ডিভোর্স হয়েছিল আপনার সঙ্গে? মানে কাটান ছেড়ান?

—না হুজুর।

শুভময়ের হাসিও পেল, আবার বুঝি বা একটু যন্ত্রণাও হল। কী আজব দেশ! মেয়েরা কী অদ্ভুত সারল্যে বরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা বলে! জানেও না আইনি বিচ্ছেদ না হলে দ্বিতীয় বিয়ে করা যায় না! মানুষ যেখানে এত অবোধ, এত অশিক্ষিত, সেখানে আইনের তলোয়ার কাঁধে শুভময় নেহাতই এক নিধিরাম সর্দার ছাড়া আর কী!

শুভময় মাথা নেড়ে বলল,—ঠিক আছে, আপনি এখন নেমে আসুন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে একটা কাগজ দেওয়া হবে তাতে সই করে যাবেন। জানেন তো সই করতে?

—হ্যাঁ হুজুর। এইট পর্যন্ত পড়েছি।

—তা হলে তো অসুবিধে নেই।... আমি দেখছি কী করা যায়। আর হ্যাঁ, আপনার আর আপনার স্বামীর পুরো নাম ঠিকানাও পেশকারবাবুকে দিতে হবে। পারবেন তো?

—পারব।

অরুণ পাত্র নামক চিড়িয়াটির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারির যথাবিহিত নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী কেসটায় মন দিল শুভময়। শুনানি। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে মারপিটের।

পর পর আরও চারখানা মামলার সওয়াল-জবাব শুনে শুভময় এজলাস থেকে নামল সাড়ে চারটে নাগাদ। চেম্বারে বসতে না বসতে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হাজির। এক গোছা টি-এ আর কন্টিনজেন্সি বিল সই করাতে এসেছে। প্রতিটি বিলই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শুভময়, কোথাও কোনও অসঙ্গতি দেখলে কেটেকুটে দেয়। আজ অবশ্য সব বিলই মোটামুটি নিখুঁত, তবু দেখে নিতে বেশ খানিকটা সময় গেল শুভময়ের। কাজকর্ম যখন শেষ হল, ছোট্ট মহকুমা শহরে আবছায়া গাঢ় হচ্ছে তখন।

দুয়ারে প্রস্তুত ভবানী। থানা থেকে নিযুক্ত দেহরক্ষীটিও। কোর্টে এতক্ষণ হাফ স্লিভ সোয়েটার পরে ছিল শুভময়, বেরনোর আগে ছাইরঙা কোটটা চড়িয়ে নিল গায়ে। শীত খুব একটা টের পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভোরে একবার ঠান্ডা লেগেছে, আর বীরত্বের দরকার নেই।

কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে বাংলো মিনিট চারেকের পথ। কপাল ভাল, রাস্তাটা অন্ধকার নয়। সম্প্রতি স্ট্রিটলাইট লাগিয়েছে পুরসভা, সব বাতিই জ্বলছে আজ।

অর্থাৎ সন্ধেবেলা আজ ভোল্টেজ আছে মোটামুটি।

শুভময় ধীর পায়ে হাঁটছিল। দু'পাশে দুই অনুচর। হঠাৎই সামনে এক অ্যাম্বাসাডার। কোর্টের দিকে যাচ্ছে। শুভময়কে দেখেই থেমে গেল গাড়িটা। দরজা খুলে নেমেছে চন্দ্রচূড় চৌধুরী। বছর চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বয়স, তীক্ষ্ণ নাসা, গৌরবর্ণ, অভিজাত চেহারার মানুষটি মহকুমা আদালতের নামী আইনজীবী, জেলা সদরেও মামলা করতে ছোটে ঘনঘন।

হাতজোড় করে শুভময়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেল চন্দ্রচূড়, —চলে যাচ্ছেন স্যার? আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই দৌড়তে দৌড়তে আসছি।

মেজাজটা আজ তিরিক্ষি নয় শুভময়ের। শ্রান্তিও কম। লঘু গলাতেই বলল, —আপনারা কি চান সারা সন্ধে আমি কোর্টেই বসে থাকি?

—না না, ছি ছি, তা কেন। চন্দ্রচূড় ঝকঝকে দাঁত ছড়িয়ে হাসছে, —আমার একটা নিবেদন ছিল স্যার।

শুভময় পলকে সতর্ক। চন্দ্রচূড় কোর্টের বাইরেও হুটহাট নিজের মামলার প্রসঙ্গ তুলে বসে কখনও কখনও, শুভময়ের যা একেবারেই পছন্দ নয়। সব সময়ে তো রূঢ় হওয়া যায় না, কায়দা করে এড়াতে হয়। একটা ফোর নাইনটি এইটের কেসে ছেলের বাড়ির হয়ে লড়ছে খুব, সেটার কথা তুলবে না তো?

মুখে একটা ইলাস্টিক হাসি টানল শুভময়, —বলে ফেলুন।

—হয়তো শুনে থাকবেন, এই অধীন ... মানে আমি একটা ছোট রিসর্ট মতো বানিয়েছি ...

—তাই নাকি? কোথায়?

—দুধকুমড়ায়। ... ঠিক প্রপার দুধকুমড়া নয় ... আমাদের শীলাবতী যেখানে রূপনারায়ণে মিশছে ... মোটামুটি সেখানেই। গ্রামের মধ্যেই, কিন্তু অল পসিবল্ মডার্ন অ্যামিনিটিজ থাকবে। রিসর্টের নিজস্ব বোটে নদীতে ঘোরা যাবে, এ ছাড়া রিসর্টের নিজস্ব সুইমিং পুল টুল তো আছেই। প্রায় দশ একর জায়গা নিয়ে করছি।

—বাহ্, বাহ্। খুব ভাল। রিসর্টই তো এখন মডার্ন ফ্যাশান।

—এটা কিন্তু সো কলড রিসর্টের মতো নয় স্যার। এখানে কোনও মহিলাঘটিত নোংরামি-টোংরামি চলবে না। সবাই ফ্যামিলি নিয়ে আসবে, মুক্ত বায়ু সেবন করে তরতাজা হবে ... যাকে বলে ইকো ট্যুরিজম, আমি সেই ব্যাপারটাই চালু করতে চাই। কলকাতার কয়েকটা ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথাও হয়ে গেছে। ওরা রিসর্টে পর্যটক আনার জন্য কন্ডাকটেড ট্যুরও চালু করবে।

—হুম্। আপনি কি আর আটঘাট না বেঁধে অত বড় প্রোজেক্টে নামার মানুষ!

—লজ্জা দিচ্ছেন স্যার? ... ফ্র্যাংকলি বলছি, পয়সা অল্পবিস্তর কামাই বটে, তা লাগিয়ে দু'-চার রকম কারবারও যে করি না, তা নয়। তবে এই লাইনটা আমার মাথাতেই আসেনি। যা হচ্ছে, সব ছেলের উৎসাহে। বাপ-ঠাকুরদার পেশায় এল না ঠিকই, কিন্তু মাথা তার খুব সাফ। সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে সমস্ত যোগাযোগ করেছে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আধুনিক কেতাকায়দার বাড়ি-ঘর-দোর বানাল...

—গুড। ভেরি গুড। আপনার ছেলেকে আমার অভিনন্দন।

—শুধু অভিনন্দনে হবে না স্যার। আশীর্বাদও চাই।

—বেশ। তাও দিলাম।

—ওভাবে নয় স্যার। পঁচিশে ডিসেম্বর রিসর্টের ওপেনিং সেরিমনি, সেদিন স্যার আপনাকে যেতেই হবে।

—আমি? শুভময় কুঁকড়ে গেল, —আমি রিসর্টে গিয়ে কী করব?

—ওই যে বললাম, উপস্থিত থাকবেন। ছেলেটার মাথায় একটু হাত রাখবেন। বলেই বাজখাঁই হাঁক, —সুবল...? অ্যাই সুব্‌লা? কার্ডের বান্ডিলটা দিয়ে যা।

ড্রাইভার পড়িমরি দৌড়ে এসে নিমন্ত্রণপত্রের তাড়া ধরিয়ে দিল চন্দ্রচূড়কে। রাস্তার আলোয় কার্ড বাছছে চন্দ্রচূড়। শুভময়ের ভাল লাগছিল না। অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বলল, —কেন আমায় বলছেন চন্দ্রচূড়বাবু? জানেনই তো, আমি কোথাও যাই টাই না।

—জানি বলেই তো এত করে বলছি। এ তো ঠিক আমার ব্যাপার নয়, ছেলের অনুষ্ঠান। ব্যস্, একবারটি পায়ের ধুলো দেবেন। ছেলেই গাড়ির বন্দোবস্ত করে রেখেছে। আপনাকে বাংলো থেকে তুলে নিয়ে যাবে, পৌঁছেও দেবে। কলকাতা থেকে মন্ত্রী আসছেন, তারপর ধরুন ডি-এম, এস-পি, জেলা সভাধিপতি ...

—এ তো চাঁদের হাট! আমি চুনোপুঁটি মানুষ ... আমাকে বাদই দিন।

—কী বলছেন স্যার! আপনারা না থাকলে ...। না বলবেন না স্যার। দেখবেন, গিয়ে ভালই লাগবে। চন্দ্রচূড় কার্ডটা বাড়িয়ে দিল। হেসে বলল, —জীবিকার বাইরেও একটা জগৎ আছে স্যার। জীবিকার সঙ্গে সেই জগৎকে গুলিয়ে ফেললে চলবে কেন! তা হলে সমাজ সম্পর্ক এসবের আর কী দাম রইল!

জীবিকা আর জগৎ যার জীবনে সমার্থক তার ক্ষেত্রে এসব কথা খাটে কি? শুভময় বুঝতে পারে না। আর পারে না বলেই ঋতির কাছে পর্যন্ত সে অপ্রিয়। হয়তো আগ্রহভরে সদ্য লেখা কোনও কবিতা শোনাচ্ছে ঋতি, শুভময়ের মাথায় তখন ঘুরছে আইনের ধারা উপধারা। ঋতির খর চোখে কত বার ধরা পড়ে গেছে শুভময়, কত অনর্থ ঘটেছে। টুকরো চিন্তাটা হয়তো এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক নয়, তবু কেন যেন মনে হল শুভময়ের।

চন্দ্রচূড় ফের বলল, —তা হলে আপনাকে কিন্তু এক্সপেক্ট করছি স্যার?

আলগা হাসল শুভময়, উত্তর দিল না। চন্দ্রচূড় যা খুশি ভেবে নিক, মনে মনে সে তো স্থিরই করে ফেলেছে, যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খামোকা কচলাকচলি করার কী প্রয়োজন! পরেশ জানার সঙ্গে চন্দ্রচূড়ের বেজায় খাতির, পরেশকে প্রায় গৃহভৃত্যের মতো ব্যবহার করে এই ধনী আইনজীবী। অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। শুভময় অন্ধও নয়, বধিরও নয়, কোর্টের যাবতীয় খবর তার গোচরে আসে বই কী। এই যে ভবানীর চন্দ্রচূড়কে দেখে নুইয়ে পড়া ভাব, তার পাশে থেকেও, এও তো চন্দ্রচূড় চৌধুরীর অর্থপেশিরই মাহাত্ম্য। এমন ধারার মানুষের সংস্রবে না আসাটাই কি মঙ্গলজনক নয়? ওই সময়টায় কলকাতা চলে গেলে কেমন হয়? পঁচিশে ডিসেম্বর সোমবার, শনিবার হাফডে কোর্ট করে কেটে পড়াই যায়। লোকটা ছেলের নাম করে গাড়ি পাঠাবে, শুভময় না বললে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে, ঝুলোঝুলি করবে, এর ওর তার উদাহরণ দেবে ... অসহ্য।

মেজাজ কষটে মেরে গেছে। বিস্বাদ মুখে বাংলোয় ফিরল শুভময়। রতন গরম জল করে রেখেছিল, মুখ হাত পা ধুল ভাল করে, তারপর চা জলখাবারের পাট চুকিয়ে শাল মুড়ি দিয়ে টিভি চালিয়েছে। খবরটা সে দেখে নিয়মিত। কিন্তু এখন কোথাও খবর নেই, চ্যানেল ঘুরিয়ে অ্যানিমেল প্ল্যানেটে এল শুভময়। জঙ্গলে জীবজন্তুর শিকারের কলাকৌশল দেখাচ্ছে। এসব চ্যানেল মন্দ লাগে না শুভময়ের। মানুষের চেয়ে জন্তুজানোয়ার ঢের ভাল। অন্তত তাদের আচরণে কোনও ছলচাতুরি নেই।

রতন কখন যেন পাশে হাজির। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল —স্যার, একটা কথা ছিল।

শুভময় পরদা থেকে চোখ সরাল, —কী?

—আজ আমার বাবা এসেছিল। রতন অধোবদন, —আমার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে স্যার।

—বলিস কী রে? শুভময় রীতিমতো চমকিত, —কবে বিয়ে?

—দেরি আছে স্যার। ফাল্গুনে।

—তুই মেয়ে দেখেছিস?

—আজ্ঞে না। ... বিশ্বাস করুন স্যার, এত তাড়াতাড়ি বিয়েশাদির আমার ইচ্ছে ছিল না। বাবাই জোর করে ...। বলছে, বাইশ বছর পুরে গেল, আর কতদিন আইবুড়ো থাকবি!

শুভময় টেরিয়ে দেখল রতনকে। চোর ডাকাত দেখে দেখে তার চোখ আর এখন মানুষ চিনতে বড় একটা ভুল করে না। মুখে অনিচ্ছে দেখাচ্ছে বটে, তবে রতনের মুখমণ্ডলে চাপা খুশির হিল্লোল।

হেসে ফেলে শুভময় বলল, —এত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন? বিয়ে করাটা কোনও দোষের কাজ নয়। করবি বিয়ে। বুক ফুলিয়ে করবি।

—তা নয় স্যার। ভাবছিলাম আবার ছুটি নিতে হবে, আপনি অসুবিধেয় পড়ে যাবেন...

—আমার জন্য বিয়ে আটকে থাকবে নাকি? একটা লোকফোক দিয়ে যাস্...

—সে বলতে হবে না স্যার। লোকের ব্যবস্থা না করে বিয়ে করতে যাবই না।

শুভময় এবার শব্দ করে হেসে উঠল। যেন এমন মজার কথা বহুকাল সে শোনেনি। শুভময়ের এমন উচ্চকিত হাসিতে রতন অভ্যস্ত নয়, জুলজুল তাকাচ্ছে।

হাসতে হাসতে শুভময় বলল, —যা, বউয়ের কথা ভেবে এখন থেকেই রান্না পোড়াস না। গ্যাসে কী বসিয়েছিস দ্যাখ গিয়ে, চড়চড় আওয়াজ হচ্ছে।

জিভ কেটে দুদ্দাড়িয়ে ছুটল রতন। বাঘসিংহের শিকারপর্ব শেষ, পরদায় এখন গৃহপালিত পশুর হরেক কেরামতি দৃশ্যমান। টিভি বন্ধ করে শুভময় উঠে পড়ল। বিছানায় শুয়ে এবার বই-টই উল্টোবে। পুজোর পরে বেশ কয়েকটা শারদসংখ্যা নিয়ে এসেছিল কলকাতা থেকে, পড়বে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে।

শোওয়ার ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা। আসবাব বলতে একটা ডবলবেড খাট, স্টিলের আলমারি, আলনা, এক সেট চেয়ার টেবিল, ব্যস্। ঋতি কলকাতা থেকে পুরনো ড্রেসিংটেবিলখানা নিয়ে আসতে বলেছিল, শুভময় আনেনি, একটা বড়সড় আয়না ঝুলিয়ে নিয়েছে দেওয়ালে। জিনিস কম বলে প্রকাণ্ড ঘরখানাকে যেন আরও বিশাল দেখায়। বড্ড বেশি শুনশান।

ঘরে এসে পুজোসংখ্যাগুলো খুঁজছিল শুভময়। টেবিলেই তো পড়ে থাকে, গেল কোথায়? রতন নিয়ে গিয়ে ওঘরের বুককেসে পুরে দেয়নি তো?

শুভময় গলা ওঠাল, —রতন? টেবিলের বইগুলো কোথায় তুলেছিস?

—ওখানেই আছে স্যার। রতন সাড়া দিল, —টেবিলটা আজ ভাল করে মুছছিলাম ... ড্রয়ারে রেখেছি।

লম্বা শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে টেবিলের সাইড ড্রয়ারখানা খুলল শুভময়। পুজোসংখ্যার গোটা স্তূপটাই বার করে রাখল বাইরে। অনেকগুলোতেই ঋতির কবিতা আছে। আজকাল বড় দুর্বোধ্য কবিতা লেখে ঋতি। বড় বেশি সাংকেতিক। রহস্যময়। গল্প-উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে শুভময় মাঝে মাঝেই চলে যায় ঋতির কবিতায়। বিড়বিড় করে পড়ে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা চালায়। পারে না, তবুও।

আজও ঋতির কবিতা আছে এমন একটা পত্রিকা বাছল শুভময়। বাকিগুলো গুছিয়ে ফের ঢুকিয়ে রাখছিল, হঠাৎ চোখ আটকেছে ভেতরে। ঋতির সিগারেটের প্যাকেট! পাশে লাইটারটাও। ফেলে গেছে? প্যাকেটখানা হাতে নিয়ে শুভময় নেড়েচেড়ে দেখল একটু। চারটে পড়ে আছে। উফ্, ইদানীং কী কড়া সিগারেট খাচ্ছে ঋতি।

প্যাকেটখানা স্বস্থানে রেখে শুভময় বিছানায় এসে আধশোওয়া। পাশেই পড়ে আছে রিডিংগ্লাস, পরছে না চশমা। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে এক চিলতে হাসি। মলিন। বিষাদমাখা। এককালে শুভময় সিগারেট খেলে ঋতি নাক সিঁটকোত, এখন সে নিজেই নেশার দাস, আর শুভময় তামাক বর্জন করেছে। একেই কি বলে নিয়তির পরিহাস?

পুরনো কথা মনে পড়ছিল শুভময়ের। কী ধূমপানটাই না সে করত এক সময়ে। তামাকের গন্ধ সইয়ে নেওয়ার জন্য শুভময়ই তো জোর করে ঋতিকে টান দেওয়াত সিগারেটে। আনাড়ি ঋতি প্রথম প্রথম বিষম খেয়ে একসা। মুনিয়া চলে যাওয়ার পর ঋতির কী যে হল, শুভময়ের প্যাকেট থেকে হুটহাট ধরাতে শুরু করল যখন তখন। অথচ শুভময় তখন আর সিগারেটে স্বাদই পায় না; উল্টে ধোঁয়া ভেতরে গেলে অদ্ভুত এক বিবমিষা ঠেলে ওঠে যেন। সে সময়ে ঘরে সিগারেট না থাকলে ঋতি নিজেই আনতে দিত। তারপর তো ঋতি কলকাতাতেই চলে গেল। শোকের তীব্র অভিঘাত কাটিয়ে ওঠার পর ফিরল কবিতা লেখায়। কিংবা হয়তো মুনিয়াকে ভুলতেই কবিতাকে আঁকড়ে ধরল। ধূমপানের অভ্যেসটাও পাকাপাকি ভাবে রোপিত হয়ে গেছে তখন। মাথাভাঙা

থেকে রামপুরহাট বদলি হল শুভময়, নিজে থেকেই এল ঋতি, কিন্তু টিকতে পারল কই। মাস দুয়েক যেতে না যেতে কেমন যেন হয়ে গেল। অকারণে ক্ষিপ্ত হচ্ছে, ভাঙচুর করছে জিনিসপত্র, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে, জেগে থাকে সারা রাত, ঘুমের বড়ি খেয়েও চোখ বোজার নামটি নেই ...। শুভময় তখন সিটিয়ে থাকত সর্বক্ষণ, না জানি কখন কী ঘটে যায়। ঋতিকে সেই সময়ে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর কথাও ভেবেছে শুভময়।

তার অবশ্য প্রয়োজন হয়নি। সাড়ে তিন মাসের মাথায় ঋতিই দুম করে চলে গেল কলকাতায়। শুভময় যেন একটু স্বস্তিই পেয়েছিল। বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকতে হলে ঋতি অস্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে, এমন একটা ভাবনা থেকে নিজেও ছুটি নিয়ে মাস দুয়েকের জন্য এল কলকাতায়, দু'কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিল একখানা। শ্যালককে বলে বুঝিয়ে ঋতির মাকেও এনে রাখল সেখানে। মা মেয়েকে থিতু করে দিয়ে ফিরল কর্মস্থলে।

কলকাতাই ঋতিকে স্বাভাবিক করেছে ক্রমশ। রামপুরহাটেও পরে সে গেছে এক আধবার। কালিম্পং-এও মাঝে মাঝে বুড়ি ছুঁয়ে এসেছে। কিন্তু ওই দু'-চার দিনের জন্যই, তার বেশি নয়। বছর তিনেক হল বুটিক খুলেছে একটা। বাড়ির কাছাকাছি। বাসরাস্তার ওপর। গ্যারাজ-ঘর ভাড়া নিয়ে। বুটিক আর কবিতা, দুইয়ে মিলে এখন সে বেশ ব্যস্তই থাকে কলকাতায়। নিজের পৃথিবীতে, নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেশ আছে ঋতি।

ঋতি বেশ আছে। শুভময়ের একটা ভারী শ্বাস পড়ল। বেশ আছে ঋতি। তার আর ঋতির মধ্যিখানে এখন এক বরফের কফিন। সেখানে শুয়ে আছে সেই মেয়ে। মাথা ভরা রেশম রেশম চুল, ফোলা ফোলা গাল, পুতুল পুতুল চোখ, ঠোঁটে আধো আধো বুলি। শুভময় কোর্ট থেকে ফিরলে ঝাঁপিয়ে আসত কোলে, চুমু খেত অফুরান, হাসত খলখল।

মুনিয়ার শূন্যস্থানে আর কেউ আসবে না কখনও। মুনিয়া হওয়ার পর পরই পিউপেরাল সেপসিস হয়েছিল ঋতির, দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা তখনই ঘুচে গেছে। চিরকালের মতো।

শুয়ে শুয়ে বরফের কফিনটাকে দেখতে পাচ্ছিল শুভময় । সাদা। ভয়ংকর সাদা।

তিন

চরম মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা কী? উত্তর— চোদ্দোতলার ছাদ থেকে মোক্ষম ঝাঁপ মেরেছে শাশুড়ি। পড়বি তো পড় পড়ছে জামাইয়ের সদ্য কেনা মার্সিডিজের চালে। সেই মুহূর্তে খুশি আর দুঃখ মাখা জামাইয়ের প্রতিক্রিয়ারই নাম...।

মোবাইলে জোকটা পড়ে ফিক করে হাসল ঋতি। সোমদত্ত পারেও বটে। দুপুর থেকে এই নিয়ে তিন নম্বর। অফিসে কি কাজকর্ম নেই? বসে বসে শুধু জোক তৈরি করে? সরকার কি তার জন্যই মাইনে দেয়?

মালকিনের হাস্যমুখ দেখে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে বুটিকের মেয়ে দুটো। এতক্ষণ জব্বর ঝাড় খাচ্ছিল ঋতির কাছে। সাধারণত ঋতি বকাঝকা করে না বড় একটা, বন্ধুর মতোই মেশে টুম্পা, পাপিয়ার সঙ্গে। কিন্তু কারণ পড়লে গামছা তো নিংড়োতেই হয়। ওসমান পরশু চার সেট সালোয়ার স্যুট ডেলিভারি দিয়ে গেছে, খানিক আগে এক খদ্দের এসে একটা সেট পছন্দও করল ... ঋতি বিল কাটছে, তখনই আবিষ্কৃত হল কামিজের পিছনে সুতো সরে আছে! আঠেরোশো টাকা দিয়ে ওই জিনিস কিনবে কেউ? ঋতি যখন বুটিকে নেই, ঘরে তোলার আগে মাল তোরা দেখে নিবি না?

যাই হোক, মেঘটা কেটেছে। পাপিয়া টুম্পার ঠোঁটে চোরা হাসি। ফুলিয়া থেকে আসা আনন্দ বসাকও ঋতির তর্জন গর্জনে একটু সিঁটিয়ে ছিল, এবার সেও গা ঝাড়া দিয়েছে। শাড়ির গাঁটরি বাঁধতে বাঁধতে বলল, —এবার তা হলে আমারে ছাড়েন দিদি। এরপর তো সাতটা পাঁচের লোকালটাও পাব না।

ঋতি ভ্রূভঙ্গি করল, — কেন? কটা বাজে এখন? সবে তো সাড়ে পাঁচটা। কসবা থেকে শেয়ালদা কতক্ষণ লাগে, অ্যাঁ?

—শাড়ি নিয়ে একবার চিত্রাদির বাড়ি যেতে হবে। উনি একটা দুটো পছন্দ করলেন তো ভাল, তারপর মাল ওখানেই রেখে যাব।

—ইচ্ছে হলে আমার বাড়িতেও রাখতে পার। কাছেই তো। কিংবা বুটিকেই...

—কিন্তু চিত্রাদিকে যে কথা দিয়েছি যাব।

—ও। তা হলে তাড়াতাড়ি বুঝে নাও কী বলছি। ঋতি কাউন্টারে গুছিয়ে বসল, গোল্ডেন কালারের শাড়িতে যেমন ট্র্যাডিশনাল ঢালা জরিপাড় হয়,

তেমনই হবে। তবে অফ হোয়াইট ঢাকাইটা অন্যরকম। ওটাতে আমি জিওমেট্রিকাল প্যাটার্ন চাই।

—নকশা কি পাড়ে?

—শুধু পাড়ে নয়, আঁচলেও।

—আঁচলে কি ওই ডিজাইন আনা যাবে দিদি?

—না পারলে তাঁত বোনা ছেড়ে দাও। তোমাদের ফুলিয়া থেকে কী দারুণ দারুণ সব কাজ বেরোচ্ছে দেখেছ তাকিয়ে?

আনন্দ হেসে ফেলল, —ভাল করে একটু আঁইকা দ্যান। ভায়েরে গিয়া দ্যাখাই। ওর মাথায় আইডিয়াগুলান খ্যালে ভাল।

—যাকে খুশি দেখাও। নিউ ইয়ারে আমার চাই।

—অত তাড়াতাড়ি কি হয় দিদি? হাতের কাজ ... একটা ঢাকাইয়ে পুরা এক মাস তো লাগেই। কম পরিশ্রম? সে তুলনায় তো দামও পাওয়া যায় না।

—অ্যাই, প্রত্যেকবার তুমি এক কথা বোলো না তো। ঋতি চোখ পাকাল, —ঠিক আছে, ঢাকাই দুটোয় সময় নাও, তবে সামনের সপ্তাহের মধ্যে তাঁতপ্রিন্টগুলো অবশ্যই দিয়ে যাবে।

—অফ হোয়াইট ঢাকাইয়ে পাড় আঁচলের কালার কী হবে দিদি?

—ওফ্ আনন্দ, আগেই তো বললাম। জমি অফ হোয়াইট, পাড় নেভি ব্লু।

—পাড়ের চওড়া কতটা হবে?

ঋতি চোখ বুজে ভাবল একটু। বলল, —কম করে ন'ইঞ্চি। দশও রাখতে পারো।

আনন্দ গাঁটরি টেনে উঠতে গিয়েও গা মোচড়াচ্ছে। ঋতি চোখ নাচাল, —কীই?

—কিছু হবে না দিদি? দেওয়ালির পর থিকা হাত অ্যাক্কেরে খালি।

—সে তো আমারও। দেখতে পেলে তো, চোখের সামনে দিয়ে টাকা পালিয়ে গেল।

—তবু ... আপনাদের দিদি হাত ঝাড়লেই...

এবার মুখে নয়, মনে মনে হাসল ঋতি। তাকে যে কত টিপে টিপে চালাতে হয়, সেই জানে। গলাটাকে হালকা রেখেই ঋতি বলল, —আজকের দিনটা বাদ দাও। সামনের সপ্তাহে দেখি কতটা পারি। বুধবার আমার বন্ধ ... বেস্পতিবার ছেড়ে শুককুরবার।

একটু যেন বেজার হয়েই বিদায় নিল আনন্দ। ঋতিও বেরোল কাউন্টার

ছেড়ে। একটানা বসে থেকে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে পায়ে। কেমন যেন ওজনদারও লাগছে পা দুটো। আজকাল এই এক উপসর্গ হয়েছে, বেশিক্ষণ পা ঝুলিয়ে রাখলেই ফুলে যাচ্ছে পায়ের পাতা। ঈষৎ ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বুটিকের বাইরেটায় এল ঋতি। আলগা চোখে তাকিয়ে আছে বুটিকের পানে। নাহ্, চেহারাটা বেশ দেখনবাহারি। আস্ত একখানা গ্যারাজঘর, সাইজ মোটেই ছোট নয়। দু'ধারে টানা ওয়ালকেস, কাচের পাল্লায় হাতে আঁকা দেবদাসীর মোটিফ, পিছনে দেওয়াল জোড়া আয়না— সাজানো গোছানো দেখে লোকে তো বেশ তারিফই করে। এবার পুজোর আগে জায়গা বাঁচিয়ে ছোট্ট ট্রায়ালরুম বানানো হয়েছে। কটা বুটিকে থাকে ট্রায়ালরুম? নামটাও সুন্দর, ঋতিরই দেওয়া। মায়াবিনী। একবার শুনলেই কানে লেগে যায়। তবু যে কেন ব্যবসাটা ধরছে না! কোথায় যে খামতি!

সন্ধে নেমে গেছে। আলোয় ঝলমল করছে মায়াবিনী। পায়ে পায়ে ফের ভেতরে এল ঋতি। কাউন্টার ছাড়া বুটিকে কোনও চেয়ার নেই, এদিক ওদিকে গদিমোড়া টুল ছড়ানো আছে খান কতক। টুলেই বসল ঋতি। পাপিয়াকে বলল, —অ্যাই, আর একবার চা খাওয়া যায় না রে?

—আনব?

—যা। তোরাও খাবি তো?

টুম্পা ফিচেল হাসল, —পাপিয়া বোধহয় খাবে না দিদি।

— কেন রে?

টুম্পার হাসি বাড়ল। দোপাট্টায় মুখ চেপে বলল, —চা খাওয়া ও কমিয়ে দিয়েছে। বরের বারণ।

—না গো দিদি। পাপিয়া হাঁউমাউ করে উঠল, —আমার অম্বল হয় বলে...

— তাপ্পি মারিস না। তোর বর বলেনি, চা খেলে মেয়েরা কালো হয়ে যায়?

ভীষণ লজ্জা পেয়েছে পাপিয়া। মুখ লাল করে বলল, —বিশ্বাস করো দিদি, সে ও কথা বলেনি। নিজে চা কম খায় তো, তাই...

—তার জন্য তুইও কমাবি? বিয়ের আগে তোর অম্বল ছিল না? নাকি বিয়ের পরেই ধরল? যত্ত সব ঢং।

ঋতি মুখ টিপে হাসছিল। ঈষৎ মনমরা ভাব কেটেছে যেন, উপভোগ করছে দুজনের চাপান উতোর। এই সবে অঘ্রানের গোড়ায় বিয়ে হয়েছে পাপিয়ার, সুখে এখন ডগমগ করে সারাটা দিন। কপাল থেকে সিঁদুর টানে, হাতে ব্রোঞ্জের চুড়ির সঙ্গে ঝনাত ঝনাত বাজে শাঁখা পলা। মাঝে মাঝেই ঢুলুঢুলু চোখে

তাকিয়ে থাকে বাইরে। বর সামান্য চাকুরে, কোন এক কারখানায় যেন কাজ করে, দেখতেও বেশ চোয়াড়ে মার্কা। তবু একটা বিয়ে তো হয়েছে, এই খুশিতেই মেয়েটা বদলে গেছে কত। টুম্পা বোধহয় মনে মনে এখন একটু হিংসেই করে পাপিয়াকে। বেচারা টুম্পার এক্ষুনি এক্ষুনি বিয়ে হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তারা পাঁচ ভাই বোন, মাথার ওপর এখনও দু' দুটো অনূঢ়া দিদি, বাবা বড়বাজারের মশলাপট্টিতে খাতা লেখে, তেমন রোজগারও নেই বাবার...। তাছাড়া পাপিয়ার মতো লাবণ্যও নেই টুম্পার। চোখের সামনে পাপিয়া সর্বক্ষণ স্বামীসোহাগিনী মুখ করে থাকলে তার সইবে কেন! আহা রে, কোনও রকমে একটা বিয়ে হয়ে যাওয়া ছাড়া পাপিয়া টুম্পাদের জীবনে আর কীই বা স্বপ্ন থাকে?

পাপিয়া নয়, টুম্পা গেছে চা আনতে। ঋতি একটা হাই তুলে বলল, —কাউন্টার থেকে আমার শালটা দে তো। শীত শীত করছে।

—হ্যাঁ গো দিদি, ঠান্ডা বেড়েছে। উঠে শালখানা এনে দিল পাপিয়া, —আমাদের গড়িয়ার দিকে তো আরও শীত।

ঋতি রসিকতা করে বলল, —বিয়ের পর শীতকালেই তো মজা, তাই না?

—কী যে তুমি বলো না দিদি!

—তা শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগছে এখন?

—ঠিকই আছে। নতুন বউ কাজে বেরোয় বলে শাশুড়ির একটু চোখ টাটায়। তবে তার ছোট ছেলে তাকে বলে দিয়েছে, আমি নিজে গিয়ে বুটিকের পরিবেশ দেখে এসেছি। দিদি খুব ভাল লোক, পাপিয়া ইজিলি সেখানে কাজ করতে পারে।

—ও বাবা, তোর বর দেখি খুব বড় গার্জেন! তা সে যদি মানা করে, তুই কাজ ছেড়ে দিবি?

—সে খুব সেয়ানা গো। মানা করবেই না।

—কেন?

—আমাকে বলে দিয়েছে, আমার মাইনেটা জমাবে। বলেই হঠাৎ হিহি হাসতে শুরু করেছে পাপিয়া।

—কী হল রে?

—জানো দিদি... হিহি... আমি তাকে একটা মিথ্যে বলেছি। তুমি তো দাও বারোশো, আমি বলেছি আটশো। কখনও যেন ভুলেও ওকে বলে দিও না। টুম্পাকেও আমি মানা করে দিয়েছি।

ঋতি হতবাক। বর পেয়ে এত গলে পড়া ভাব, কিন্তু বুদ্ধিটুকু খোয়ায়নি! নিজের জন্য এক চিলতে বারান্দা তো রেখেছে মনে করে!

টুম্পা ফ্লাস্কে চা এনেছে। লেবু চা, হজমি দেওয়া। সঙ্গে তিনটে খুদে কাচের গ্লাস। চা ঢালতে ঢালতে বলল, —লিকারে চিনি দিয়ে ফেলেছিল গো দিদি। তাই লেবু হজমি মিশিয়ে আনলাম।

খুঁতখুঁত মুখে গ্লাসে চুমুক দিল ঋতি। নাক কুঁচকোচ্ছে। তখনই বুটিকে দুই তরুণী। একজন গোলগাল, ছোটখাটো। অন্যজন ঢ্যাঙা। ঘুরে ঘুরে ডানদিকের ওয়ালকেসে ঝোলানো সালোয়ারস্যুট দেখছে দুজনে। কী কাণ্ড, সুতো সরে যাওয়া কামিজখানাতেই চোখ আটকেছে, —এটা একটু বার করবেন?

টুম্পা এগোতে গিয়েও ইতস্তত করছিল। ঋতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —ওটা অলরেডি সোল্ড ভাই। পাশের ক্রেপ সিল্কটা দেখুন না, বাদলা কাজ করা।

—উমম্ না...আমি ওই কালারটাই...

—বেজ কালার এদিকেও একটা আছে। পাপিয়া, বের কর তো।

পাপিয়া পাল্লা খুলছে, হঠাৎই ঋতি দেখতে পেল সোমদত্ত আসছে রাস্তা পেরিয়ে। পরনে জিন্স টি শার্ট আর হাফস্লিভ সোয়েটার।

দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে সোমদত্ত। তাকে চোখের ইশারায় বসতে বলে ঋতি আবার সম্ভাব্য ক্রেতায় মনোযোগী। দুই তরুণীর কারুরই কামিজের কাটিংটা পছন্দ হয়নি, পাপিয়া টুম্পা তাদের আরও কয়েকটা বার করে দেখাল। কালচে মেরুনের ওপর সোনালি সুতোর কাজ কামিজখানা মনে ধরেছে লম্বা মেয়েটির, হাতে নিয়ে পরখ করছে গুণমান।

ঋতি বলে উঠল, —এটা ইটালিয়ান ক্রেপ ভাই।

—ফিটিংস্ ঠিক হবে?

—ট্রায়াল দিয়ে দেখুন না। অলটারের দরকার হলে আমরা তো আছি। পরলে এর গরজাসনেস আরও খুলবে।

—না... থাক... আসলে আমার ওই প্রথমটাই...

ঋতি রগুড়ে গলায় বলল, —প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হলে আর বুঝি কাউকে পছন্দ করতে নেই? সেকেন্ড চয়েসটা তো বেটারও হতে পারে।

দুটো মেয়েই খিলখিল হেসে উঠল। আড়চোখে সোমদত্তকে একবার দেখে নিয়ে বলল, —তা দ্বিতীয় প্রেমিকের দক্ষিণা কত?

— দেনাপাওনা নিয়ে ভাবতে হবে না। আগে ফিট করে কিনা দেখুন।

—তা বললে হয়? আমার তাকে গ্রহণ করার ক্যাপাসিটি আছে কিনা জানব না?

—তেমন অমূল্য কিছু নয়। পনেরোশোর মধ্যে।

একটু যেন দোটানায় পড়ল মেয়েটি, —এখন থাক। পরে আসব?

—পরে যদি আর না থাকে?

—দেন উই উইল সার্চ ফর দা থার্ড প্রেমিক।

সোমদত্ত ঘাড় কাত করে বাক্যালাপ শুনছিল। মেয়ে দুটো বেরিয়ে যেতেই বলল, —মায়াবিনী তো দারুণ কথা বলে!

ঋতি হতাশ ভাবে বলল, —তাও তো থোড়াই গছাতে পারলাম।

—সে এক আধটা সেয়ানা মাছি নয় গলে গেল, বেশির ভাগই নিশ্চয়ই জালে পড়ে?

ঋতি শুকনো হাসল। জবাব দিল না। দিনভর কটা কী বিক্রি তা যদি সোমদত্ত জানত। মাছি গলে গেল না কচু, মাছি তাড়ানোই তো সার। পুজোর সময়ে মোটামুটি ব্যবসা হয়েছে ঠিকই, তবে তা ভাঙিয়ে আর কত দিন চলবে? ওরে মায়াবিনী, কবে যে তুই নিজের পায়ে দাঁড়াবি!

সোমদত্ত বসে বসে পা নাচাচ্ছে। মাঝে মাঝেই সে হানা দেয় বুটিকে। বেশির ভাগ সময় দুপুরের দিকে। কাছেই তার অফিস, বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে, কেটে আসে টুকটাক। বুটিকে বসে বকর বকর করে যায় অবিরাম। টুম্পা পাপিয়ার সঙ্গেও তার দিব্যি ভাব।

টুম্পা বলল, —দাদা, চা খাবেন তো?

—চলতে পারে। চা আনার অনুমতি দিয়েই সোমদত্ত ঋতিকে বলল, —আচ্ছা, তোমাকে কি আগে কখনও খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি?

—অত মনে নেই। তবে না দেখাটাই সম্ভব। ঋতি মুচকি হাসল, —কাস্টমার আমার কোথায়?

—হুম্। আমার তো মনে হচ্ছে আজই প্রথম সেল্‌সগার্লের ভূমিকায় দেখলাম।

—তো?

—এক্কেবারে অন্যরকম লাগছিল। যে ঋতি মৈত্র কবিতা লেখে, এ যেন সে নয়।

—নাছোড়বান্দা দোকানদার মনে হচ্ছিল তো?

—তাও ঠিক নয়। তবে সামথিং ডিফারেন্ট। একটা অন্যরকম বিউটি তোমার চোখে মুখে খেলা করছিল।

সোমদত্ত এইভাবেই কথা বলে। ঋতির সব রকম অভিব্যক্তিতেই সে একটা সৌন্দর্য খুঁজে পায়। হয়তো বা একটু আগে টুম্পা পাপিয়ার ওপর চোখ রাঙানো দেখেও মোহিত হত।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল ঋতি। আনমনে বলল, —বুটিকের জন্য জায়গাটা চুজ করা বোধহয় ভুল হয়ে গেছে রে। এ সব এলাকায় বুটিক চলে না।

—এ কথা বলছ কেন? টাকা পয়সাঅলা লোক এদিকেও প্রচুর আছে।

—তারা মার্কেট প্লেসে গিয়ে কেনাকাটা বেশি পছন্দ করে। ঋতি বড় করে খানিকটা বাতাস ভরল ফুসফুসে, —যাক গে, ছাড়। তুই হঠাৎ সন্ধেবেলা এদিকে?

—জানতে এলাম আমার জোকস পেয়ে কতটা হেসেছ।

—কোত্থেকে পাস রে ওগুলো? মাথা থেকে বানাস নাকি?

—আছে আছে, ভাণ্ডার আছে। সব সিক্রেট ফাঁস করব কেন?

—বলিস না, যা। টুম্পা চা এনেছে, গ্লাস বাড়িয়ে দিল ঋতি, —তোর লেখালেখির খবর কী? চলছে?

—লেখালিখি তো চলেই। আমার তো অন্য সমস্যা। ছাপাছাপি। চোখের ওপর এসে পড়া ঝাঁকড়া চুল সরাল সোমদত্ত,—আমার কবিতা কেউ ছাপতে চায় না ঋতি। সম্পাদকদের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটখানা আমার জন্যই রাখা থাকে।

—বাজে বকিস না। পুজোয় তোর একুশটা পত্রিকায় কবিতা বেরিয়েছিল।

—সব কচি কচি পত্রিকা। কোনওটা রাজবলহাট থেকে বেরোয়, তো কোনওটা কেন্দুয়া। কিংবা ডিহিভুরশুট। বড় পত্রিকার সম্পাদকরা আমার লেখা মরা ইঁদুরছানার মতো ফেলে দেয়।

—অ্যাই, স্বদেশের বইমেলা সংখ্যায় তুই দীর্ঘ কবিতা লিখছিস না? আমি সব খবর রাখি।

—তার জন্য কত তেল খরচ হয়েছে সে খবর রাখ? অন্তত আট ঘণ্টা সম্পাদকের সামনে বসে হাত কচলেছি, তবে না হৃদয় দ্রব হল। একখানা দেড়মণি শ্বাস ফেলল সোমদত্ত,—ছাপাছাপির বড়ই সমস্যা।

সোমদত্তর কথায় কণামাত্র সত্যতা নেই, ঋতি ভাল মতোই জানে। বাংলা কবিতার আকাশে নতুন তারকা হিসেবে যথেষ্ট কদর আছে সোমদত্তর। বয়স কম হলেও তার লেখায় উগ্রতা কম, ছটফটে বেপরোয়াভাব নেই বললেই

চলে। সে নির্মাণ করে ভারী শান্ত পেলব এক জগৎ, কিছুটা যেন অতীন্দ্রিয়ও। যৌনতা থাকে বটে, কিন্তু অসম্ভব চাপা। পড়ার পরেও বেশ খানিকক্ষণ তার কবিতার রেশ থেকে যায় বুকে। কবিতা ছাপা নিয়ে তার আদৌ সমস্যা নেই, বরং সে একটু গেঁতো স্বভাবের, তাড়া লাগিয়ে লাগিয়ে তার কাছ থেকে কবিতা বার করতে হয়।

পৌনে সাতটা বাজে। পাপিয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। লক্ষ করে ঋতি বলল,—কী রে, যাবি নাকি?

—হ্যাঁ মানে... আর কি কাস্টমার আসবে দিদি? শীতকাল...

—বুঝেছি। বরের জন্য মন উচাটন।

ঋতি একটুখানি ভেবে দুজনকেই ছেড়ে দিল। শুধু শুধু বসিয়ে রাখার সত্যিই তো মানে হয় না। নিজেরও থাকতে ইচ্ছে করছে না আর। দুপুরে কেপ্‌রিজ বিক্রি হয়েছিল একটা, আর একখানা ব্লক প্রিন্টের শাড়ি, ক্যাশ থেকে টাকাগুলো নিয়ে রাখল ব্যাগে। বেরনোর আগে ভাল করে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল ভেতরটায়। একা হাতে কোলাপসিবল গেট লাগাল, হুড়হুড় করে নামাল শাটার। নীচের তালা কটা দেখে নিল টেনে টেনে।

সোমদত্ত টেরিয়ে টেরিয়ে লক্ষ করছিল ঋতির কার্যকলাপ। তরল হেসে বলল,—তোমার মাইরি এলেম আছে। সব কাজ নিজে নিজে করো।

—কী করব, তুই তো আর হাত লাগালি না!

—আমি তো তোমায় দেখছিলাম। তুমি কি জানো, এই সব কাজ করার সময়ে তোমার শরীরে একটা আশ্চর্য ঢেউ ওঠে?

ঋতি কোমরে হাত রেখে ঘাড় বেঁকাল,—অ্যাই, তোর বয়স কত রে এখন?

সোমদত্ত থতমত,—কেন? বত্রিশ। আই মিন, থারটি-টু প্লাস।

—আমি থারটি-নাইন মাইনাস। মানে আটত্রিশ পেরিয়ে গেছি।

—তো?

ঋতি যেন প্রশ্নটা শুনতে পেয়েও পেল না। জিজ্ঞেস করল,— তোর এখন কী প্ল্যান? নিশ্চয়ই এক্ষুনি বাড়ি ফিরছিস না?

—ভাবছি।

—ভাবতে ভাবতে হাঁট আমার সঙ্গে। আমি কিন্তু এখন বাড়িই যাব।

অঞ্চলটা প্রাচীন হলেও পাড়াটা তত পুরনো নয়। প্লট প্লট জমি কিনে গড়ে উঠেছে নয়া বসত। অধিকাংশই নিজেদের বাড়ি। একতলা, কি জোর দোতলা। হঠাৎ হঠাৎ বেশ কায়দার স্থাপত্যও চোখে পড়ে। ফ্ল্যাটও উঠেছে এন্তার।

তিনতলা। চারতলা। নতুন জায়গায় উঠে আসা মানুষজনের পাড়া বলে সন্ধের পর রাস্তায় ঘাটে ভিড় থাকে না বড় একটা। তার ওপর জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, পথ তো প্রায় শুনশান। পাতলা পাতলা কুয়াশা জড়িয়ে ঝিমোচ্ছে পথবাতিরা।

ঋতিরা মন্থর পায়ে হাঁটছিল। সোমদত্ত নীরব সহসা, ঋতিও কথা বলছিল না বিশেষ। হাঁটার ছন্দে মাঝে মধ্যেই সোমদত্তর চওড়া কব্জি ছুঁয়ে যাচ্ছে ঋতিকে। উঁহু, ঋতির মেরুন শালটাকে। স্পর্শটা যেন ঋতি অবধি পৌঁছচ্ছিল না।

আচমকাই সোমদত্ত বলল, —আমি আজ সত্যি সত্যি কেন এসেছিলাম জানো?

—নিশ্চয়ই আমার মুখ দেখতে নয়?

—ভুল। তোমারই মুখ দেখতে। দুপুর থেকেই মায়াবিনীকে বড় মনে পড়ছিল।

—তাই তুই সম্মোহিতের মতো চলে এলি?

—ঠিক তাই। তুমি আমাকে কেন এত টানো বলো তো? কী আছে তোমার মধ্যে?

—কী আর! কেজি আড়াই তিন রক্ত, তিরিশ পঁয়ত্রিশ কেজি মাংস, কিছু চর্বি আর দুশো ছ'খানা হাড়।

—ওগুলো যোগ করলেই কিন্তু ঋতি মৈত্র হয় না। যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু মনে মনে উপলব্ধি...

—আমরা কি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে পারি না সোমদত্ত? যেমন ধর, ওয়েদার। আজকের টেম্পারেচার কালকের চেয়ে বেশি না কম। কাল ভোরে কুয়াশা বাড়বে, কি বাড়বে না। কিংবা ধর, এবার বইমেলায় আমাদের কেন একটাও প্রকাশক জুটল না...।

সোমদত্ত যেন ঈষৎ আহত। ঋতি অপাঙ্গে জরিপ করল তাকে। বেচারার মুখখানা থমথমে হয়ে গেছে।

ঠোঁটে হাসির আভাস এনে সোমদত্তকে ঠেলল ঋতি, —অ্যাই সোমদত্ত, চটে গেলি নাকি?

সোমদত্ত হাসল না। অভিমানী স্বরে বলল,—তুমি আমাকে সোমদত্ত সোমদত্ত করো কেন? নিজেকে কেমন ভারী ভারী লাগে।

—তো কী বলে ডাকব?

—শুধু সোম বলতে পারো।

—খেপেছিস? সোম সপ্তাহের প্রথম দিন। সোম সোম করলে আমার দিন গুলিয়ে যাবে না?

কুয়াশা সরে যেন আলো দেখা দিল এক ফালি। টুকটাক কথা বলছে সোমদত্ত। তবে সুর অনেক সহজ, মনে হচ্ছিল ঋতির। বাড়ি এসে গেল।

কম্পাউন্ডের গেটে দাঁড়িয়ে পড়েছে সোমদত্ত। ঋতি ডাকল,—কী রে, আসবি না? চল।

—উঁ?

—সন্ধেটা বৃথা যাবে? আয় না, জমিয়ে একটু পি-এন-পি-সি করি।

—যাব? সোমদত্তর স্বরে ফের ঘোর,—ঘরের মধ্যে তোমায় দেখতে যে আমার ভাল লাগে না ঋতি।

—তা হলে ভাগ। আমিও গিয়ে বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকি।

—চিৎপাত! শব্দটা মোটেই পছন্দ হয়নি সোমদত্তর। উচ্চারণ করতে গিয়ে মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে গেল। যেন শারীরিক কষ্ট হচ্ছে। সামলে নিয়ে বলল,—তা হলে আবার কবে দেখা হবে?

—চলে আসিস বুটিকে। শুধু কালকের দিনটা বাদ দিয়ে। কাল মাকে নিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যাব। সেখান থেকে দাদার বাড়ি। কাল দাদার ছেলের জন্মদিন।

—বেশ আপাতত তবে বিদায়।

—সাবধানে যাস।

ঋতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোমদত্তর মিলিয়ে যাওয়াটা দেখল একটুক্ষণ। দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে কেমন দুলে দুলে চলে। ছেলেমানুষের মতো।

সোমদত্তকে কি আজকাল একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে ঋতি? নিজেকে যাচাই করতে করতে ঋতি সিঁড়ি ভাঙছিল। কে জানে কেন, সোমদত্তর আবেগের অনেকটাই তার ফাঁপা বলে মনে হয়। তবে মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, শুনতে তারও মন্দ লাগে না। তা শূন্য কুম্ভের আওয়াজ তো মিঠেই হয়, না কি?

ঋতির ফ্ল্যাট দোতলায়। নীচে গাড়ি রাখার জায়গাটাকে ধরলে তিনতলায়। দু'পাশে দুটো করে দু' কামরার ছোট ফ্ল্যাট, বছর দশেক আগে তৈরি। ঋতির ফ্ল্যাটওয়ালা থাকে গোলপার্কে, সেখানে তার নিজস্ব বাড়ি। এই ফ্ল্যাটখানা নেহাত ঝোঁকে পড়ে কিনেছিল, বছর সাতেক হল ভাড়া দিয়েছে।

ঋতি ফ্ল্যাটে পা রাখতে না রাখতেই স্মৃতিকণা কলকল করে উঠলেন,—ইশ, আর পাঁচটা মিনিট আগে আসতে পারলি না!

বাইরের চটি ছেড়ে হাওয়াই চপ্পল গলাচ্ছিল ঋতি। চোখ কুঁচকে বলল,—কেউ এসেছিল নাকি?

—শুভ ফোন করেছিল। খুঁজছিল তোকে।

—তাই? তা মোবাইল করল না কেন?

—বলল তোর মোবাইল নাকি বেজে যাচ্ছে। মেয়ের পিছু পিছু তার শোওয়ার ঘরে ঢুকেছেন স্মৃতি। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বললেন, —শুভময় শনিবার রাতে আসছে। বড়দিনটা এবার এখানেই থাকবে।

কী হল কেসটা? এই তো সেদিন ঘুরে এল ঋতি, এর মধ্যেই আবার শুভময়...? কলকাতায় কোনও কাজ পড়ল নাকি? কখনই বা ফোন করল মোবাইলে?

ব্যাগ থেকে খুদে যন্ত্রটা বার করল ঋতি। হ্যাঁ, মিস্‌ড কল একটা হয়েছে তো বটে। টাইম ছটা আটান্ন। অর্থাৎ সে যখন সোমদত্তর সঙ্গে হাঁটছিল। আশ্চর্য, ঋতি শুনতেই পেল না?

স্মৃতি বললেন, —তোকে আগে কিছু বলেছিল?

—কী ব্যাপারে?

—এই যে আসছে ...

—তা হলে তো তোমায় বলতাম মা। হয়তো কোনও দরকার পড়েছে ...

—তুই একটা ফোন করে নে না।

—বলেছে করতে?

—তা নয়, তবু...। করতে হয় ঋতি। করা উচিত।

—তোমায় ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না মা। ... খাবার দাবার আছে কিছু?

স্মৃতি গোমড়া মুখে বললেন, —মঙ্গলা নোন্‌তা সুজি করে গেছে।

—চটপট দাও। পেট চুঁইচুঁই করছে।

অপ্রসন্ন চোখে মেয়েকে দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেলেন স্মৃতি। ঋতিও ঢুকল বাথরুমে। শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে নিল, আয়নায় টুকুন দেখল নিজেকে। ফর্সা লম্বাটে মুখ, ঈষৎ চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক, ত্বক এখনও টানটান। ইদানীং বেশ চুল উঠছে, তবে কপাল এখনও চওড়া লাগে না তেমন। সব মিলিয়ে দিব্যি একটা আকর্ষণ আছে তার চেহারায়। শুভময় তার রূপেই মজেছিল, কবিতায় নয়। কথাটা মনে হতেই ছোট্ট চার দেওয়ালের নিভৃতে একটু হেসে নিল ঋতি। শ্বাসও পড়ল একটা। কাঁপা কাঁপা। ভালবাসা আর নেই শুভময়ের, ঋতি বুঝতে পারে।

ঘরে এসে ঋতি গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। সাইড টেবিলে সিগারেট

দেশলাই। হাত বাড়িয়ে অ্যাশট্রেখানা টানল পেটের ওপর। সিগারেট ঠোঁটে ঠেকিয়েছে, ঘরে স্মৃতি। হাতে জলখাবারের প্লেট।

বিরক্ত মুখে স্মৃতি বললেন, —এসেই ওটা না ধরালে নয়?

—সেই দুপুরের পর থেকে আর খাইনি মা।

—খেলেই পারো। ঘুঁটেওলিদের মতো যেখানে সেখানে বসে ফোঁকো না। কে আটকাচ্ছে!

ঋতি হেসে উঠল। ঘুঁটেফুটের পাট কবেই সংসার থেকে উবে গেছে, ঘুঁটেওলির উপমাটা মাকে এখনও ছাড়েনি। এখনও মা'র বদ্ধমূল ধারণা ঘুঁটেওলি শ্রেণীর মহিলারাই ধূমপান করে। জগৎটা মা দেখলই না! টিভি সিরিয়ালে পর্যন্ত কোনও মেয়ের হাতে সিগারেট দেখলে মা যে কী রেগে যায়!

প্লেটটা টানল ঋতি। মাকে খেপানোর জন্য বলল, —সিগারেট তো নির্দোষ নেশা মা। মেয়েরা আজকাল আরও কত নেশা করে জানো?

—সে তুমিও কি বাদ রাখো? আমি সব টের পাই।

—আহা, সে তো এক আধদিন। শখ করে। ঋতি এক চামচ উপ্‌মা পুরল মুখে। ভুরু নাচিয়ে বলল, —খেয়ে পুরো আউট হয়ে যায় মা। টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। আমার মধ্যে ওসব কখনও দেখেছ?

—আমার আর দেখার সাধ নেই। এক জীবনে অনেক তো দেখলাম, এবার ভালয় ভালয় যেতে পারলে বাঁচি। স্মৃতির গলা ভার ভার। দরজা অবধি গিয়েও ফিরে এলেন, —একটা কাজের কথা বলে রাখি শোনো। কাল যদি বাবলুর ওখানে যাই, আমি কিন্তু পয়লা জানুয়ারি অব্দি থেকে আসব।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ আবার কী, ইচ্ছে। ওটাই তো আমার বাড়ি, ওখানে গিয়ে ক'দিন থাকতে পারি না?

ঋতির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আগে এতটা ছিল না, ইদানীং মা'র ও বাড়ির ওপর টান খুব বেশি। মা'র কি এখানে ভাল লাগে না? বাধ্য হয়ে থেকেছে এতকাল? ছেলে আর নাতি-নাতনির কাছ থেকে মাকে কি তবে জোর করে বিচ্ছিন্ন রাখল ঋতি? আজকাল প্রায়ই তো ভুটুন চুমকির নাম করে ও বাড়িতে চলে যায় মা!

মোবাইল বেজে উঠেছে। স্মৃতির অপ্রসন্ন মুখ পলকে উজ্জ্বল, —ওই ... ওই বোধহয় আবার শুভ ...!

ছোট্ট পরদায় ফুটে ওঠা নামটা দেখে ঋতি মাথা নাড়ল, —সরি মা।

তোমার জামাই নয়। আমার বন্ধু। সুধন্য।

বিচিত্র মুখভঙ্গি করে স্মৃতি ঘর ছেড়েছেন তৎক্ষণাৎ। ঋতি কানে ফোন চাপাল, —বল্?

ওপারে সুধন্যর মিহি গলা, —কী করছিস রে?

—খাটে বসে বাড়িতে বানানো সাউথ ইন্ডিয়ান খাচ্ছি।

—অ্যাঃ, যত সব অখাদ্য। ... পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধেয় কী প্রোগ্রাম?

—কেন?

—আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট জমায়েত হচ্ছে। ক্লোজ কয়েকজনকে নিয়ে। চলে আসিস, একটু হল্লাগুল্লা হবে।

—ওই দিনই ফেললি? আমার বর আসছে কলকাতায়...

—ভালই তো। বরকেও নিয়ে আয়।

যাবে কি শুভময়? তাও রবাহুত হয়ে? ঋতি একটু সময় নিয়ে বলল. —দেখি।

—দেখি নয়। আসতেই হবে। কবে আসছে আমাদের জজ সাহেব?

—শনিবার।

—ঠিক হ্যায়। আমি রোববার সাহেবকে ফোন করছি। তুই আবার বাহানা টাহানা দিয়ে কাটাস না যেন।

ফোন রেখে আহারে মন দিল ঋতি। সাহিত্যের পরিবেশে শুভময় যথেষ্ট অস্বচ্ছন্দ বোধ করে। একবার ঋতি শ্রীরামপুরে কবি সম্মেলনে নিয়ে গেছিল, কী ভীষণ বোর হয়েছিল শুভময়। হাই তুলছিল, ঘড়ি দেখছিল বারবার। যাক গে যাক, গেলে যাবে, নইলে মা'র সঙ্গে বসে ...

ঋতির চোয়াল স্থির। ও আচ্ছা, ওই সময়ে শুভময় আসবে বলেই মা দাদার বাড়ি যেতে চায়? হায় রে, মা এখনও ধরে বসে আছে দুটো দিন নিরালায় একত্রে থাকলেই মেয়ে জামাই-এর বুকে প্রেমের জোয়ার বয়ে যাবে· ওই আশাতেই বুঝি বেশি দিন শুভময়ের কাছে না গেলে ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয় মা।

ছেলেমানুষ। সত্যি, ঋতির মা'টা একেবারেই ছেলেমানুষ। ওই সোমদত্তটার চেয়েও।

চার

—কে? শুভ? কখন এলি?

—এই তো। তোমার শরীর আজ কেমন বাবা? জ্বর জ্বর ভাবটা গেছে?

—কই আর। মুখ তো হাকুচ তেতো। এই তো দ্যাখ না, বড়বউমা হরলিকস না কী সব ছাইপাঁশ দিয়ে গেল, জিভে ঠেকাতে পারলাম না। দুপুরেও তো কিছুই গলা দিয়ে নামল না। যত্ত সব সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার, টেস্ট নেই...

বুড়ো মানুষকে নিয়ে হাসা উচিত নয়, তবু শুভময় হেসে ফেলল। বাবাকে কোনও প্রশ্ন করলেই বিপদ, মেলট্রেনের মতো জবাব চলবে একটানা। নো স্টপেজ। আর জবাব মানেই ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ আর অনুযোগ। এককালের চাপা অন্তর্মুখী রাশভারী মহীতোষ মৈত্রকে এখন চিনে ওঠা দায়। কে বলবে একদা এই মানুষটার দাপটে, ছাত্ররা তো বটেই, নরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও থরথর কাঁপত। বাড়িতে সর্বক্ষণ বইয়ের পাতায় ডুবে থাকা সেই মহীতোষ স্যার এখন তুচ্ছ খাবার নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছে, ভাবা যায়? হায় রে সময়, তুমি কত ভাবেই না মানুষকে বদলে দাও!

মহীতোষ খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে আধশোওয়া। পিঠে বালিশের ঠেসান। গায়ে ছাইরঙা শাল, লম্বা লম্বা পা দুটো কম্বলে ঢাকা। শুভময় বসল বিছানায়, —হাতটা দাও তো দেখি।

জীর্ণ হাতখানা এগিয়ে দিলেন মহীতোষ। চোখ বুজে শুভময় কব্‌জি টিপল, —নাহ্, আজ পাল্‌স তো নরমাল। জ্বর নেই।

—আছে আছে। ঘুসঘুসে জ্বর। ভেতরের তাপ কি আর বাইরে থেকে টের পাওয়া যায়!

তা বটে। শুভময় মাথা নাড়ল, —অ্যান্টিবায়োটিকটা কদিন হল?

—বলতে পারব না। তোমার বড় বউদিকে জিজ্ঞেস করো। তিনিই তো আমার কর্তা। কতবার বলছি, আমায় একটু ভিটামিন টিটামিন দাও, গায়ে একটু বল আসে ... কে শোনে কার কথা!

নন্দা চা নিয়ে ঢুকছিল। চোখ বড় বড় করে বলল, —আপনাকে তো ভিটামিন দেওয়া হয় বাবা। সকালে ব্রেকফাস্টের সময়ে যে লাল লাল ক্যাপসুলটা খান, ওটা কী?

—অ। দাও বুঝি? তা হলে আমি এত দুর্বল কেন?

কঠিন প্রশ্ন। শুভময় আর নন্দা চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। হাসি চেপে নন্দা

বলল, —কাল মুরগির স্টু দেব, দেখবেন ফিট হয়ে গেছেন।

—অ্যাহ্ স্টুতে আমার গন্ধ লাগে।

শুভময় কাপপ্লেট হাতে নিয়েছে। চায়ে চুমুক দিয়ে নন্দাকে বলল, —বাবাকে অল্প তেলমশলা দিয়ে রেঁধে দেওয়া যায় না?

—দিয়ে দেখেছি। ইদানীং আর হজম করতে পারেন না গো। হুটহাট পেট ছাড়ে, সে আর এক সমস্যা।

নন্দা গলা নামিয়ে বলছে, মহীতোষ ঠিক শুনতে পাচ্ছেন না, চোখ স্থির করে বোঝার চেষ্টা করছেন কথাগুলো। হঠাৎ বিড়বিড় করে উঠলেন, —সবাই খাবে পোলাও মাংস, আমার বেলায় শুধু সুপ আর স্টু! ... এই যে আজ সকালে বাড়িসুদ্ধু লোক ঘটা করে কেক খেল, একটা টুকরোও আমায় দিল কেউ?

নন্দা বলল, —ওমা, সে কী কথা! আপনাকে তো সবার আগে দেওয়া হয়েছে!

—দিয়েছিলে বুঝি? অ। আমি ভুলে গেছি। সরি।

শুভময় এবার আর হাসতে পারল না। বাবাকে দেখে মায়া লাগছিল। কত বয়স হল প্রোফেসার মহীতোষ মৈত্রর? বড় জোর আশি। লেখাপড়া নিয়েই তো থাকত, মস্তিষ্কচর্চার কামাই ছিল না, তারও অ্যালজাইমার ধরে গেল? নাকি স্ত্রীবিয়োগের আকস্মিক ধাক্কা ঘেঁটে দিয়েছে বিদ্বান মানুষটার মগজ?

উঠে দাঁড়াল শুভময়। সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের চোখ সরু, —এসেই চললে?

—না। ...একটু দাদার ঘরে যাচ্ছি। তুমি বিশ্রাম নাও।

—তুমি কি কালই ফিরে যাচ্ছ?

—হুঁ। ভোরবেলা।

—আবার কবে দর্শন পাব?

—আসব।

—মুখেই বলো, আসো কোথায়! তোমার বউও তো এ বাড়ির ছায়া মাড়ায় না।

—কেন, কালই তো এসেছিল আমার সঙ্গে!

—এসেছিল নাকি? ভুলে গেছি। সরি।

নন্দা চোখ টিপল শুভময়কে। বেরিয়ে এসো।

এ বাড়িতে একতলা দোতলা মিলিয়ে ছ'খানা ঘর। শুভময়ের মেজদা তেজোময় বহুকাল আগেই ভিন্ন হয়েছে, বউ নিয়ে দোতলার দু'খানা ঘরে তার বাস। মনোময়ের ভাগে পড়েছে দোতলার একটা আর একতলার একটা ঘর।

শুভময়ের বরাদ্দ একটিতে মহীতোষ থ্যাকেন, অন্যটি এ বাড়ির কমন ড্রয়িংরুম। পৃথগন্ন হলেও অবশ্য ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াবিবাদ নেই, বউ ছেলেমেয়েরাও মোটামুটি সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে। এই তো কালও শুভময়-ঋতিকে একসঙ্গে দেখে দুই বউদিই হইহই করে উঠল, কাকা কাকিমাকে পেয়ে রাজা রুমু ঝুমুরাও কত খুশি। স্বার্থের টানাপোড়েন না থাকলে সম্পর্ক বুঝি মধুরই থাকে।

ঋতিও এখানে থেকেছিল বছর দু'আড়াই। ভালই ছিল। ঠোকাঠুকি ছাড়াই। মাথাভাঙা থেকে চলে আসার পর অবশ্য এ বাড়িতে ওঠেনি। ছিল টালিগঞ্জে। নিজের মা দাদা বউদির কাছে। আর রামপুরহাটের পর তো কসবার রুবিপার্কেই স্থায়ী বাসা হল। মাসে দু'মাসে লেকটাউনের শ্বশুরবাড়িতে ঋতি উঁকি দিয়ে যায় বটে, তবে যোগাযোগ এখন সত্যিই অনেক ক্ষীণ।

শুভময়ের মাঝে মাঝে মনে হয় একদিক দিয়ে বন্দোবস্তটা বোধহয় ভালই হয়েছে। ঋতির বর্তমান জীবনযাপনের ধারা এ বাড়ির সঙ্গে খাপ খেত কি? হয়তো তুচ্ছ সিগারেট খাওয়া নিয়েই শোরগোল পড়ে যেত।

দোতলায় তেজোময়ের অংশ অন্ধকার। নতুন গাড়ি কিনেছে তেজোময়, সপরিবারে এক্সমাস করতে বেরিয়েছে। নন্দার সঙ্গে বড়দার ঘরে এলে শুভময়।

মনোময় গল্পের বই পড়ছিল। ইংরিজি থ্রিলার। পাতা মুড়ে রেখে বলল, —আয়, বোস্। কেমন দেখলি বাবাকে?

নন্দা হাল্‌কা গলায় বলল, —দেখাদেখির আর আছেটা কী? পুরোপুরি ভীমরতির স্টেজ।

—হুম্। শুভময় মাথা দোলাল, —তোমাদের ওপর বড় চাপ যায় না?

মনোময় বলল, —আমার আর কি, আমি তো অফিসে কেটে পড়ি। ঝক্কি তোর বউদির।

—এবার একটা অ্যাটেন্ডেট রেখে দেওয়া যায় না? যে শুধু বাবারই দেখাশুনো করবে!

—থাক, হয়ে তো যাচ্ছে। আজ আছেন, কাল নেই, শেষ বয়সে কেন একটা উটকো লোকের হাতে ছেড়ে দেব? যখন একান্তই পারব না, তখন না হয়...

শুভময় আর চাপাচাপি করল না। বড় বউদি যে বাবার যত্নআত্তির ত্রুটি রাখে, এ অপবাদ অতি বড় শত্রুও দেবে না। ভালবেসেই করে, অবশ্যপালনীয় বোঝা ভেবে নয়। বাকি দুই বউ তো খরচের খাতায়। মেজবউদি প্রথম থেকেই

দায়দায়িত্ব এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, আর ঋতির কথা তো না টানাই ভাল। সে নিজেও তো সেভাবে দায়িত্ব নেয়নি কোনওদিন, অযাচিত উপদেশ দেওয়া তাকে মানায় কি! সেবা-শুশ্রূষার লোক রাখার জন্য অর্থটা বড় কথা নয়। দাদাকে মুখে ফুটে চাইতেও হবে না, মেজদা ঝনাত ফেলে দেবে, শুভময়ও। দাদা বউদি তা ভাল মতোই জানে। তারপরও বউদি যখন আপত্তি করছে, সেখানে প্রসঙ্গটা উত্থাপনেরও সত্যিই কোনও মানে হয় না।

নন্দা জিজ্ঞেস করল, হ্যাম আছে ঘরে, স্যান্ডুইচ করে দেব?

—না না। শুভময় জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল, —আজ খেতে বেলা হয়েছে বউদি। তারওপর রাত্তিরে আবার নেমন্তন্ন।

—ও হ্যাঁ, ঋতি বলছিল...। তা বছরকার দিনে তবে একটু কেক মুখে দাও।

—আনো। ছোট এক পিস্।

মনোময় খাট থেকে নেমে বসেছে চেয়ারে। বাবার মতো তারা তিন ভাই-ই বেশ ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা। শুভময় তেজোময়ের মধ্যে মায়ের আদল থাকলেও মনোময় পুরোপুরিই বাবার কার্বন কপি। হঠাৎ দেখলে যেন প্রিন্সিপাল মহীতোষ মৈত্র বলে ভ্রম হয়।

মনোময়ের মুখে চিন্তার পাতলা আস্তরণ, —তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

—কী?

—বুল্টু বোধহয় সাউথের দিকে শিফ্‌ট করে যাবে।

—তাই? কাল তো মেজদা এ ব্যাপারে কিছু বলল না?

—এখনও ফাইনাল কিছু করেনি। বলছিল, রুমু ঝুমু বড় হচ্ছে, ওদের এবার একটু আলাদা আলাদা ঘর দরকার...। আমিও তাই ভাবছিলাম, তুইও থাকছিস না, ওরাও যদি চলে যায়... বাড়ি বেচেই দেব।

—সে কী? বাবা রয়েছে...!

—না না। বাবার জীবৎকালে কিছুই হবে না। তারপরে...। জাস্ট ভেবে রাখা আর কি। রাজার সামনের বছর ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ার, সে যে কোথায় চাকরি করবে ঈশ্বরই জানেন। আমরা দুই বুড়োবুড়ি কেন তখন ভূতের বাড়ি সামলাব, ঠিক কি না?

—হুম্। চিন্তার বিষয় বটে।

নন্দা কেক এনেছে। কেটে কেটে খাচ্ছিল শুভময়। জলও খেল এক ঢোক। কেকটা বেশ সুস্বাদু, তবে বড্ড ক্রিম, অম্বল না হয়ে যায়!

নন্দা সামনেই দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বলল, —তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব শুভ?

শুভময় চোখ তুলল।

—ইচ্ছে না হলে উত্তর দিও না। ...তোমরা কি ডিসাইডই করে ফেলেছ আর একসঙ্গে থাকবে না?

সরাসরি প্রশ্নে একটুখানি বিহ্বল বোধ করল শুভময়। নন্দাকে সে সমীহই করে। মুখফোঁড় মন্তব্যের জন্য নয়, অনধিকারচর্চাও সে করে না, তবে তার একটা প্রখর ব্যক্তিত্ব আছে। নন্দা যখন বলছে, ভেবেচিন্তেই বলছে। অর্থাৎ তাদের ছাড়াছাড়া সম্পর্ক নিয়ে নন্দা নিশ্চয়ই আলোড়িত। দাদার সঙ্গেও নির্ঘাত তার এ নিয়ে আলোচনা হয়।

অস্বস্তি ভরা মুখে, খানিকটা সতর্ক ভাবে শুভময় বলল, —না মানে... সেরকম কিছু নয়...

—তা হলে এবার ঋতিকে তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখো। অনেক দিন তো হল।

—যায় তো সময় পেলে। শুভময় ঋতিরই পক্ষ নিল, —আসলে কী জানো, ওর তো এখানে এখন একটু কেরিয়ারের ব্যাপারও আছে। বুটিক, প্লাস ওর লিটেরারি অ্যাম্বিশান... আমার ওখানে পারমানেন্টলি গেলে সবই তো জলাঞ্জলি দিতে হবে।

—জানি না বাবা বুটিক করে কী রাজরানি হচ্ছে। কালই তো বলছিল বুটিক নাকি ভাল চলছে না।

—ব্যবসা দাঁড়াতে সময় লাগে বউদি।

—কী জানি! নন্দা যেন কৈফিয়তে সন্তুষ্ট নয়, —কবিতাও তো কলকাতার বাইরে বসে লেখা যায়। মফস্‌সলে বুঝি কবি নেই? ...কিছু মনে কোরো না শুভ। আমাদের খারাপ লাগে বলেই বললাম। তুমিও ভাল, ঋতিও ভাল, তবু তোমরা যে কেন...! একটা মিসহ্যাপ্‌ ঘটেছিল বলে জীবনের ছন্দটাই পুরো বদলে যাবে?

পলকের জন্য বরফের কফিনটাকে দেখতে পেল শুভময়। বুকের মধ্যিখানে একটা শিরশির শব্দ। যেন নারকোলপাতা নড়ছে বাতাসে। শুধু ওই দুর্ঘটনাই কি তাদের বদলে দিয়েছে নাকি তাদের সম্পর্কের শিকড় শুকিয়ে আসার মূলে আরও কিছু আছে? সন্তান হারালে কত স্বামী-স্ত্রী তো আরও বেশি বেশি করে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে, তাদেরই বা অন্যরকম হল কেন? এখনও শুভময়

জোর করলে ঋতি হয়তো গিয়ে থাকবে তার সঙ্গে, কিন্তু তাতে শান্তি থাকবে কি? তা ছাড়া সেভাবে জোর করার তাগিদও তো শুভময় অনুভব করে না।

মৃদু স্বরে শুভময় বলল, —আমরা তো খুব খারাপ নেই বউদি। যে যার মতন আছি। আমি আসি, সেও যায়...

নন্দা আর কিছু বলল না। আরও দু'চার মিনিট বসে থেকে শুভময়ও চেয়ার ছাড়ল, —চলি।

—ফোন কোরো মাঝে মাঝে।

—করব।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে মহীতোষের দরজায় ক্ষণিক দাঁড়াল শুভময়। মাথায় একটা হনুমানটুপি গলিয়ে নিয়েছেন মহীতোষ। কম্বলটাকে গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে ঝুম বসে আছেন। চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি ঘোলাটে, যেন কিছুই দেখছেন না।

আবার শুভময়ের বুক শিরশির। বৃদ্ধ বয়সে সে'ও কি এরকম ঝিম মেরে বসে থাকবে? একা একা?

বাবার ওই জবুথুবু চেহারাটা চোখের পাতায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোল শুভময়। বাইরে এক উজ্জ্বল সন্ধে। আলোয় আলোয় ঝকমক করছে লেকটাউন। রাস্তাঘাটে ভিড় খুব, ক্রিসমাসের আনন্দে দল বেঁধে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। রং বেরং-এর শীতপোশাক যেন ফুটে ওঠা মরসুমি ফুল। হিম হিম বাতাসে কার্নিভাল কার্নিভাল গন্ধ।

তেমাথার মোড়ে এসে ট্যাক্সি খুঁজছিল শুভময়, সামনে রাজা।

— কী গো, কখন এসেছিলে?

—ঘণ্টাখানেক। কোথায় কোথায় ঘুরিস? কালও পুট করে কোথায় বেরিয়ে গেলি?

—পাড়াতেই ছিলাম। ছোটকাকা, তোমার বাংলোটা তো নদীর ধারে, না?

—ইয়েস। রিভার শিলাবতী। আদরের নাম শিলাই।

—সরু নদী?

—এখন সরু, তবে বর্ষার চেহারা ভয়ংকর। টাউনের থ্রি ফোর্থ ডুবিয়ে দেয়।

—কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে প্ল্যান করছিলাম, হুট করে তোমার ওখানে এক-দু'দিনের জন্য চলে যেতে পারি। বর্ষায় নয়, ঠান্ডা থাকতে থাকতে।

—আয় না। কালিম্পং-এও তো যাবি বলেছিলি...। বলিসই তো শুধু, আসিস কই!

বলেই কথাটা খুট করে বেজেছে নিজের কানে। একটু আগে বাবাও ঠিক এইভাবে বলছিল না? শুভময় কি এখন থেকেই মহীতোষ হওয়ার পথে এগোচ্ছে? ওই বৃদ্ধ? ওই জবুথুবু মানুষটা?

ট্যাক্সিতে বসেও বাবার কথা ভাবছিল শুভময়। মা মারা গেছে বছর সাতেক, মাত্র এই কটা বছরেই কী অদ্ভুত ভাবে ধসে গেল বাবা! তেমন বড় কোনও অসুখ বিসুখ ছাড়াই। অথচ মা'র প্রতি বাবার যে তীব্র টান ছিল, এমনটা তো মনে হয়নি কখনও? বরং উল্টোটাই তো লেগেছে। বাবা যেন মা'র অস্তিত্বটাও লক্ষ করত না সেভাবে। নিজের কাজকর্ম, নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকত বাবা, সেই পৃথিবীর চৌহদ্দিতে মা তো ঢুকতেই পারেনি কোনওদিন। তবু যেন নেহাতই আটপৌরে, ম্যাট্রিক পাস মা'র সঙ্গে বাবার কোথাও একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল। চোরা, কিন্তু অচ্ছেদ্য। এমন বন্ধন যে ঠিক কী প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে? কী কী তার উপকরণ? কী করে একজনের থাকা না থাকা অন্যজনকে এমন বিপর্যস্ত করে দেয়?

চিন্তা আর ট্যাক্সি ছুটছে একসঙ্গে। হু হু করে। জানলা দিয়ে ঠান্ডা ঢুকছে। হু হু করে। শুভময় কাচ তুলে দিল।

ঋতি তৈরি হয়েই ছিল। ভারী সুন্দর সেজেছে আজ। পরেছে কালচে লাল জর্জেট শাড়ি, মসিকৃষ্ণ পাড়ে আঁচলে সোনালি জরির কারুকাজ। মফচেন ঝুলছে গলায়, রহস্যময় ইশারার মতো। কানে সোনার ফুল। চুল বেঁধেছে কায়দা করে, চোখে হাল্‌কা রূপটান। দুপুরে পারলারে গেছিল ফেশিয়াল করাতে, ঝকঝক করছে ঋতির মুখখানা। ছোট্ট একটা টিপও দিয়েছে কপালে, চাপা ঠোঁট ওষ্ঠরঞ্জনীর ছোঁয়ায় মোহময়।

কতকাল পর এমন মোহিনী সাজে ঋতিকে দেখছে শুভময়! বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় এত সেজেগুজে যায় ঋতি? বুকের চিনচিন অস্বস্তিটা নিয়েই শুভময় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল ঋতির পানে, চোখাচোখি হতেই তার দৃষ্টি নেমে গেল নিজের কব্‌জিতে। ঢোক গিলে বলল, —আমি কি লেট করিয়ে দিলাম?

—ঠিকই আছে। সবে তো পৌনে সাতটা। ঋতি সহজ, —বাবা কেমন আছেন?

প্রশ্নে কোনও উদ্বেগও নেই, আন্তরিকতাও নেই, নেহাতই যেন করতে হয় তাই করা।

শুভময় আলগা ভাবে বলল, —জ্বর নেই। ...তবে ঠান্ডার সময় তো...

—হুম্। তুমি কি ট্যাক্সিতে ফিরলে?

—কলকাতার বাসট্রামে আর উঠতে পারি না। কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে।

—ট্যাক্সি কি ছেড়ে দিয়েছ?

—নাহ্, দাঁড় করানোই আছে। বেরোবে তো?

ঋতির মুখে হাসি ফুটল, —যাক, তোমার কমন সেন্স হয়েছে তা হলে! এই ড্রেসেই যাবে?

—চেঞ্জ করতে হবে?

কয়েক সেকেন্ড শুভময়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল ঋতি। সুবোধ বালকের মতো দাঁড়িয়ে আছে শুভময়। পরনে ছাইরঙা ট্রাউজার। আর ঋতিরই কিনে দেওয়া পুলওভার। ইস্পাত রং, বুকে চওড়া সাদা বর্ডার। পোলো-নেক পুলওভারখানাই বুঝি ছাড়পত্র দিল শুভময়কে। ঘাড় হেলিয়ে ঋতি বলল, —চলতে পারে। তবে শু পরে নাও। চুলটা নয় ট্যাক্সিতে আঁচড়ে নিও।

সুধন্যর বাড়ি নিউ আলিপুরে। ট্যাক্সিতে উঠে ঋতি বলল, —একটু বোধহয় আর্লিই হয়ে গেল। আর একটু দেরি করলে হত।

বেরনোর আগে ঋতি বিদেশি সুগন্ধি ছড়িয়েছে গায়ে। বুনো ফুল টুলের গন্ধ কি? অচেনা সুরভিটা নাকে ঝাপটা মারছিল শুভময়ের। নিশ্বাসে একটা চাপ অনুভব করছিল সে। তবে ঋতির রুচিবোধ আছে, গন্ধটা তেমন উগ্র নয়, মেখেছেও মাপ মতো, এই যা রক্ষে।

শুভময় সিটে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল, —আমরা ফিরছি কখন?

—বাব্বাহ্, পৌঁছনোর আগেই ফেরার চিন্তা! এই দুঃখে তোমায় কোথাও যেতে বলি না। কাল আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে তাড়া লাগিয়েছিলাম?

ঈষৎ ধন্দ জাগল শুভময়ের। কাল লেকটাউনে যাওয়ার আগে ঋতি কি কোনও অলিখিত শর্ত তৈরি করে নিয়েছিল মনে মনে? নিউ আলিপুরের বিনিময়ে লেকটাউন? দুটো কি এক গোত্রের?

উত্তেজনার পারদ নামানোর জন্য শুভময় হাসিমুখে বলল, —তুমি বলেছ বলে তো আমি যাচ্ছি না। তোমার বন্ধু পারসোনালি আমায় ইন্‌ভাইট করেছে।

—আমার বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল।

—তুমি কি চাও না, ক্রিসমাসের সন্ধেটা আমারও রঙিন কাটুক?

ঘাড় ঘুরিয়ে ঋতি একবার দেখে নিল শুভময়কে। তারপর জানলার বাইরে চোখ মেলে বসে আছে নিশ্চুপ। গড়িয়াহাটের জ্যাম এড়াতে শর্টকাট ধরেছে ট্যাক্সি, সরু সরু গলি দিয়ে যাচ্ছে, অজস্র বাঁক নিতে নিতে। ঢাকুরিয়ায় পড়ে

বড় রাস্তা ধরল, আটকে গেছে লেভেল ক্রসিং-এ।

ভিড়। কোলাহল। প্রতীক্ষা। শুভময়ের অসহ্য লাগছিল। নাহ্, শহরটা আর বাসযোগ্য নেই। কখন যে সকাল আসবে!

আচমকা কানে ঋতির স্বর, —তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি?

—উঁ?

—দয়া করে সুধন্যদের বাড়ি গেয়ে গোমড়া হয়ে থেকো না।

—হুঁ।

—লোকজনের সঙ্গে মিশবে। কথা-টথা বলবে।

— বলব।

—মনে রেখো, তোমার যেমন তোমার জায়গায় একটা প্রেস্টিজ আছে, আমারও তেমনই আমার সার্কেলে একটা মানসম্মান আছে।

—থাকবে মনে।

স্টেশনে ট্রেন এসে গেছে। বিশ্রী একটা ভোঁ বাজিয়ে ছাড়ল ট্রেনটা। ঋতি দু'হাতে কান চেপেছে। যতক্ষণ না ঝমর ঝমর করে কামরাগুলো বেরিয়ে যায়, সরাল না হাত। তারপর ফের বলল, —আর একটা রিকোয়েস্ট করব? দিস ইজ লাস্ট।

—করো।

—প্লিজ, তুমি কিন্তু কবিতা পাঠ-টাঠ হলে ঢুলো না।

মুহূর্তে শুভময়ের মনে হল সুধন্যকে না করে দেওয়াটাই বোধহয় উচিত ছিল। তার না যাওয়াটা ঋতির ভাল লাগুক কি না লাগুক, অন্তত এই কাঁটা হয়ে থাকার হাত থেকে তো রেহাই পেত। দু'জনেই।

শুকনো হেসে শুভময় বলল, —চিন্তা কোরো না, আমি জেগেই থাকব। কান খাড়া করে শুনব।

উত্তরটা ঋতির পছন্দ হল না। নাকি জবাবের ভঙ্গিটা? আবার চোখ ঘুরিয়েছে ঋতি। আবার নিশ্চুপ।

রাজপথ মানে যানবাহনের জঙ্গল। জ্যাম এড়ায় সাধ্যি কার! ঋতি ভেবেছিল তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় আটটা বেজে গেল। সুধন্যর বাড়ি তখন রীতিমতো জমজমাট।

ঋতি আর শুভময়কে দেখে ফ্ল্যাটে মৃদু তুফান। সুধন্য দারুণ আহ্লাদিত, —কী সৌভাগ্য, এতদিনে আমার বাড়িতে তা হলে জজ সাহেবের পায়ের ধুলো পড়ল!

আসরে প্রবেশ করেই ঋতি অন্যরকম। যেন এতক্ষণ ফুটি ফুটি করেও ফুটছিল না, প্রস্ফুটিত হল এইমাত্র। হাসিতে এক রাশ ফুল ছড়িয়ে বলল, —আজ ঠেলাটাও বুঝবে সকলে। কেউ কোনও বেচালপনা করতে পারবে না। করলেই কঁ্যাক। ছ'মাসের জেল, তিন দিনের ফাঁসি। ...অ্যাই শুভ, কম বললাম?

হঠাৎ উচ্ছ্বাসের ধাক্কাটা হজম করতে শুভময়ের সময় লাগল কয়েক সেকেন্ড। ভেতরে ভেতরে বুঝি কৌতুকও বোধ করল খানিক। স্মিত মুখে বলল, —আমি তো এখন বিচারক নই। হওয়ার দুঃসাহসও আমার নেই।

—তা হলে কী?

—তোমার অনুচর বলতে পারো। কিংবা শুধুই ঋতি মৈত্রর স্বামী।

—উঁহু, আসামি। জোর ফেঁসেছ তুমি আজ।

ঋতির হাসিটা কি আসল? নাকি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গই ঋতির টনিক? জাদুকাঠির স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠেছে অসুখী রাজকন্যা?

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা জনা বারো চোদ্দো। নারী পুরুষ প্রায় সমান সমান। গোটা তিন চার চেনা মুখ, বাকিরা একেবারেই অচেনা। সুধন্য বিজ্ঞাপন সংস্থার বড় চাকুরে. তার লিভিংরুমটি বিশাল, সেখানে যে যার মতো ঘুরছে ফিরছে। কেতাকানুনের কোনও বালাই নেই। কেউ বা সোফায় উপবিষ্ট, কার্পেটেও বসেছে কেউ কেউ। পোশাক আশাকও যেমন তেমন। জিন্স, সালোয়ার কামিজ, শাড়ি পাজামা পাঞ্জাবি সবই আছে মিলেমিশে।

রঙিন পানীয় ঘুরছে হাতে হাতে, তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস নীলচে। সুরা আর সিগারেটের গন্ধ মিলে আবহে উৎকট ঝাঁঝ।

সুধন্য একটা হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে গেল শুভময়কে। মদ শুভময় খায় না বড় একটা, তবে এ ব্যাপারে তার তেমন গেল গেল ভাবও নেই। গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে নিয়ে কথা বলছে সুধন্যর সঙ্গে। মেপে জুপে। শীতকাল নিয়ে। দার্জিলিং-এ বরফ পড়া নিয়ে। বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজকর্ম নিয়ে। কোর্টকাছারির হালচাল নিয়ে। দেবাশিস আর সুধন্যর বউও এসে গল্প করে গেল একটুক্ষণ।

তারা সরে যেতেই শুভময় সোফায় শরীর ছেড়ে দিল। চোখ গেছে ঋতিতে। কার্পেটে থেবড়ে বসে পড়েছে ঋতি, কথা বলছে জোরে জোরে, ঘুরে তাকাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ, আবার জমে যাচ্ছে আড্ডায়। বেঁটে টেবিলটায় হুইস্কির বোতল, ঢালাঢালির কাজ সুধন্যই করছে, মাপ মতো জল মিশিয়ে বাড়িয়ে

দিচ্ছে একে তাকে। ঋতিও নিল। সঙ্গে সঙ্গে চুমুক দিল না, হাতে ধরে ফের বাক্যালাপে মগ্ন।

হঠাৎই গ্লাস হাতে এক ভদ্রলোক শুভময়ের পাশে। বছর আটত্রিশ চল্লিশ বয়স, নিখুঁত কামানো মুখ, হাট্টাকাট্টা চেহারা, মাথায় কদমছাঁট চুল। মেজাজি ঢঙে বলল, —আপনিও মনে হচ্ছে আমারই দলে? হংসমধ্যে বকো যথা?

শুভময়ের ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি।

ঈষৎ জড়ানো গলায় লোকটা ফের বলল, —আমি অনিন্দ্য সেন। মার্চেন্ট নেভিতে আছি। সুধন্য আমার ছোটবেলার বন্ধু। সেই যখন আমরা প্যান্ট-ট্যান্ট পরতাম না, তখন থেকে। ব্যাটা আমায় জোর করে আজ ধরে আনল।

শুভময়ের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, লোকটা এখন তুমুল বকবক করবে। জ্বালাবে খুব। তবু ভদ্রতা করে বলল, —কেন? আপনার এখানে ভাল্লাগছে না?

—না না, তা নয়। মানুষের সঙ্গ... নাথিং লাইক ইট। আননোন লোকজনের কম্পানি আমি আরও বেশি এনজয় করি। বোঝেনই তো, জাহাজে জীবন কাটে... রোজ সেম ফেস, সেম দৃশ্য। নীল নীল নীল! অ্যাট্রোশাস। মনোটোনাস্। বন্দর তাই টানে খুব। বলতে বলতেই অনিন্দ্য প্রসঙ্গান্তরে, —আপনি কি হাইকোর্টের জজ?

—অদ্দূর পৌঁছোইনি। আমি সাব ডিভিশনাল কোর্টে আছি।

—ও। তা হাইকোর্টের জজ হওয়ার ক্রাইটেরিয়াটা কী?

—আমাদের থেকেই হয়। প্রোমোশান পেতে পেতে। বার থেকেও বাই সিলেকশান হওয়া যায়।

—বার? মানে ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেটরাও জজ হয়? আজ যারা সওয়াল করছে, কাল তারা বিচারক? হাইলি ইন্টারেস্টিং!

শুভময় মনে মনে বলল, তুমিও কম আজব নও। গোটা দুনিয়া চষে বেড়াও, আর এই সামান্য তথ্যটুকু জানো না!

সুধন্য তালি বাজাচ্ছে। রগুড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, —ভাইবোন সকল, এবার একটু চুপচাপ হও। আমরা একটু কবিতা শুনি। ...ধারা, তোমার কাছে আছে নিশ্চয়ই?

ধারা সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, —আছে। কিন্তু পড়ব না। আমি প্রথম হতে চাই না।

—দেবাশিস?

—অন্য কেউ শুরু করুক না। ...বিজন অনিমেষ ঋতি...

—আজ আমি আনিনি রে। আমি আজ শ্রোতা।

—এ কী বিরল বাক্য ঋতি? কবি... শ্রোতা? সোনার পাথরবাটি? সুধন্য খ্যাকখ্যাক হাসল, —তা হলে আমিই স্টার্ট করি, কী বল্? তিনটে আছে। ছোট ছোট। বেশি টাইম নেব না।

—নো ভ্যানতাড়া। পড়ো, পড়ে ফ্যালো। অনিন্দ্য টিপ্পনী ছুড়ল, —তুমি বস্ আজ মাল খাওয়াচ্ছ, তুমি এক গ্রোশ পড়লেও শুনতে হবে।

—চুপ করে বোস তো। তোর কোটা শেষ, আর খাবি না।

—ইল্লি রে, আমি আজ কার্পেটে গড়াগড়ি দেব। বউ চলে গেছে বাপের বাড়ি। বাচ্চা পাড়তে। আমি বাড়ি ফিরবই না।

ঘরময় বিপুল হাস্যরোল। হাসি থামতেই কবিতাপাঠ। সুধন্যর প্রথম কবিতাটা মোটামুটি অনুধাবন করতে পারল শুভময়। নগর জীবনকে ঘিরে তির্যক ব্যক্তিগত অনুভূতি। দ্বিতীয়টা সম্ভবত ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে আত্মদর্শন। তিন নম্বরটা ধরাই গেল না, আগুন বৃষ্টি পাথর সব কিছু জড়ামড়ি করে গুলিয়ে গেল।

এবার ধারা। তারপর দেবাশিস, বিজন, রেণু, অনিমেষ...। শুভময় আর শুনছিল না। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। সুরার ক্রিয়া? তুৎ, এইটুকুতে মস্তিষ্ক বিবশ হয় নাকি?

পাঠ সাঙ্গ হল। চলছে কাটাছেঁড়া। টুকরো-টাকরা মতবিনিময়। অনিন্দ্য উঠে গ্লাস ভরে এনেছে, আবার সে শুভময়ে মনোযোগী। স্খলিত স্বরে বলল, —আচ্ছা জজসাহেব, আপনিও কি তখন হাসছিলেন?

শুভময়ের চোখ ঋতিকে অনুসরণ করছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, —উঁ?

—আপনিই বিচার করে বলুন কেন ফিরব আমি? সমুদ্রেও একা, বাড়িতেও একা, মানুষ এভাবে থাকতে পারে?

দেবাশিস সিগারেট ধরাচ্ছে। ধারার দিকে প্যাকেটটা বাড়াল, ঋতিকেও। নিল না ঋতি। এই পরিবেশে সিগারেট খাওয়াতে ঋতি কি অভ্যস্ত নয়? তা হলে দেবাশিস তাকে অফারই বা করবে কেন? ধাঁধা! ধাঁধা!

শুভময় বিড়বিড় করে বলল, — হুম্। জটিল প্রশ্ন।

—মানছেন তা হলে, ব্যাপারটা সিরিয়াস? ভাবুন, বউটা আমার সঙ্গে জাহাজেও যেতে চায় না। জন্মের মধ্যে কর্ম, একটা মাত্র ভয়েজে সঙ্গী ছিল। দ্যাট টুঁউ ইন হানিমুন। ল্যান্ডে এসে ফার্স্ট ইশু হল, ব্যস্। তিনি ডাঙায়, আমি জলে। কী প্যাথেটিক, ভাবুন!

এইমাত্র এক যুবক ঢুকেছে ফ্ল্যাটে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে সরাসরি ঋতির সামনে। বেশ মায়াবী টাইপ চেহারা। স্বপ্নালু স্বপ্নালু চোখ। ঋতির পাশে বসে পড়ল ধপ করে। বলল কী যেন। ছেলেটার বুকে গুমগুম কিল মারছে ঋতি। এও কি কবি?

অনিন্দ্য ঠেলছে শুভময়কে, —কী জজসাহেব, বুঝছেন তো আমার কষ্টটা?

শুভময় অস্ফুটে বলল, —হুঁ।

—বুজিং তো আমার ওই দুঃখেই বেড়ে গেল, নইলে...

অনিন্দ্যর বকবকানি টপকে কোত্থেকে হঠাৎ ছিটকে এল এক বামাকণ্ঠ। চাপা, তবে তীক্ষ্ণ।

—দ্যাখ, বিজন দ্যাখ, সোমদত্তটা এসেই কেমন মায়াবিনীর গায়ে ঢলে পড়ল!

—ঋতিটাও যে কেন ওকে এত ইন্‌ডাল্‌জ করে!

—হুঁহ্, কে কাকে প্রশ্রয় দেয়! আধবুড়িটা তো সোমদত্তকে গিলেই ফেলেছে!

—শশশ্! ঋতির বর!

ঘাড় ঘোরানোর সাহস পেল না শুভময়। কানে যেন গরম লাভা, স্নায়ু অসাড় সহসা। অনিন্দ্যর বিনবিন চলছে। ঠোঁট নড়াটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিল শুভময়, স্বর বেবাক উধাও। আশেপাশে কারুর মোবাইল বেজে উঠল কি? নাকি হৃৎপিণ্ডের ধ্বনিই এখন অশান্ত রিংটোন?

শুভময়ের ঘোলা চোখ দেখল ঋতি আসছে এদিকে। সোমদত্ত সমেত। হিড়হিড় করে সোমদত্তকে টানছে ঋতি, পিছলে পিছলে যাচ্ছে ছেলেটা। তবুও টানছে।

সোমদত্তর কব্‌জিখানা চেপে ধরে রেখে ঋতি বলল, —কী অসভ্য ছেলে দ্যাখো! এদিকে তোমার সম্পর্কে এত কৌতূহল, অথচ আলাপ করতে... এ হল সোমদত্ত। রিসেন্টলি খুব নাম করেছে।

—না, না, ঋতি বাড়িয়ে বলে। কবিতা ঋতিই ভাল লেখে, ওর কত ডেপ্‌থ...

প্রাণপণে নিজেকে স্থিত করে সোমদত্তর সঙ্গে কথা বলল শুভময়। কোথায় থাকে, কী করে, এই সব। ঋতি সরে যেতে ছেলেটাও সাঁৎ করে হাওয়া।

শুভময় আচ্ছন্নের মতো বসে। সুধন্যর বউ এসে খেতে ডাকল। বুফে

সিস্টেম। পরোটা কাবাব আরও কী সব যেন তুলল প্লেটে. জিভে কোনও স্বাদ পেল না।

এগারোটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল শুভময়রা। আসর তখনও চলছে, কিন্তু শুভময় কাল ভোরে বেরোবে, ঋতিই আর দেরি করতে রাজি নয়।

ট্যাক্সিতে উঠে ঋতি জিজ্ঞেস করল, —কী, কেমন লাগল আজ?

—মন্দ কী। ঋতির মতো করেই উত্তর দিল শুভময়, —যেমনটা আশা করেছিলাম, সেরকমই।

—তার মানে বোর হয়েছ।

শুভময় চুপ করে রইল।

ঋতি আবার বলল, —পরিবেশ তো আজ বেশ লাইভলিই ছিল। সবাই কত জলি, আড্ডা মারছে, গল্প করছে...। বিজন টিজন তোমার সঙ্গে আলাপ করল...। তুমি আর অনিন্দ্য সেনও তো বেশ জমে গেছিলে মনে হল।

—হুঁ। লোকটা খুব মজার।

—সোমদত্তকে কেমন দেখলে?

—ভালই তো।

—বাচ্চা ছেলে। আমায় ভীষণ অ্যাডমায়ার করে। ঋতি চপল হাসল, —আমার সব কিছুই ওর কাছে খুব সুন্দর। আমার হাসি, কথা বলা, রাগ করা...

—হুম্। শুভময়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, —ছেলেটার চেহারাটি বেশ।

—তোমার ভাল লাগল? কেমন আলুভাতে আলুভাতে মার্কা নয়? দেখেই মনে হয় না, এখনও এক্সটেন্ডেড শৈশবে আছে?

ঋতির স্বর সহজ। গ্লানিহীন। পাহাড়ি ঝোরার মতো স্বচ্ছ। খানিক আগেও একটা ভোঁতা অভিমান জাগছিল শুভময়ের বুকে, ক্রমশ সেটা যেন বদলে যাচ্ছে মায়ায়। আশ্চর্য, ফোঁটা ফোঁটা অনুকম্পাও যেন আসছে কোথা থেকে! ঋতি কি জানে তাকে নিয়ে কী বলাবলি করে ওই বিজন টিজনরা? এদের সঙ্গে মিশে সুখ পায় ঋতি? বেচারা।

বাড়ি ফিরে শোওয়ার তোড়জোড় করছিল ঋতি। তাদের বিয়ের খাটখানা মাথাভাঙা, রামপুরহাট, কালিম্পং ঘুরে এখন শুভময়ের বাংলোয়। ঋতি নিলামঘর থেকে সস্তায় দুটো সিঙ্গলবেড খাট কিনে নিয়েছিল, জোড়া দিয়ে পাতা আছে পাশাপাশি। দুটো জাজিমের মধ্যিখানের ফাঁকটুকু বেড়ে যায় আপনাআপনি, ঠেলে ঠেলে জাজিমদুটো ঠিক করল। টানটান করল চাদর, বালিশ ফোলালো, লেপ দিল বিছানায়। তারপর নাইটির ওপর শাল জড়িয়ে

ড্রেসিংটেবিলের টুলে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

শুভময় কিট্‌সব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছিল। ঋতিকে ঝলক দেখে নিয়ে বলল, —তুমি কি আজকাল স্মোক করা একটু কমিয়েছ?

—না তো। ঋতি নাইটক্রিমের শিশিটা টানল। সিগারেট অ্যাশট্রেতে রেখে মুখে ক্রিমে ঘষতে ঘষতে বলল, —দিনে দেড়-দু' প্যাকেট তো হয়েই যায়। কেন বলো তো?

—সুধন্যর বাড়িতে দেখলাম খেলে না... বাইরে বোধহয়...

—খাই। খাই না। নেশার ওপর কনট্রোল রাখাই তো ভাল।

—তা অবশ্য ঠিক। শুভময় ব্যাগের চেন আটকাল, —ও হ্যাঁ, একটা কথা। ভাবছিলাম কিছু ক্যাশ টাকা রেখেই যাই, তোমার লাগতে পারে।

—এক্ষুনি কি লাগবে? ...এখনও আছে তো।

—তোমার বুটিক শুনলাম ভাল চলছে না?

—কে বলল?

—বড় বউদি। ...ও বাড়িতে না বললেই পারতে। কী দরকার সবাইকে...

—কেন লুকোব? কেন লুকোব আমি? ঋতি আচমকাই চেঁচিয়ে উঠেছে যেন প্রচুর বারুদ জমেছিল মনে, হঠাৎ বিস্ফোরিত হল। মুখ পলকে লাল, নাকের পাটা ফুলছে, দপদপ করছে চোখ। বিশ্রী কর্কশ সুরে বলে চলেছে, —কেন আমাকে সব কিছু লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে হবে? সর্বত্র? সব সময়ে? কেন? কেন? কেন?

অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ঋতি। শুভময় মুহূর্তের জন্য হতচকিত। পর মুহূর্তে এগিয়ে এসে চেপে ধরেছে ঋতির কাঁধ। কাতর গলায় বলল, —ঋতি প্লিজ, শান্ত হও।

ঋতি স্থির চোখে শুভময়কে দেখল দু'এক পল। তারপর ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়েছে শুভময়ের হাত। কাঁপছে ঠোঁট। হাঁপাচ্ছে।

শুভময়ের হঠাৎ শীত করছিল ভীষণ। কান্না পাচ্ছিল।

পাঁচ

ফেরার পথে বিচ্ছিরি ভাবে ফেঁসে গেল শুভময়। সরকারি বাস ধর্মতলা থেকে ছেড়েছিল পৌনে সাতটায়, বম্বে রোডেই হিক্কা তুলছিল মাঝে মাঝে, দাসপুরে বাজার পেরিয়ে তিনি দেহ রাখলেন পুরোপুরি। গভর্নমেন্টের চাকরি, সুতরাং ড্রাইভার কন্ডাকটারদের কীই বা দায়। দু'দশজন যাত্রী নিজস্ব তাগিদেই নেমে হট্টগোল তুলল, হেঁইও মারি জোয়ারদারিও চলল কিছুক্ষণ। তবে বাস তো সরকারের, একবার বিকল হলে সেও কী আর নড়ে সহজে! লাল ফিতে বাঁধা ফাইলের মতোই সে অনড়। উল্টোদিক থেকে আসা আর একটা গভর্নমেন্ট বাসকে দিয়ে পাঁশকুড়া ডিপোয় খবর পাঠিয়ে চালকমশাইয়েরও কর্তব্য শেষ, কন্ডাকটারভাইকে নিয়ে পাশের চায়ের দোকানে ঢুকেছে। শীতের সকাল, নিশ্চিন্ত জীবন, চায়ের তুল্য আরামদায়ক এখন আর কী আছে!

শুভময় ঘড়ি দেখছিল ঘন ঘন। ছটফট করছিল। নটা পঁচিশ... নটা তিরিশ... নটা পঁয়ত্রিশ... সময় দৌড়চ্ছে তেজী ঘোড়ার মতো। দশটায় কোর্ট, কী হবে এখন? পাঁচ দশ মিনিট দেরি হলেও নয় কথা ছিল। কিন্তু এ যা হাল, এগারোটার আগে পৌঁছনো যাবে কি? মহকুমা টাউন এখনও বেশ খানিকটা পথ, সাইকেল রিকশা নিলেও কম-সে-কম চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট তো লাগবেই। ইশ, গোখ্‌খুরি হয়ে গেছে, পৌনে ছ'টার বাসটা ধরা উচিত ছিল।

দু'ধারে নেড়া ধানক্ষেত। খাবলা খাবলা কপির চাষ হয়েছে কোথাও কোথাও, বেগুন টেগুনও। অসহিষ্ণু চোখ পড়ছে সবুজে, পরক্ষণেই ঘুরে আসছে রাস্তায়। উফ, প্রাইভেট বাসও আসে না কেন?

হঠাৎই শুভময়কে চমকে দিয়ে এক চলন্ত অ্যাম্বাসাডার ব্রেক কষেছে। গাড়ি থেকে নেমে এল চন্দ্রচূড়। শুভময়ের বুকটা ধক করে উঠল। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই কি সন্ধে নামতে হবে?

চন্দ্রচূড় হাসি ছড়িয়ে এগিয়ে এল, —নমস্কার স্যার। ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে? বাস ব্রেকডাউন?

শুভময় অপ্রস্তুত মুখে বলল, —হ্যাঁ, দেখুন না... রুটের বাসেরও দেখা নেই...

—আপনি... রুটের বাসে যাবেন? ওই ভিড়ে? চোর ছ্যাঁচোড় কে না ওঠে বাসে... তাদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে...?

শুভময়ও যে কথাটা ভাবছিল না, তা নয়। এ লাইনের বাসে সত্যিই

গাদাগাদি হয় খুব। ঠেলাঠেলি করে উঠে হয়তো পড়াই যায়, কিন্তু হ্যান্ডেল ধরেই হয়তো দেখবে পাশের লোকটা তিনমাস আগে সাজা পেয়েছে তার হাতে। তা ছাড়া মামলা করতে যারা যাচ্ছে, তারও তো থাকতে পারে বাসে। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

চন্দ্রচূড় তাড়া লাগাল, —ভেবে টাইম নষ্ট করবেন না স্যার। চলে আসুন। গাড়িতে জাস্ট দশ মিনিট, কোর্টে আপনার লেট হবে না।

শুভময় তবু ইতস্তত করছে, —না, রিকশাই নিই বরং...

—এটা কিন্তু সুবিধা নেওয়া নয় স্যার। আমি টাউনেই যাচ্ছি। চেনা পরিচিত লোক আটকে আছে দেখলে আমি লিফ্‌ট দিই না?

দোনামোনা করে শুভময় উঠেই পড়ল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই বিরক্তি ঝাঁঝ হয়ে ফুটেছে গলায়, —ওয়ার্থলেস। কেয়ারলেস। রাস্তায় নামানোর আগে বাসটাকে থরো চেক করে নেয় না!

—কার কী ঠেকা। জানে বারো ভূতের মাল... প্যাসেঞ্জারদের টেনশান ওরা থোড়াই বোঝে! আপনার মতো আরও কত দায়িত্বশীল মানুষ এই সব বাসে ট্রাভেল করে...। করে কি না, বলুন?

—সে তো করেই।

—তা হলে? এক সরকারি ডিপার্টমেন্টের গাফিলতিতে আর এক সরকারি সেকশানের ভোগান্তি। কমন পাবলিকের তো বটেই। কাল রিসর্টের ওপেনিং-এ মন্ত্রীও এই কথা বলছিলেন। কঠোর সমালোচনা করছিলেন পর্যটন দপ্তরের কর্মীদের।

একেই বলে ঝানু উকিল। কায়দা করে অপ্রিয় প্রসঙ্গটা তুলেই ফেলল। এবার তো ভদ্রতা করে শুভময়কে একটু খোঁজখবর নিতেই হয়।

আলতো ভাবে শুভময় বলল, —কেমন হল কাল আপনার ওপেনিং?

—জগত্তারিণীর আশীর্বাদে ভাল মতোই উতরে গেছে। ডি-এম, এস-পি, সভাধিপতি সবাই ছিলেন। বিপ্লববাবু কিশলয়বাবুরাও সস্ত্রীক পদধূলি দিয়েছেন...

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নামগুলোও শুনিয়ে দিল! শুভময় চোখ রাখল ঘড়িতে, —কখন শেষ হল অনুষ্ঠান?

—দশটায় ফিতে কাটলেন মিনিস্টার, তারপর বক্তৃতা টক্তৃতা... দু'ঘণ্টার মধ্যে হয়ে গেছে। তারপর লান্‌চ টান্‌চ হল...। অতিথিরা অনেকেই তিনটে সাড়ে তিনটে অব্দি ছিলেন। আর আমার তো কাল ফেরাই হল না। ছেলে

আটকে দিল। ঘটা করে ক্রিসমাসের পার্টি করল সন্ধেবেলায়, নৌকো টৌকো চড়াল...

—আপনার তো তা হলে ভালই কেটেছে!

—কই আর। আপনি যা দাগা দিলেন। ...আমার ছেলে কিন্তু আপনাকে খুব আশা করেছিল স্যার।

—কী করি বলুন, হঠাৎ পারিবারিক কাজ পড়ে গেল।

চন্দ্রচূড় ধূর্ত হাসল, —আমি অবশ্য জানতাম আপনি যাবেন না। নেমন্তন্ন করার সময়েই বুঝে গেছি।

ক্ষণপূর্বের উদ্বেগ ভুলে শুভময় হো হো হেসে উঠল, —আপনার অনুমানশক্তির তো প্রশংসা করতে হয়।

চন্দ্রচূড় সময় নিল। তারপর বলল, —স্যার, কিছু মনে করবেন না। .. ওকালতি লাইনে আমার তিরিশ বছর হতে চলল, এখন মক্কেল ঘরে পা রাখলেই গন্ধ পেয়ে যাই কে চোর, কে সাধুপুরুষ। তার মধ্যে অনেক তিলে খচ্... আই মিন, আচ্ছা আচ্ছা ভণ্ড লোকও থাকে। তাদের আমি চিনে ফেলি, আর আপনার মতো সৎ, সচ্চরিত্র, নির্লোভ, বিবেকবান, নিয়মনিষ্ঠ মানুষের মনটাকে আমি আন্দাজ করতে পারব না? তা হলে তো আমাকে কালো কোট ছেড়ে হরিদ্বার পালাতে হয়।

শুভময় চুপ।

চন্দ্রচূড় গলা ঝাড়ল, —আপনার সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি স্যার। তবু বলব, আসতে পারতেন। মানুষে মানুষে একটু মেলামেশা হলে দোষ কী? জানি আপনি নীতিপরায়ণ মানুষ, পেশার কারণেই আমাদের সঙ্গে মাখামাখি করতে চান না। তবে স্যার, আমি কিন্তু আপনাকে শুধু ম্যাজিস্ট্রেট বলে ভাবি না। আমার চোখে আপনি এই টাউনের অতিথি। আজ আছেন, কাল হয়তো বদলি হয়ে যাবেন, তবু এখানকার কিছু স্মৃতি তো রয়ে যাবে আপনার কাছে। সেখানে সামান্য একটু স্থান পেতে কি আমাদের লোভ হয় না?

শুভময় অপ্রতিভ মুখে বলল,—আপনি কিন্তু এবার আমায় লজ্জা দিচ্ছেন চন্দ্রচূড়বাবু। আমি নেহাতই ক্ষুদ্র মানুষ।

—ক্ষুদ্র তো আমরা সবাই স্যার। দোষেগুণে মানুষ। কেউ দেবতাও নই, দানবও নই। তবু, ছোট মুখে একটা বড় কথা বলি। যদি আপনার কণামাত্র কাজেও কখনও লাগতে পারি, দেখবেন বিনিময় মূল্য ধার্য করব না। বলতে বলতে চন্দ্রচূড়ের চোখ সহসা বাইরে,—ওমা, কথায় কথায় তো পৌঁছেই

গেলাম!... সুবলা, আমাকে বাড়িতে ছেড়ে স্যারকে নামিয়ে দিয়ে আয়। আগে একবার বাংলোয় যাবেন তো স্যার?

—না না না, সোজা কোর্ট।

—এহেহে, স্নান-টান তো তা হলে কিছুই হল না! কী আতান্তর বলুন তো?

রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি থেমেছে। মেন রোডের ওপরই চন্দ্রচূড়ের পেল্লাই দোতলা বাড়ি। পুরনো বটে, তবে চেহারায় বনেদি। কারুকাজ করা প্রকাণ্ড গেটের দুপাশে সাদা সিমেন্টের সিংহমূর্তি, ফোয়ারা, স্ট্যাচু, গোল গোল থামওয়ালা চওড়া বারান্দা, জানলা দরজার মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে লাল নীল সবুজ কাচ, ছাদে স্যান্ডকাস্টিং-এর রেলিং...। বাইরে থেকেই দেখা যায় প্রচুর ফুল ফুটেছে বাগানে। মরসুমি ফুল।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রচূড় জানলায় মুখ বাড়িয়েছে,—চলি তবে স্যার? দেখা হবে।

শুভময় হাসল, —উপকারের জন্য ধন্যবাদ।

চন্দ্রচূড়ের বাড়ির পরেই টাউন শুরু। খানিকটা গিয়ে ব্রিজ। নীচে শীতের ক্ষীণতোয়া শিলাবতী। বড় রাস্তা চলে গেছে ব্রিজ পেরিয়ে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা। মহকুমা কোর্টে যেতে গেলে সেতু অবধি অবশ্য এগোতে হয় না, তার আগেই একটা রাস্তা ঘুরে গেছে ডাইনে, সেখানেই পর পর সরকারি দপ্তর, আদালত...। চন্দ্রচূড়ের বাড়ি থেকে গাড়িতে জোর তিন-চার মিনিট।

এটুকু পথ পেরোতেই একটা অস্বস্তি এসে যেন ভর করছিল শুভময়কে। চন্দ্রচূড় যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ ঠিক এরকমটা লাগেনি। এখন এই একা একা চন্দ্রচূড়ের গাড়ি চড়ে যাওয়া, চন্দ্রচূড়ের গাড়ি থেকে নেমে কোর্টে ঢোকা...! কোর্টে কেউই কোনও প্রশ্ন করবে না, করার স্পর্ধাও নেই, কিন্তু দৃষ্টি তো উড়ে আসতেই পারে!

কোর্টের শ'খানেক গজ আগে শুভময় গাড়ি ছেড়ে দিল। হাঁটছে দ্রুত পায়ে। কিটব্যাগ কাঁধে।

এজলাসে বসতে না বসতেই কাজ শুরু। রোজকার মতোই শুনানি, বাদানুবাদ, নতুন মামলা গ্রহণ, এ কোর্টে ও কোর্টে কেস পাঠানো, রায় দান। রোজকার মতোই দপ্তরের টুকটাক কাজকর্ম, সই সাবুদ। তারপর দিনের শেষে শ্রান্ত পায়ে বাংলোয় প্রত্যাগমন। একা একা বসে থাকা। টিভি, বই, পায়চারি।

আজ অবশ্য কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটল। সন্ধেবেলা জলখাবার সেরে চা খাচ্ছিল শুভময়, হঠাৎই বিপ্লব আর মণিমালার আবির্ভাব। মণিমালার হাতে তিন

থাকের টিফিন কেরিয়ার। এসেই মণিমালা সোজা চলে গেছে অন্দরে। রতনকে ডাকছে সুরেলা গলায়।

একটু যেন খুশিই হল শুভময়। কলকাতাকে সে যত অপছন্দই করুক, শহরের ওই চোখ ধাঁধানো আলো, জন-অরণ্যের কোলাহল ছেড়ে এসে প্রথম এক দু'দিন কেমন একটা ধাক্কা আসে। এখানকার নির্জন নৈঃশব্দ্যে, কম ভোল্টের মিটমিটে আলোয় বসে থাকতে থাকতে মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন ফেলে এসেছে। এই সব সময়ে হঠাৎ হঠাৎ পরিচিত কারুর সঙ্গ মন্দ লাগে না। শুভময়ের মনে পড়ল, পুজোর ছুটির পর যেদিন সে ফিরল, সেই সন্ধেতেও হাজির হয়েছিল বিপ্লব আর মণিমালা।

শুভময় চোখ নাচাল,—কী বয়ে আনল মিসেস? হোপফুলি ফুলকপি নয়?

বিপ্লব সিগারেট দেশলাই বার করে টেবিলে রাখছিল। ভুরু কুঁচকে বলল,—কেন, তুমি ফুলকপি লাইক কর না?

—করতাম। পাস্ট টেন্‌স। এখন আর করি না।

—কেন?

—গত এক মাস ধরে রতন যা গেলাচ্ছে! পারলে ভাত-রুটির বদলে কপি খাওয়ায়।

—এহেহে, তা হলে তো গণ্ডগোল হয়ে গেল। মালা তো ফুলকপিই এনেছে।

—হায় রে, আমার কপাল!

রঙিন শালে মোড়া মণিমালা ফুরফুরে প্রজাপতিটির মতো উড়ে এসেছে ঘরে। ঋতিরই সমবয়সি সে, দেখায় আরও কম। অন্যের ব্যাপারে একটু বেশি কৌতূহলী হলেও আলাদা একটা প্রাণোচ্ছলতা আছে মণিমালার। আর সেটা প্রায় সংক্রামক, পরিবেশকে লঘু করে দেয়।

সোফায় বসে মণিমালা কলকল করে উঠল,—যাক বাবা, বুদ্ধি করে ফুলকপিটাই রেঁধেছি। রতন বলল শীতকালে ফুলকপিই নাকি আপনার ফার্স্ট প্রেফারেন্স। ইশ, আগে জানলে কয়েকটা ফুলকপির পরোটাও ভেজে আনতাম।

বিপ্লব আর শুভময় সেকেন্ডের জন্য চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। পরের সেকেন্ডেই হাসিতে ফেটে পড়েছে বিপ্লব, শুভময়ও বিষম খাওয়ার জোগাড়।

মণিমালা থতমত। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে দুজনের দিকে। কারণটা শুনে সেও হেসে কুটিপাটি। হাসির ফোয়ারা থামতেই মণিমালা বলল,—আমার

প্রিপারেশানটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট শুভময়দা। এরকম কিন্তু রতন করে খাওয়াতে পারবে না। ফুলকপির রোস্ট, তবে হুবহু বইয়ের মতো নয়। আস্ত ফুলকপি মশলা টশলা মাখিয়ে কাঠ-কয়লার ঢিকিঢিকি আঁচে...গ্যাসে এরকম হবেই না। এলাচ লবঙ্গও দিয়েছি গোটা গোটা, ফ্লেভার আনার জন্যে। দেখবেন কপিটা মাখনের মতো নরম হয়ে গেছে।

—অ্যাই অ্যাই, কপির গল্প থামাও! শুভময়কে বলে দাও আর কী কী এনেছ।

—অল্প একটু মাটন আছে। কাবাব মতন, সামান্য গ্রেভি। আর নলেন গুড়ের পায়েস। ভাবলাম এখানে শুধু আপনার রতনের রান্নাই জুটছে, একটু মুখবদল হোক।

মণিমালা মাঝেমধ্যেই এটা সেটা নিয়ে আসে শুভময়ের জন্য। বোধহয় বউ ছাড়া থাকে বলে তার ওপর এক ধরনের করুণা আছে মণিমালার।

শুভময় তরল সুরে বলল,—তা সারাদিন শুধু এই সবই করলে? তোমার লেডিজ ক্লাব কি উঠে গেছে?

—এই উইকটা ক্লাব শিকেয় তুলে রেখেছি।

—কেন?

—এখন আমার কুকিং ফেজ। কালই রান্নাগুলো করার ইচ্ছে ছিল, তা কাল তো ছোটাছুটিতে হয়ে উঠল না।

—ও হ্যাঁ, কাল তো তোমরা চন্দ্রচূড় চৌধুরীর রিসর্টে গেছিলে।

—আর বোলো না, শীতের ভোরে লেপ থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠিনি, তখনই কানের কাছে প্যাঁ-পোঁ প্যাঁ-পো।

স্বাভাবিক স্বরেই বলছে বিপ্লব। বলবে নাই বা কেন? সিভিল কোর্টে রয়েছে, তার ওখানে তো আর ক্রিমিনাল লইয়ার চন্দ্রচূড় চৌধুরী কেস লড়তে দাঁড়ায় না। তা ছাড়া বিপ্লব অবশ্য কোথায় যাচ্ছে, যাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা, এসব নিয়ে মাথাও ঘামায় না বড় একটা। সেই উলুবেড়িয়ায় পাশাপাশি কাজ করার সময়েই তো দেখেছে শুভময়। হইহল্লা ছাড়া থাকতে পারে না বলে বিপ্লব দিব্যি চলে যেত যে কোনও আড্ডায়। এখনও বিপ্লব বদলায়নি। শুভময় নিজেও কি বদলেছে?

বিপ্লব উসখুস করছে সিগারেট ধরানোর জন্য। রতনকে হাঁক মেরে একটা খালি কাপ দিয়ে যেতে বলল শুভময়। কফিও বানাতে বলল। কনকনে শীতে চায়ের চেয়ে কফিটাই ভাল জমে।

সিগারেট ধরিয়ে পোড়া দেশলাইকাঠিটা কাপে ফেলল বিপ্লব। ঠাট্টার সুরে বলল,—তুমি বড় কিপটে আছ!

—কেন?

—একটা অ্যাশট্রে কিনতে পারো না? নিজে না হয় পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছ, আমাদের মতো পাষণ্ডদের কথাও তো একটু একটু ভাবতে হয়।

নীল কাচের ছাইদানটা কি উঠে এনে দেবে? থাক, ওটা ঋতির সম্পদ, ঋতিরই থাক। শুভময় সোফায় হেলান দিল,—তা কেমন দেখলে চন্দ্রচূড় চৌধুরীর রিসর্ট?

—কী বিস্তর দূর রে ভাই! দাসপুর পেরিয়ে বাঁয়ে টার্ন নিল, তারপর চলেছি তো চলেছি, চলেছি তো চলেছি। পিচের রাস্তা, কিন্তু সর্বাঙ্গে খোসপাঁচড়া। ঢেঁকুচকুচ করতে করতে কোমরের নাটবল্টু ঢিলে হয়ে গেছে।

—আমার তো বাবা জার্নিটা বেশ লেগেছে। একটা এক্সকারশান মতো তো হল। রিসর্টটাও দারুণ বানিয়েছে। কী চমৎকার সিনিক বিউটি। একেবারে নদীর ধারে, চারধারে সবুজ...

—কিন্তু অত ইন্টিরিয়ারে কি ট্যুরিস্ট যাবে?

—সে চান্স না থাকলে উকিলের পো পয়সা ঢালে? বিপ্লব কাপ হাতে তুলে ছাই ঝাড়ল, —চন্দ্রচূড়ের ছেলের হেডে ব্রেন আছে, প্ল্যানটা ভেঁজেছে জব্বর। মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে ট্যুরিস্ট আনবেই না। ওর রুট ভায়া বম্বে রোড, অথবা বাই ট্রেন, বাগনান। সেখান থেকে সাইড মেরে রূপনারায়ণের পাড়ে মানকুর ঘাট। অতঃপর রূপনারায়ণের হাওয়া খেতে খেতে শিলাইতে ঢুকে পড়বে বোট। রিসর্ট পৌঁছনোর জার্নিটাই ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান হয়ে যাবে।

—শুধু ছেলের বুদ্ধি বলছ কেন? বাপের মগজটারও তারিফ করো।

—সে কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? লোকাল পিপল কী বলে জানো তো? চন্দ্রচূড় নয়, ও নাকি শঙ্খচূড়।

—ভুল বলে না। একটা ফোর নাইনটি এইটের মামলায় তো হয়কে নয় করে দিচ্ছে। বাদীপক্ষের দু' দুটো জেনুইন সাক্ষীকে হোস্টাইল করে ছাড়ল! লুজিং কেসে এমন লড়াই আমি সাবডিভিশনাল কোর্টে আর দেখিনি।

—ক্রিমিনালদের না বাঁচালে চন্দ্রচূড়ের রিসর্ট বানানোর পয়সা আসবে কোত্থেকে!

—অ্যাই, তোমরা চন্দ্রচূড়বাবুকে নিয়ে পড়লে কেন? ওনার যা পেশা, উনি

তাই করছেন। মণিমালা পা নাচাচ্ছে,—ও শুভময়দা, বলুন না, আপনার বড়দিন কেমন কাটল?

মণিমালার কৌতূহলটা ঝলক আঁচ করে নিল শুভময়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—রিসর্ট হয়তো দেখা হল না, তবে ওখানেও একটা হল্লাগুল্লা অ্যাটেন্ড করেছি বই কী। ঋতির কবি-বন্ধুদের সঙ্গে।

—তাই? কী কী হল?

—খাওয়া দাওয়া, হাসি গল্প... কবিতাপাঠ তো বটেই।

—ঋতি কবিতা পড়ল?

—নিয়ে যেতে ভুলে গেছিল।

বিপ্লব হঠাৎ বলল,—ঋতি কিন্তু ভাঙছে।

শুভময় চোখ পিটপিট করল,—মানে?

—আগে ঋতির কবিতা ছিল সিরিন। বিষণ্ণ, কিন্তু শান্ত। ইদানীং ভীষণ মরবিডিটির দিকে ঝুঁকছে। এই তো সেদিন প্রদোষকালে ওর একটা কবিতা পড়ছিলাম। সেখানে চাঁদকে ও মেডুসার সঙ্গে কমপেয়ার করেছে!

—মেডুসা?

—হ্যাঁ। গ্রিক পুরাণের সেই লেডি ডেমন। পারসিউস যার মুণ্ডুটা ঘ্যাচাংফু করেছিল। বস্তুত চাঁদকে ও সেই মেডুসার কাটা মুণ্ডু বলছে! আমি পড়ে বেশ ঝাঁকি খেয়ে গিয়েছিলাম।

—ও। ক্ষণিকের জন্য কাল রাতের ঋতিকে দেখতে পেল শুভময়। ঠেলে উঠেছে চোখ, নাসারন্ধ্র ফুলছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক...! কেন যে অমন হিস্টিরিক হয়ে গেল হঠাৎ? কী চলছে ঋতির মনে? শুভময় মাথা নাড়ল দুদিকে,—আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—কবিতা কি এমনি এমনি বোঝা যায় ভাই? চর্চা করতে হয়। তুমি তো আই-পি-সি, সি-আর-পি-সির বাইরে কিছু পড়বেই না।

আরও কিছুক্ষণ বকবক করে, কফি বিস্কুট খেয়ে উঠে পড়ল বিপ্লব মণিমালা।

যাওয়ার আগে বিপ্লব বলল,—সন্ধেবেলা একা একা বসে থেকো না, প্লিজ। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটেছি। জোর খেলাধুলো হচ্ছে। চলে এসো।

মণিমালা মুচকি হেসে বলল,—এই কোর্টে আমরা বউরাও খেলি। জানেন তো, কলেজে আমি ব্যাডমিন্টন চাম্পিয়ান ছিলাম। ভুরু বেঁকাল মণিমালা,—

এখনও বাপের বাড়িতে মেডেলটা আছে।

নাচ গান আবৃত্তি রান্নার পর মণিমালার গুণের তালিকায় নবতম সংযোজন! শুভময় ঠাট্টা না জুড়ে পারল না, —দ্যাটস গ্রেট। তা হলে তো গেলে তোমার সঙ্গেই সিঙ্গলসে নামতে হয়।

—হেরে ভূত হয়ে যাবেন। আপনার বন্ধুও আমার সঙ্গে পেরে ওঠে না।

—গুল মেরো না। পরশু তুমি সিঙ্গেে গেম খেয়েছ।

—সে তো তোমার চোট্টামি। আউটে পড়া ফেদার বেমালুম রাইট বলে চালিয়ে দিলে।

কলকল করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে দুজনে। শুভময় তাদের এগিয়ে দিতে গেট অবধি এল। বিপ্লবের হাতে তিন সেলের টর্চ। উজ্জ্বল রশ্মি। জ্বলছে, নিভছে। হাঁটতে হাঁটতে বিপ্লব বুঝি বা কিছু বলল মণিমালাকে, বাতাসে উড়ে এল মেয়েলি হাসির রিনরিন। একেই কি সুখী দাম্পত্য বলে? ছোট ছোট মুহূর্ত, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না ভাগাভাগি করে বেঁচে থাকাকে? সে নিজেও তো তাই চেয়েছিল। হয়তো বা ঋতিও। কেন যে হল না?

পৌষের ঠান্ডা হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তবু একটুক্ষণ খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রইল শুভময়, শালে কানমাথা ঢেকে। আজ রাস্তার বাতিগুলো জ্বলেনি, অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে সামনেটায়। চাঁদও ওঠেনি, মাথার ওপর কোটি কোটি তারায় সাজানো অনন্ত চাঁদোয়া। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। নির্জনতা বাড়ছিল।

শুভময় আবার দেখতে পাচ্ছিল ঋতিকে। কালকের ঋতি। আসরে ঢুকে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ল... কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে দেখে নিচ্ছে শুভময়কে... থুতনিতে হাত রেখে নিবিষ্ট মনে শুনছে কবিতা... সুধন্যর কবিতার তারিফ করছে হাতের মুদ্রায়... সোমদত্ত নামের ছেলেটা এসে বসল গা ঘেঁষে... ছেলেটার বুকে কিল মারছে ঋতি... শুভময়ের কাছে ধবে এনে চেপে আছে সোমদত্তর কব্জি... ট্যাক্সিতে নিজেই সোমদত্তর প্রসঙ্গ তুলল, নিজেই হেলাফেলা মন্তব্য করছে সোমদত্ত সম্পর্কে... গালে ক্রিম মাখতে মাখতে অতি নগণ্য কারণে কী ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল... রাতে আচমকা লেপের মধ্যে ঢুকে এসে চুমু খেল শুভময়কে, পরক্ষণে ছিটকে গেল নিজের বিছানায়...

এত সব ঘটনার পারম্পর্য কী বলে? কী লুকনোর কথা বলছিল ঋতি? কী কী তাকে এখন লুকিয়ে রাখতে হয়, যার তাড়নায় সে পীড়িত হচ্ছে অহরহ?

পরিচিতমহলে তাদের ছেঁড়া ছেঁড়া দাম্পত্যজীবনের চেহারাটা? আদৌ কি তার প্রয়োজন আছে আর? লোকে কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? বিপ্লব টিপ্লবরা তো নেহাতই সহকর্মী, তেমন নিকটজনও নয়, তারাও হয়তো আন্দাজ করে নিয়েছে! আর কী হতে পারে? ঋতির টাকাপয়সার অপ্রতুলতা? কিন্তু সেও তো না চাইতেই শুভময় দেয় সাধ্যমতো। তা হলে? তা হলে? সোমদত্তর সঙ্গে ঋতির কি সত্যিই কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়েছে? নিজের মানসিক দুর্বলতাকে স্খলন ভেবে পাপবোধে ভুগছে ঋতি? এবং শুভময়কে খোলাখুলি না বলতে পারার চাপেই ঋতি অস্থির এমন? এতকাল পর হঠাৎ চুমুটা কি কোনও কিছুর খেসারত? অপরাধবোধের মাত্রা কমানোর প্রয়াস?

শুভময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তপ্ত। ভিজে। বাষ্পটা সাদা ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কী দরকার ঋতির মিছিমিছি কষ্ট পাওয়ার? একবার মুখ ফুটে বললেই কী শুভময় ডিভোর্স দিয়ে দেবে না? আগে চাইলে আগেও দিত। নিজে থেকে সে কিছু করবে না এটা ঠিক, তা বলে কটা অং বং চং আর সইসাবুদ হয়েছে বলে ঋতিকে সে বেঁধে রাখবে? এত বছর পরেও শুভময়কে চিনল না ঋতি?

রাগ নয়, বিরক্তি নয়, ক্ষোভ নয়, অনুযোগ নয়, দুঃখও নয়, একটা তীব্র অভিমান ছেয়ে ফেলছিল শুভময়কে। বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যও কি তাকে অনুভব করার চেষ্টা করল ঋতি? কী সে পছন্দ করে, কী তার অপছন্দ, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে কোনও দিন? তার কর্তব্যপরায়ণতাকে উপহাস করেছে। কর্মজগতে সে মাথা তুলে থাকতে চায়, তাতেও ঋতি বিরক্ত। মুনিয়া রইল না, তার জন্যও শুভময় দায়ী? মাথাভাঙার প্রতিটি শিশুই কি মেনিনজাইটিসে মারা যায়? কলকাতায় মেনিনজাইটিস হয় না? বাচ্চা মরে না? ডাক্তার অসুখ ধরতেই পারল না, সেও কি শুভময়ের দোষে? মুনিয়া হওয়ার পরে ঋতির যে বিশ্রী সমস্যা হল, তাতেই বা কী হাত ছিল শুভময়ের? মুনিয়াকে হারানোর ব্যথাও কি শুধু ঋতির একার?

শীতল অন্ধকারে শুভময় কেঁপে উঠল হঠাৎ। কী যেন একটা নড়ে উঠেছে পাশে! চমকে তাকাল,—ক্‌কে?

—আমি স্যার। বসন্ত।

—ও। শুভময় নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। ভারিক্কি গলায় বলল,—এই ঠান্ডাতেও ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছ?

—হ্যাঁ স্যার। মানে...না স্যার। ঘরেই থাকি, ঘণ্টাখানেক পর পর টহলে বেরোই। ...এত শীতে চোর আসে না স্যার।

শুভময় আলগা হাসল। ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা প্রথা অনুযায়ী এস-ডি-জে-এমের বাংলোয় একজন পাহারাদার থাকার কথা বটে, তবে একটা মাত্র হোমগার্ডে চোর বদমাশ কি আটকানো সম্ভব? তার ওপর বসন্তর মতো ডিগডিগে চেহারার এক হোমগার্ড, যার হাতে অস্ত্র বলতে পিঠ চুলকনোর একটা লাঠি!

হাসিমুখেই শুভময় বলল,—চোর বদমাশ নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না বসন্ত। চোর টোর ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো এড়িয়েই চলে।

—জানি স্যার। আপনি আছেন, আরওই আসবে না।

—কেন বলো তো? আমি কি স্পেশাল কেউ?

—তা নয় স্যার। এ তল্লাটের সবাই জানে আপনি খুব কড়া লোক।

—তুমি সেটা বোঝ তো?

অন্ধকারে সাদা দাঁত ছড়িয়ে হাসল বসন্ত। সম্ভবত জিভও কাটল।

—আশা করি, পৌষ মাসে তোমার কোনও বোনের বিয়ে নেই? এবার কিন্তু মাঘ মাসও মলমাস, আমি জানি। সুতরাং...। বলে একটু থেমে রইল শুভময়। বুঝি বা স্নায়ুচাপ তৈরি করল বসন্তর ওপর। তারপর বলল,—ছুটি নিলে সত্যি বলে ছুটি নেবে। বুঝেছ?

—আজ্ঞে স্যার। হ্যাঁ, স্যার।

পায়ে পায়ে ঘরে ফিরল শুভময়। একটা একটু জটিল কেসের রায় দিতে হবে কাল। কোর্ট থেকে ফাইলটা নিয়ে এসেছে, বসবে কি গিয়ে স্টাডিরুমে? থাক, খেয়ে উঠেই বরং...। মনঃসংযোগ করার জন্য মাথাটাকে আরও ঝরঝরে করে ফেলা দরকার।

রাতের মেনু আজ জবরদস্ত। চটপট খাবার গরম করে রতন থালা সাজিয়ে দিয়েছে, শুভময় নিঃশব্দে খাচ্ছিল। কপিটা সত্যিই ভাল রেঁধেছে মণিমালা, নুন মিষ্টিও সব নিখুঁত। ঝালটাও।

রতন পাশেই দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল,—একটু লঙ্কার আচার দেব স্যার?

—আচার? ওটাও দিয়েছে ম্যাডাম?

—না স্যার। পরশু দুপুরে একটা মেয়েলোক এসেছিল, আপনার জন্য রেখে গেছে।

—কে মেয়েলোক?

—কী যেন নাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাপসী। তাপসী পাত্র।

—সে আবার কে?

—বলল মতিপুরে থাকে। আপনি নাকি তাকে চেনেন।

—আমি?

—হ্যাঁ স্যার। বলছিল আপনি নাকি তার স্বামীর নামে পরোয়ানা জারি করেছেন। স্বামী নাকি খোরপোষ দেয় না, সে আপনার কাছে গেছিল...

—ও। শুভময়ের এতক্ষণে স্মরণে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলল,—আচার দিয়ে গেল, দাম দিয়েছিস?

—কিছুতেই নিচ্ছিল না স্যার। আমি সোজা বলে দিয়েছি, দাম না নিলে ফেরত নিয়ে যাও। সাহেব এসব একদম পছন্দ করেন না, শুনলে তোমাকেই ফাটকে পুরে দেবেন।

রতনকে টেরিয়ে দেখে নিল শুভময়,— দাম না দিয়ে থাকলে তোকে আগে ফাটকে পুরব।

—বিশ্বাস করুন স্যার...

—কাল মতিপুরে গিয়ে বাড়ি খুঁজে দাম দিয়ে আসবি।

রতন পলকে অধোবদন। মিনমিনে গলায় বলল,—হ্যাঁ স্যার।

রতনকে কঠোর ধমক দিতে গিয়েও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল শুভময়। এই সব ছোট ছোট লোভ দমন করা খুব কঠিন। রতনের মতো গরিব মানুষদের পক্ষে তো আরও কঠিন। অবশ্য লোভের ব্যাপারে গরিব বড়লোক বাছাবাছি করা বোধহয় ঠিকও নয়। রিপু বলে কথা।

রতন মাংসর বাটি এগিয়ে দিয়ে নিচু স্বরে বলল,—একটা কথা বলব স্যার?

—কী?

—মেয়েলোকটার স্বামী নাকি কোর্টের কাগজ পেয়েই বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বকেয়া টাকার খানিকটা দিয়ে গেছে, বাকিটাও নাকি সামনের মাসের মধ্যে মিটিয়ে দেবে। বউকে বলে গেছে পিটিশান করে কোর্টকে জানিয়ে দিতে। যাতে ওকে না আদালতে হেনস্থা হতে হয়।

—তা এতই যখন টনটনে প্রেস্টিজ জ্ঞান, ওরকম বজ্জাতি করা কেন?

—ঠিকই তো। বটেই তো।... মেয়েলোকটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, এখন কী করবে। বরের কথামতো দরখাস্ত দিয়ে কি কমপ্লেন তুলে নেবে? আমি প্রাপ্য বুঝিয়া পাইয়াছি, আমার আর স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নাই, এরকম কোনও বয়ান...?

শুভময় মনে মনে বলল, করলে সে গেছে। বর এবারকার মতো টাকা ছুঁইয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

মুখে বলল,—সে যা ইচ্ছে করুক। বরের ওপর বিশ্বাস থাকলে তুলে নেবে। আমার কী!

—ওর কিন্তু দরখাস্ত দেওয়ার ইচ্ছে নেই স্যার। ও চায়, বর হুজুরের কাছে ধমক খাক। তবে না সে সজুত হবে!

—তাই করুক। তবে বাড়িতে যেন এসব কথা বলতে না আসে। বারণ করে দিবি।

—আচ্ছা স্যার।

আহার শেষ করে মিনিট পাঁচেক দাঁত খোঁচাল শুভময়। মাংসর কুচি আটকে গেছে ফাঁকে ফাঁকে। বের করে আবার একটু কুলকুচি করল, উষ্ণ উষ্ণ জলে। তারপর ঢুকেছে স্টাডিতে।

টেবিলে মোটা মোটা বইয়ের স্তূপ। পাতায় পাতায় অজস্র চিরকুট গোঁজা। বিভিন্ন কেসের রেফারেন্স। চেয়ারে বসে ফাইল খোলার আগে একবার তাপসী পাত্রর মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। মেয়েটার চোখ দুটো ভারী সুন্দর।

ছয়

দেবাশিসের বাড়িতে মিটিং বসেছে আজ। ঋদ্ধির। খুদে সমবায়টা সরকারি খাতায় নিবন্ধীকৃত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাঝে সাঝে মিলিত হচ্ছে ঋতিরা। কোনও না কোনও সদস্যের বাড়িতে। উদ্দেশ্য, আসন্ন বাসস্থান নিয়ে আলোচনা। আদতে যা হয় ঋতি তার নাম দিয়েছে আলু চানা। অর্থাৎ মুখরোচক কিছু খেতে খেতে অবিরাম গৃহস্বামীর চা কফি ধ্বংস, আর স্রেফ গুলতানি। তা জমিরই যখন এখনও পর্যন্ত দেখা নেই, এ ছাড়া আর হবেটাই বা কী।

আজ অবশ্য মিটিং-এর পরিবেশ একটু সিরিয়াস। জমি পাওয়ার কাজটা ভানু হালদার বেশ খানিকটা এগিয়ে ফেলেছে, সদস্যরা তাই নিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত।

বছর পঁয়তাল্লিশের ববকাট চুল করবী বলল,—দাঁড়ান দাঁড়ান ভানুবাবু, ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিই।... আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা তা হলে লটারিতে

উঠবেই না? কিন্তু যদি আপনার ভি-আই-পি মশাই পরে আমাদের ডুবিয়ে দ্যান? তখন তো আমাদের এ কূল ও কূল দুইই গেল!

দেবাশিস মুড়ি শিঙাড়া আনিয়েছে। সঙ্গে রসগোল্লা। তমালিকা রান্নাঘরে চা কফির জোগানে ব্যস্ত বলে নিজেই খবরের কাগজ পেতে মুড়ি মাখছিল দেবাশিস। চানাচুরের ঠোঙা মুড়িতে উপুড় করে দিয়ে বলল, —ওটুকু রিস্ক তো নিতেই হবে করবীদি। লটারি মানেই বিশ বাঁও জল। দ্যাখো গে যাও হয়তো পাঁচ হাজার অ্যাপ্লিকেশান পড়েছে, প্লট হয়তো আছে পঞ্চাশটা।

—রেশিওটা ওর চেয়ে বেটার। চল্লিশেই মাথাজোড়া টাক ভানু দেবাশিসকে শুধরে দিল, কো-অপারেটিভের জন্য তিরিশটা প্লট আছে, প্রার্থী সাতশোর বেশি নয়।

—তবু আমি বলব চান্স রিমোট। গড়ে প্রতি পঁচিশটা কো-অপারেটিভের জন্য একটা জমি। দেবাশিস একসঙ্গে দুটো বুড়ো আঙুল দেখাল,—আমাদের কপালে জুটবেই না। তখন তো আমও গেল. ছালাও গেল।

রেণু বলল,—হ্যাঁ রে। লটারি ফটারিতে না যাওয়াই ভাল। আমার লটারির ভাগ্য খুব খারাপ। দেওয়ালিতে পাড়ার একটা লোক প্রায় জোর করে একখানা একশো টাকার টিকিট গছিয়ে গেল, বলল এক কোটি টাকা ফার্স্ট প্রাইজ, পুরো একশো টাকাই আমার ভোগে। একটা হাজার টাকার সান্ত্বনা পুরস্কারও জুটল না।

—তা হলে ভাব, তোর মতো অপয়া থাকলে আমাদের ঋদ্ধির পাঁচ হাজার টাকাও জলে যাবে।

ঋতি চুপচাপ শুনছিল। একটা শিঙাড়া তুলে নিয়ে বলল,—অত সব উল্টোসিধে ভাবনার দরকার কী! ভানুবাবু তো অ্যাশিওর করছেন ভি-আই-পি কোটায় হয়ে যাবে।

—নাইনটি এইট পারসেন্ট পসিবিলিটি। শুধু দু'পারসেন্ট গ্যারান্টি আমি হাতে রাখছি। রাজাগজার মতি... পালটি খেতে কতক্ষণ! তবে মনে হয়, আমরা পাবই। আট কাঠা হবে না, পাঁচেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এবং উনি বলেছেন, জমিটা যাতে কর্নার প্লট হয় এটুকু উনি চেষ্টা করবেন।

দীপক চামচে করে রসগোল্লা কাটছিল। টুকরোটা মুখে না পুরে প্রশ্ন জুড়ল,—কিন্তু কীরকম কর্নার? সাউথ-ইস্ট? না নর্থ ওয়েস্ট? পূর্ব দক্ষিণ খোলা না থাকলে কর্নার প্লট নিয়ে লাভ কী।

—ওঁর কাছে কি এতটা আবদার করা যায়?

—অ্যাই মশাই, আপনার এই 'উনি', 'ওঁর'...কে বলুন তো? রহস্য করছেন কেন?

—মিস্ট্রি কিছু নেই। পরে জানতেই পারবেন।

—মন্ত্রী টন্ত্রী?

—হতে পারে। নাও হতে পারে।

—এম-এল-এ? এম-পি? কোনও হোমরাচোমরা ব্যুরোক্র্যাট?

—ব্যুরোক্র্যাট নয়। ওদের আর কী ক্ষমতা, ওরা তো এখন নখদন্তহীন সিংহ। পঞ্চায়েত প্রধান টুসকি বাজালে বিডিওদের কাছা খুলে যায়, ডি-এমকে করজোড়ে দাঁড়াতে হয় সভাধিপতির সামনে, আই-এ-এস অফিসারদের নাইনটি পারসেন্ট এখন মন্ত্রী শাস্ত্রীদের হুকুমবরদার। ...আমার ভি-আই-পি পলিটিকাল পারসন। কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপ। নিজেই বলেন, কালচার ফালচারে আমার খুব আগ্রহ। শিল্পী সাহিত্যিকদের তৈরি কো-অপারেটিভ বলেই ঋদ্ধিকে উনি ফেভারটা করছেন।

—যাক। কবিতা লিখে এইটুকু তো হয়েছে। ঋতি ফুট কাটল,—বই বিক্রি হোক ছাই না-হোক, কবিতা কেউ পড়ুক না-পড়ুক, আমাদের দাদারা তো আমাদের পাত্তা দেয়।

কোণে, সোফায় নিঃশব্দে বসেছিল প্রদীপ। ঋতিদেরই বয়সি, এক আধ বছরের বড় ছোটও হতে পারে। চোখে কায়দার চশমা, এক মাথা ঢেউ খেলানো চুল। শিল্পী সাহিত্যিকদের এই আসরে সে একটু চুপচাপই থাকে। সে হাত তুলে বলে উঠল,—আমার একটা বক্তব্য ছিল।... আমরা কি এখন কিছু প্র্যাকটিকাল সাইড ডিসকাস করতে পারি না?

করবী বলল,—ওমা, আমরা এতক্ষণ ইমপ্র্যাকটিকাল আলোচনা করছি নাকি? সবই তো কাজের কথা।

—না না, সে ঠিকই আছে। তবে আমরা যদি একটু স্পেসিফিক হই...। যেমন ধরুন, এখন আমরা ধরে নিতে পারি, জমি আমরা পাব পাঁচ কাঠা। অর্থাৎ সাকুল্যে ছত্রিশশো স্কোয়্যার ফিটের মতো। আমাদের সব প্ল্যান প্রোগামই এখন এই ছত্রিশশো স্কোয়্যার ফিটকে বেস করেই স্থির করতে হবে। অ্যাম আই রং?

—একদম না। দেবাশিস একটা হাত টেনিসর‍্যাকেটের মতো চালাল,—এগোন।

—আমরা তো আছি আটজন, তার মানে বাড়ি উঠবে চারতলা? প্রতিটি তলায় দুটি ফ্ল্যাট?

—সে তো আগেই ঠিক হয়ে গেছে।

—কিন্তু জি প্লাস ফোর তুলব? না স্ট্রেট চারতলা? যদি নীচ তলাটা গ্যারেজ পারপাসে রাখি, তা হলে কিন্তু আমাদের কস্ট মার্জিনালি বেশি পড়বে।

রেণু বলল,—তবু প্রভিশান রাখা ভাল। করবীদির গাড়ি আছে, আমরাও হয়তো কিনতে পারি...

দীপক বলল,—আমিও তো ভাবছি...। ব্যাংকের একটা লোক যা ছিনে জোঁকের মতো লেগেছে, মনে হচ্ছে না কিনিয়ে ছাড়বে না।

—তা হলে আমরা ধরে নিলাম, জি প্লাস ফোরের ব্যাপারে আমরা সবাই একমত। মিটিং-এর মাইনিউটসে ডিশিসানটা তবে এন্ট্রি হয়ে যাক।

আট সদস্যের কো-অপারেটিভে চারজন ডিরেক্টর। করবী চেয়ার পারসন, দেবাশিস সেক্রেটারি, দীপক কোষাধ্যক্ষ, ভানু চতুর্থ পরিচালক। চারজনই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কারণ মিটিং-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখার বইটি আজ নেই, পড়ে আছে করবীর বাড়িতে।

করবী আমতা আমতা করে বলল, —পরে লিখলে হয় না?

—হয়। তবে দিনের দিন লেখাটাই ভাল। পরে আর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না।

তমালিকা চা এনেছে। সবাইকে হাতে হাতে কাপ বাড়িয়ে দিল। বুচকুন পাশের ঘরে টিভি দেখছিল, দরজায় এসে কোমরে হাত দিয়ে মিনিট খানেক পর্যবেক্ষণ করে নিল সবাইকে, রেণু তার দিকে একটা রসগোল্লা বাড়াতেই সে নাক কুঁচকে নিমেষে হাওয়া।

প্রদীপ চা খেতে খেতে ফের বলল, —এবার সেকেন্ড পয়েন্ট। ফ্ল্যাটে লিফ্‌ট হচ্ছে, কি হচ্ছে না?

—লিফ্‌ট তো মাস্ট। করবী বেজে উঠল, —আমার তো এখনই হাঁটুর ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। বুড়োবয়সে চারতলা আমি ঠেঙাব কী করে!

—আপনার প্রশ্ন থেকেই থার্ড পয়েন্টটা কিন্তু চলে এসেছে। আপনি চারতলাতেই থাকবেন এটা ভেবে নিচ্ছেন কেন? কে কোন ফ্লোর পাবে, সেটাও তো একটা প্রসেডিওরের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে। হয় আমরা পরস্পরের চয়েস মেনে নেব, নয় তো লটারি...

—আবার লটারি? রেণুর মুখ কাঁদো কাঁদো, —আমি তো হেরে যাব। চারতলায় আমাকেই থাকতে হবে।

করবী বলল, —লিফ্‌ট থাকলে নো সমস্যা। তুইই তখন চারতলা চাইবি।

—তা হলে লিফ্‌টের সিদ্ধান্তটাও ফাইনাল?

—দাঁড়ান দাঁড়ান। দেবাশিস থামাল প্রদীপকে, —জমি হাতে না পাওয়া অবস্থায় এক দিনে একটা সিদ্ধান্ত হওয়াটাই কি যথেষ্ট নয়? আজ অলকানন্দা নেই, নেক্সট দিন হয়তো থাকবে... সেদিন নয় আমরা আরও এক পা এগোব। ভানুবাবু আজ যা বললেন, তাতে প্লট পেতে এখনও মিনিমাম মাস তিনেক। তদ্দিনে আমরা আরও কয়েকটা ব্যাপার ফাইনাল করে ফেলতে পারব।

—তা অবশ্য করা যায়। মেজরিটি যা চাইবে তাই হবে।

করবী তাড়াতাড়ি বলল, —হ্যাঁ হ্যাঁ, মেজরিটি ভাবছে, আজ এই পর্যন্তই। কী, সবাই তাই বলো তো?

মিটিং করার থেকে মিটিং ভাঙাতেই সকলের উৎসাহ বেশি। শুরু হয়ে গেছে আড্ডা, হাসাহাসি। প্রদীপ ভানুকে বলল, —তুমি কি আরও বসবে? না যাবে আমার সঙ্গে?

—না না, চলো। আমায় এখন একবার বেলঘরিয়ার দিকে যেতে হবে।

ভানু প্রদীপ বেরিয়ে যাওয়ার পর আরও উদ্দাম হল গল্পগুজব। আবার চা। আবার চা। সাড়ে সাতটার পর থেকে আস্তে আস্তে খালি হচ্ছে বাড়ি। ঋতিও উঠছিল, আটকে দিল দেবাশিস। সবাই চলে যাওয়ার পর নিজেও বেরোল ঋতির সঙ্গে।

বড়রাস্তার মুখে এসে দেবাশিস জিজ্ঞেস করল, —তোর কি খুব তাড়া?

—হ্যাঁ হ্যাঁ... দাদার সন্ধেবেলা আসার কথা...

—ও। পাঁচটা মিনিট আর স্পেয়ার করতে পারবি না?

—কেন? আরজেন্ট কিছু? বাড়িতে এতক্ষণ বললি না কেন?

—সব কথা কি বাড়িতে বসে হয়? দেবাশিসকে আড়ষ্ট দেখাল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, —প্রদীপ লোকটাকে তোর কেমন লাগে?

—ভেরি মেথডিকাল। বেশি গ্যাঁজাল্লি করে আমাদের মতো সময় নষ্ট করে না...

—তুৎ, এক্কেবারে রসকষহীন। রামগরুড়ের ছানা। ওর সঙ্গে আমাদের পটবে না, বুঝলি।

—কিন্তু লোকটা কাজের। গ্রুপের মধ্যে ওরকম এক আধটা মানুষকে মেনে নিতে হয়।

—আমরা বুঝি অকাজের লোক? ও যা যা বলে, সব প্ল্যানই তো আমাদের মাথায় আছে। ব্যাটা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!

ঋতি একটুক্ষণ দেখল দেবাশিসকে। প্রদীপের ওপর বিষোদ্‌গার করার জন্যই কি দেবাশিস তার সঙ্গে বাইরে এল? তা প্রদীপ চলে যাওয়ার পর ঘরেই তো ক্ষোভটা উগরোতে পারত। বাকিদের সামনেই। কেউই যে প্রদীপকে বড় একটা পছন্দ করে না, তার কেঠো কেঠো হাবভাব নিয়ে হাসাহাসিও হয়, এ কি দেবাশিসের অজ্ঞাত? উঁহু, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

ঋতি সরু চোখে বলল, —তুই কী চাস্ বল্ তো? প্রদীপকে ঋদ্ধি থেকে আউট করতে?

দেবাশিস একগাল হাসল, —এই জন্যই তো তোকেই বলছি। তুই একমাত্র থটরিডিং করতে পারিস।

ঋতি মনে মনে বলল, পারি কি?

মুখে হাসি টানল ঋতি, —কিন্তু কেন? তোর কী পাকাধানে মই দিয়েছে?

—বললাম তো। লোকটা আমাদের সঙ্গে ঠিক ম্যাচ করছে না।

—সে তো ভানুবাবুও করে না। ঝেড়ে কাশ্ তো।

—একজন আমাদের কো-অপারেটিভে জয়েন করতে চায়।

—কে? ঋতির চোখ আরও সরু, —সম্পূর্ণা?

দেবাশিস ঘাড় চুলকোচ্ছে। অপ্রতিভ মুখে বলল, —হ্যাঁ। ওর বর ফ্ল্যাট কিনতে খুব আগ্রহী। বাইপাস টাইপাস সাইডেই। ... আমি হিসেব করে দেখেছি আমাদের ফ্ল্যাটের সাইজ আটশো সাড়ে আটশোর বেশি হবে না। নিজেরাই কন্ট্রাকটার লাগিয়ে করব, দামটাও তাই কমের দিকে থাকবে। উইদিন পাঁচ ছ' লাখ। দিবাকরবাবুর রেঞ্জের মধ্যেই।

সম্পূর্ণার সঙ্গে দেবাশিসের লটঘটটা তা হলে নতুন করে পেকেছে! মাঝে তমালিকা জেনে গেছিল, অশান্তিও হয়েছিল খুব। এমনকী তমালিকা বুচকুনকে নিয়ে বাপের বাড়িও চলে গেছিল। পরে অবশ্য সন্ধি হয়েছে, সরে এসেছিল দেবাশিস। অন্তত বহরমপুরের কবিসম্মেলনে গিয়ে যেভাবে দুজনে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাচ্ছিল, ততটা মাখো মাখো সম্পর্ক দেবাশিস আর রাখেনি। ঋতি তো সেরকমই জানত। এ শহরে কত নদীই যে বয়ে যায় গোপনে!

দেবাশিস আবার বলল, —তুই যদি ঋদ্ধিতে প্রস্তাবটা তুলিস, তা হলে তমালিকা... বুঝছিসই তো, তোকে আর কী বলব।

—কিন্তু ওটা কি বেশি রিস্কি হয়ে যাবে না? এক বাড়িতে...! অভিসারে একটু আড়াল আবডাল থাকাই তো ভাল।

—তোরা মেয়েরা মাইরি সবাই এক রকম। দেবাশিস দুম করে খেপে গেল,

—একটা মানুষ দুটো মেয়েকে একসঙ্গে ভালবাসতে পারে না? হৃদয় কি এতই ছোট, যে সেখানে একজন ছাড়া আর কারুর জায়গা হবে না? তমালিকা কেন এত সংকীর্ণ হবে? দিবাকরবাবু যখন মেনে নিয়েছেন...

—মেনে নিয়েছেন? ঋতি জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল, —অসম্ভব, দুনিয়ার কোনও পুরুষ মানতে পারে না। ইম্পোটেন্ট হলেও না।

—হ্যাঁ রে, বিশ্বাস কর। সম্পূর্ণা বরকে সাফ সাফ বলে দিয়েছে, হয় তুমি এটা অ্যাকসেপ্ট করে থাকো, নয় আমায় ছেড়ে দাও। তার পরেও তো বর একসঙ্গে আছে।

ঋতি বলতে যাচ্ছিল, একে মেনে নেওয়া বলে না। এ হল সহ্য করা। দিবাকরকে সে দেখেনি, হয়তো সে যে করেই হোক পরিবারটাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। হয়তো ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে। হয়তো লোকলজ্জা এড়াতে। বলল না কিছু। দেবাশিস যদি তার দিকেই আঙুল তোলে? যদি শুভময় আর ঋতির পৃথক থাকাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায়?

দেবাশিস একটু অধৈর্য ভাবে বলল, —তা হলে কী করবি? প্রোপোজালটা তুলবি তো?

—ছেলেমানুষের মতো কথা বলিস না। ঋতি মৃদু উষ্মা প্রকাশ করল, —চাইলেই কি হুট করে কো-অপারেটিভ থেকে কোনও মেম্বারকে হঠানো যায়? তুই তো সেক্রেটারি, জানিস না কত ঝঞ্ঝাট, কত কাঠখড় পোড়াতে হয়?

—সব্বাই এককাট্টা হলে...

—কেন হবে? ভানুবাবুই ক্ষুব্ধ হবে। প্রজেক্টটাই হয়তো আপসেট হয়ে যাবে।

—ও। দেবাশিস প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিমর্ষ মুখে বলল, —সম্পূর্ণার কিন্তু খুব ইচ্ছে ছিল।

ঋতি ভাবল দু'-চার সেকেন্ড। দেবাশিসকে দেখে মায়াও হয়, আবার অবস্থা কী দাঁড়াবে ভাবলে ভয়ও করে। হয়তো দেবাশিস তমালিকার জোড়া দিয়ে রাখা সম্পর্কটা ভেঙেই যাবে।

দেবাশিস কাতর গলায় বলল, — কোনও উপায় নেই রে?

—একটা স্কুপ আমি তোকে দিতে পারি। ঋতি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলল, —অলকানন্দা একটু ডাইসি আছে। ও একটু বেশি স্পেশাস্ ফ্ল্যাট চায়। আমাকে সেদিন বলছিল, দেড় হাজার স্কোয়্যার ফিটের কম ফ্ল্যাট হলে ওর অসুবিধে হবে। আটশো, সাড়ে আটশোর ফ্ল্যাট বোধহয় ও নেবেই না।

—তাই নাকি? দেবাশিসকে উদ্দীপিত দেখাল, —অলকানন্দাকেই তা হলে ছাঁট। তোদের তো খুব ফোনাফুনি চলে, মেসেজ চালাচালি হয়। তুই ওর ব্রেনওয়াশ কর না। আমাদের ফ্ল্যাটের যাবতীয় নেগেটিভ দিকগুলো মাথায় ঢুকিয়ে দে। পজিশানটা কত খারাপ, ঘরগুলো ঘুপচি ঘুপচি হবে, বাথরুমে হাত পা মেলে দাঁড়াতে পারবে না...

ঋতির পেট গুলিয়ে হাসি আসছিল। দেবাশিসের কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারেই গেছে। এত সব দোষের ফিরিস্তি শোনালে অলকানন্দা প্রথমেই বলবে, জেনেশুনে তুই ওখানে ফ্ল্যাট নিচ্ছিস যে বড়!

হাসিটা গিলে নিয়ে ঋতি বলল, —তার মানে অলকানন্দা সরে গেলে তোর প্রদীপে আপত্তি নেই?

দেবাশিস দু' হাত ছড়িয়ে দিল, —ঠিক আছে। থাকবে। ইট লোহা বালির দেখাশুনো করবে। পয়সা দিয়ে একটা সুপারভাইজারও তো রাখতে হত।

ঋতি হাসতে হাসতে বলল, —সো... ইওর প্রবলেম সল্‌ভড? এবার আমি কাটি?

বাসস্টপ কাছেই। চল্লিশ পঞ্চাশ পা। ঋতি ফুটপাথ ধরে এগোচ্ছিল, আবার তাকে এসে ধরেছে দেবাশিস, —এই এই এই, তোর সঙ্গে আর একটা কথা ছিল যে।

—জ্বালালি। কীই?

—কদিন ধরে জিজ্ঞেস করব ভাবি, আর ভুলে যাই। তোর মায়াবিনী এখন কেমন চলছে রে?

—এটা জানার জন্য তুই...? ঋতি মুখভঙ্গি করল, —চলছে কোথায়, খোঁড়াচ্ছে।

—আমিও তাই শুনছিলাম। তোর বুটিকের পজিশানটাই বেমক্কা। আমার কাছে একটা ভাল দোকানঘরের সন্ধান আছে। ইন্টারেস্টেড?

—কোথায় দোকান?

—গড়িয়াহাটে। এসি মার্কেটের গায়েই। অলমোস্ট মেন রোডের ওপর। সাইজও মন্দ নয়। বারো বাই দশ।

—দক্ষিণা?

—আগে তুই নিতে চাস কিনা বল্‌। তা হলে আমি কথাবার্তা এগোই।

—ওরকম প্রাইম পজিশানে না চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমার নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে।

—ভেরি রিজনেবল্ প্রাইস। বলতে পারিস, জলের দর। দেবাশিস গলা ঝাড়ল, —ঠান্ডা মাথায় শোন্। ওখানে একটা বইয়ের দোকান আছে। তা গড়িয়াহাটের মতো পশ এরিয়ায় কি এখন বইয়ের দোকান চলে! মালিকটা বুড়ো, ছেলেপুলে নেই, বিজনেস তুলে দিচ্ছে। সেলামি নিয়ে ভাড়া বসাবে।

—কত সেলামি? পঞ্চাশ লাখ? এক কোটি?

—তুই এত পেসিমিস্ট কেন রে? দেবাশিস হেসে ফেলল, —আমি যখন বলছি, নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তেই বলছি। বুড়োর ভাইপোকে একসময়ে প্রাইভেট পড়াতাম। এক্স মাস্টার হিসেবে বুড়ো এখনও আমায় কিছুটা রেসপেক্ট করে। ওখান দিয়ে যাতায়াত করলে মাঝে মাঝে ওর দোকানে গিয়ে দাঁড়াই, চা টা খাওয়ায়। সেদিন কথায় কথায় ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার কথাটা বলছিল। জানিসই তো আমার অভ্যেস, সেলামি টেলামির কথা শুনেই দরাদরি শুরু করে দিলাম। তোর ব্যাপারটাই আমার মাথায় ঘুরছিল। ... বুড়ো সাড়ে তিন অব্দি নেমেছে। মনে হচ্ছে আমি আর একটু চাপাচাপি করলে তিনে রাজি হয়ে যাবে। আর ভাড়া মাসে পাঁচশো।

ঋতির মুখ উজ্জ্বল হয়েও নিবে গেল। গড়িয়াহাটের মতো জায়গায় তিন লাখ সত্যিই কম, আজকালকার দিনে তিন লাখ এমন কিছু বড় অঙ্কও নয়, কিন্তু ঋতি অত টাকা পাবে কোত্থেকে?

দেবাশিস ফের বলল, —কপাল ঠুকে নিয়ে নে। তোর মায়াবিনী জমে যাবে।

—দেখি। ভাবি একটু।

—চটপট জানা। বেশি টাইম নিস না। বুড়োর সঙ্গে কথাটা ফাইনাল করে নে। দালালরা এখনও সন্ধান পায়নি, তারা এসে ছেঁকে ধরলে... অ্যাইসান লোভ দেখাবে, বুড়োর মতি বদলে যেতে পারে।

—হুম্। ... নিতে পারলে তো ভালই হয়।

চিন্তাটা মাথায় নিয়ে ঋতি বাসে উঠল। রবিবারের সন্ধে, বাসে তেমন ভিড় নেই, জায়গা পেয়ে গেছে বসার। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে ঠান্ডা, ফুটছে গায়ে। নতুন বছরের প্রথম তিন চারটে দিন শীতটা বেশ বেড়েছিল, তারপর ঝুপ করে কমে গেল। আবার ফিরেছে নতুন উদ্যমে, হাড় কাঁপানো বাতাস নিয়ে। জানলাটা কি বন্ধ করে দেবে? থাক গে, বাসের বাকিরা যখন সইতে পারছে...

মোবাইলে কুক কুক। সংক্ষিপ্ত বার্তা পরিষেবা। ছোট্ট একটা বিন্দু থেকে

ক্রমশ হৃদয়ের ছবি। সঙ্গে লিপিও আছে। আমার হৃদয় আন্দোলিত হয়, যখন তুমি আমায় স্মরণ করো। সোমদত্ত। এস এম এসে চোখ বুলিয়ে মোবাইল ব্যাগে রাখল ঋতি। কন্ডাকটারকে টিকিটের পয়সা দিতে ব্যাগ খুলেছে, আবার মোবাইলে মেসেজ। আবার সোমদত্ত। কোথায় তুমি? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

সব সময়ে কি এমন চপলতা ভাল লাগে? বিশেষত মাথায় যখন সিরিয়াস কোনও ভাবনা পাক খাচ্ছে? ঋতি মোবাইলটাই অফ করে দিল।

টুম্পা পাপিয়া মায়াবিনী বন্ধ করে চলে গেছে। সেরকমই নির্দেশ ছিল। বাস থেকে নেমে বুটিকটাকে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দেখল ঋতি। তারপর পা চালিয়েছে জোরে জোরে।

বাড়ি ফিরেই দাদার মুখোমুখি। প্রীতম ছোট্ট সোফায় বসে পরোটা খাচ্ছিল। বোনকে দেখে গজগজ করে উঠেছে, —কী রে, কী করছিলি এতক্ষণ?

ঋতি দায়সারা ভাবে বলল, —কেন, মা বলেনি আমাদের ঋদ্ধির মিটিং ছিল?

—এতক্ষণ কীসের মিটিং? তোর বুটিকের মেয়েটা তো বলল সাড়ে চারটেয় বেরিয়ে গেছিস?

দাদার এই কর্তালি ভাবটা ঋতির একদমই পছন্দ নয়। দাদার গার্জেনগিরি দেখে মনে হয়, যেন তার ভরসাতেই ঋতিকে কলকাতায় রেখে গেছে শুভময়! যেন ঋতি নেহাতই একটা কচি মেয়ে, ভালমন্দ বোঝার বয়স হয়নি! কোনও কোনও সময়ে ঋতি চটেও যায়, আজ বিরক্তি প্রকাশ করল না।

নিস্পৃহ সুরেই বলল, —তুই তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসিসনি! এসেছিস মা'র কাছে।

—সকলেরই ভালমন্দের খোঁজ আমায় রাখতে হয়। যাক গে, একটা কাজের কথা শোন্। মা'র ছানি অপারেশন নিয়ে কী ভাবছিস?

—ভাবাভাবির তো কিছু নেই। করাতে হবে। ডাক্তারবাবু তো বলেছেন, ক্যাটার‍্যাক্ট ম্যাচিওর করে গেছে। তবে ডাক্তারবাবু তো এক্ষুনি কলকাতায় নেই। উনি ফিরুন, ডেট দিন...

—বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। শীতটা থাকতে থাকতেই অপারেশন করে ফেলা ভাল।

—এটা একেবারেই ব্যাকডেটেড আইডিয়া দাদা। আজকাল আর অপারেশনে শীত গ্রীষ্ম বলে কিছু নেই। তা ছাড়া হবে তো ফেকো সার্জারি, তাতে কীই বা কাটাছেঁড়া হয়?

স্মৃতি চা করছিলেন। কান এদিকেই খাড়া। রান্নাঘর থেকেই হঠাৎ বলে উঠলেন, —আমি কিন্তু ছানি কাটানোর পর বাবলুর ওখানে মাস খানেক থেকে আসব।

—আবার? এই তো ঘুরে এলে!

—তা হোক। মা'র আমাদের ওখানে ওঠাই ভাল। সারা দিনে অজস্রবার চোখে ড্রপ দিতে হবে, ঠিকঠাক চোখ ওয়াশ করা... তুই তো বাড়িতে থাকিসই না।

কথাটা ভুল নয়। তবু যেন ঋতি সোজা মনে নিতে পারল না। মা এমন কিছু অক্ষমও নয়, ভুলোও নয়, চোখে ক' ফোটা ওষুধ ঢালার মতো সামান্য কাজ নিজেই করে নিতে পারে। তা ছাড়া মঙ্গলা সকালে আসে, প্রায় সন্ধে পর্যন্ত থাকে, বুঝিয়ে দিলে সেও দেখভাল করতে পারে মা'র। ঋতিও বেশি দূরে যায় না, দিনে চার পাঁচ বার এসে দেখে যেতেই পারে মাকে। এও তো সত্যি, ওই সময়ে চব্বিশ ঘণ্টাই কোনও আপনজন কাছাকাছি থাকা উচিত। ঋতি হয়তো এমনিই ও বাড়িতে রেখে আসত মাকে, কিন্তু মা ওপরপড়া হয়ে কেন তুলবে কথাটা? দাদাই বা কেন ঠেস দেবে তার জীবনযাপনের ধারা নিয়ে? দায়িত্ববোধ যদি ঋতির নাই থাকত, তা হলে কি সে মাকে নিয়ে ছুটত ডাক্তারের কাছে?

বাদবিতণ্ডায় না গিয়ে ঋতি ঘরে ব্যাগ রেখে এল। সিগারেটের প্যাকেট আর সদ্য কেনা লাইটারটা নিয়ে ফের বসেছে দাদার সামনে। প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, —খাবি নাকি?

—আগে চা-টা খাই। প্রীতমের চল্লিশ পেরনো ভুরুতে অল্প ভাঁজ, —মা বলছিল তুই নাকি আজকাল চেনস্মোকার হয়ে গেছিস?

—সারা দিনে সংখ্যায় তোর চেয়ে এখনও কম খাই।

—সেটা এমন কিছু ক্রেডিটের ব্যাপার নয়। সব ব্যাপারে ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করিস না।

—কেন? সিগারেটে ছেলেদের ফুসফুস বুঝি আরও তাজা হয়? নাকি স্মোক করার অধিকারটা ছেলেদেরই একচেটিয়া?

স্মৃতি চা এনেছেন। অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, —ওর সঙ্গে তক্কো করে লাভ নেই বাবলু। ও নিজে যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। কারুর কথা কোনও দিন শুনেছে?... শুভ তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, উদাহরণ দেওয়ার সময়ে তার কথা কখনও ভুলেও বলে?

ঋতি গোমড়া। বোনের বদলে যাওয়া মুখভাব দেখতে দেখতে শব্দ করে

হেসে উঠল প্রীতম। নিজেকে দেখিয়ে বলল, —খারাপ লোকদের এগ্‌জাম্পল্‌ হিসেবে টানিস কেন?

—হয়তো আমি নিজে খারাপ বলে।

—নাহ্‌, তোকে নিয়ে পারা যায় না। ... হ্যাঁ রে, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খরচখরচা নিয়ে কোনও কথা হয়েছে?

লিকার চায়ের কাপখানা হাতে নিয়ে ঋতি বলল, —দশ বারো হাজার মতো পড়বে। আমি অর্ধেকটা দিয়ে দেব।

—না না, তুই কেন? আমি তো অফিস থেকে মোটামুটি পেয়েই যাই।

দাদার এই কথাটাকেও কি ঋতি সাদা মনে নিতে পারল? মা মেয়ের কাছে থাকে বটে, তবে মা'র ওপর ছেলের দাবিই যে বেশি, দাদা এটা কি প্রতি পদে বুঝিয়ে দেয় না? প্রীতমের কোম্পানির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, সরকারি হাতে থাকবে, না বেসরকারি হয়ে যাবে তাই নিয়ে টালবাহানা চলছে, মাঝে মাঝে মাসমাইনেটাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তবু এসব দায়িত্ব দাদা নিজের ঘাড়েই রাখবে। জোর করে। প্রতি মাসে মা'র খরচা বাবদ দেড় হাজার টাকা করে দিয়েও যায়। হয়তো বা এও ভাবে, ঋতির আর রোজগার কী, চাপটা তো ভগ্নিপতির ওপরই পড়ছে! শুভময়ের অনুরোধে মাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে বলে মা'র ওপর ন্যায্য অধিকারটা তো চলে যায় না।

প্রীতম উঠল প্রায় সাড়ে নটায়। ঋতি গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আবার ফিরে এসেছে দোকানঘরের চিন্তাটা। সিগারেট ধরাচ্ছে একের পর এক। কোত্থেকে জোগাড় করা যায় টাকাটা? বন্ধুবান্ধবদের কাছে দশ-বিশ হাজার চাওয়া যায়, তা বলে তিন লাখ...? সেই তা হলে শুভময়েরই দ্বারস্থ হতে হবে? চাইলে কি শুভময় পারে না ব্যবস্থা করতে? সচ্ছল দাদারা রয়েছে, নিজেরও পি-এফ টি-এফে নিশ্চয়ই জমেছে কিছু...! অবশ্য তিন লাখেই প্রয়োজন ফুরোবে না, বুটিক সাজাতেও খরচা আছে। ভাল জায়গায় দোকান করতে গেলে পেখম টেখম তো লাগাতেই হয়। সেও না হোক সত্তর আশি হাজারের ধাক্কা, লাখ হওয়াও বিচিত্র নয়। তখন না হয় ব্যাঙ্ক থেকে লোন চাইবে। কিন্তু পাবে কি? সেরকম হলে গয়না টয়নাগুলোও বেচা যেতে পারে। হার বালা চূড় চুড়ি দুল টুল মিলিয়ে পনেরো ষোলো ভরি তো আছে। তাতে কি ষাট-সত্তর হাজার আসবে না?

উঁহু, পরের চিন্তা পরে। আগে দোকান, তারপর তো সাজসজ্জা। উঠে এসে ঋতি একবার দেখে নিল মা কী করছে এখন। স্মৃতির চোখ টিভিতে গাঁথা,

টেলিফিল্ম দেখছেন। মা'র সামনেই ফোন করবে শুভময়কে? নাকি ঘর থেকে মোবাইলে? থাক, মোবাইলে অনেক খরচা। তিনশো টাকার কার্ড ভরেছে, এ মাসটা চালাতে হবে।

ঋতি চকিতে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। স্মৃতির পাশে বসে বলল, —কী গো, আজকে আমাদের খাওয়া দাওয়া নেই?

—তুই বললেই বসি।

—গরম করে ফ্যালো তা হলে। দিয়ে দাও।

—দু'মিনিট। খবরটা শুরু হোক।

স্মৃতি রান্নাঘরে যাওয়া মাত্রই সাইডটেবিলে রাখা ল্যান্ডফোনের রিসিভার তুলল ঋতি। বোতাম টেপার পর ওপারে অনন্ত ক্রিং ক্রিং। অবশেষে শুভময়ের গলা. —হ্যালো?

—ঋতি বলছি। ...কী করছিলে?

—এই একটু বইপত্র নিয়ে...। কলকাতার খবর সব ভাল তো?

—চলছে। ঋতি সামান্য কুণ্ঠিত স্বরে বলল, —তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল।

—কী?

—আমার বুটিকের হাল তো জানো। পজিশানের দোষে ব্যবসাটা ধরছে না। ভাবছিলাম যদি একটু বেটার কোথাও ঘর টর পাই...

—ভাল তো। দ্যাখো না।

—দেখছি। ...ইনফ্যাক্ট, একটা পেয়েওছি। গড়িয়াহাটে। মোটামুটি বড় ঘর।

—বাহ্। খুব ভাল। ছেড়ো না, নিয়ে নাও।

—কিন্তু অনেক টাকা সেলামি চাইছে। তিন লাখ। কী যে করি?

ও প্রান্তে শুভময়ের সাড়া নেই।

ঋতি গলা নামাল, —তুমি কি কোনও ভাবে ব্যবস্থা করতে পারবে? সম্ভব? ...না হলে কোনও চাপাচাপি নেই...

—দেখছি।

ঋতি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। বুঝি বা পড়তে চাইল শুভময়ের প্রতিক্রিয়া। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল, —দোকানের মালিকের সঙ্গে তা হলে ইমেডিয়েটলি গিয়ে কথা বলতে হবে। আমি কি এগোব? এ সুযোগ আর বার বার আসবে না, সেই জন্যই ভাবছিলাম...

—দ্যাখো... এগোও... কথা টথা বলো। দেখছি আমি কী করা যায়।

ভোররাতে একটা স্বপ্ন দেখল ঋতি। অন্য এক মায়াবিনীর। উঁহু, যেন পুরনো মায়াবিনীই বদলে গেছে কোনও জাদুকাঠির ছোঁয়ায়। ফাঁকা বুটিক ক্রেতায় ক্রেতায় ভরপুর, রংবেরং-এর মেয়েরা এটা নামান ওটা দেখান বলে চেঁচাচ্ছে, পাপিয়া টুম্পা ছুটে ছুটে গলদঘর্ম। উফ্, কী দ্যুতি মায়াবিনীর, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়।

ঘুম ভাঙার পর ঋতি হাসল একচোট। একেই কি আকাশকুসুম বলে!

সাত

সেলুনে চুল ছাঁটতে গিয়েছিল শুভময়। সাধারণত কর্মস্থলের সেলুনে সে বড় একটা ঢোকে না, স্থানীয় মানুষের চাহনিতে সে যেন একটু অস্বচ্ছন্দই বোধ করে। কাজেকর্মে জেলা সদর বা কলকাতায় তো যেতেই হয়, সেখানেই চুলের ঝামেলাটা মিটিয়ে আসে। এবার বড়দিনে কলকাতা গিয়েও ভুলে গেল বেমালুম, মেদিনীপুর ঢুঁ মারার প্রয়োজনও পড়ল না এ মাসে। তবে চুল তো থেমে নেই, সে তো বাড়ছেই। এখনও কেশকর্তন পর্বটি না সারলে লোক তো বাবরিচুলো হাকিম বলে হাসাহাসি করবে।

বাজার ভেদ করে পোন্টুন ব্রিজ ধরে নিলে বাংলোর দূরত্ব খানিকটা কম হয়। তবে ওই রাস্তা শুভময়ের ভাল লাগে না। বাজারটা কেমন ঘিঞ্জি। অন্ধকার অন্ধকার। স্যাঁতসেঁতে। উৎকট গন্ধও বেরোয়। তার চেয়ে মেন রোড ধরে ফেরা ঢের ঢের স্বস্তিদায়ক।

পাকা সেতুর মাঝ বরাবর শুভময়কে থামতে হল। বাচ্চার হাত ধরে এগিয়ে আসা একটি মেয়ে সহসা পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ করে একটা প্রণাম— চিনতে পারছেন হুজুর?

শুভময় ঈষৎ অন্যমনস্ক ছিল। একটু বা ভাবিতও। দু'-এক সেকেন্ড সময় নিয়ে বলল, —আপনি তাপসী পাত্র না?

তাপসী প্রায় মাটিতে মিশে গেল, —আমাকে আর আপনি বলবেন না হুজুর। আদালতে বলেন, তাতেই আমি লজ্জায় মরে যাই।

ঠিকই তো। আপনি তো না বললেও চলে। বয়সে তো তার চেয়ে তাপসী অনেক ছোট, তাই না? শুভময় মাথা নেড়ে বলল, —এটি কে সঙ্গে? মেয়ে?,

—হ্যাঁ হুজুর। মানু। মানসী।

—বাহ্, বেশ নাম।

—মা রেখেছে। আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে।

শুভময় ভাল করে দেখল তাপসীকে। কোর্টের ভেতরে জড়োসড়ো হয়ে থাকা মেয়েটিকে অনেকটাই অন্যরকম দেখাচ্ছে আজ। বিনয়ে নুইয়ে আছে বটে, তবে সেই ভিতু ভিতু ভাবটা নেই। গায়ের রংটাও যেন ততটা অনুজ্জ্বল নয়, যেমনটা লাগে আদালতে।

তাপসী মেয়েকে ঠেলছে, —নমো করো হুজুরকে, নমো করো।

—না না, ঠিক আছে। ওইটুকু বাচ্চা... বলতে গিয়ে হঠাৎই থমকে গেল শুভময়। কেন যেন মনে পড়ে গেল মুনিয়াও প্রায় এই বয়সেই মায়া কাটিয়েছে পৃথিবীর! আলগা ভাবে বাচ্চাটার চুল ঘেঁটে দিয়ে শুভময় বলল, —তোমার মানু তো বেশ সুন্দর।

—বাপে খেদানো মেয়ে হুজুর...। যত্নআত্তি তো কিছুই করতে পারি না...

এই রে, আবার দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসবে না তো? শুভময় সামান্য বিব্রত বোধ করল। আইনে যতটুকু করা যায় সে তো করেই দিয়েছে। আদালতে ডেকে ধাতিয়েছে বরটাকে। কড়া সতর্কবাণী শুনিয়েছে, ফের টাকা বন্ধ করলে তাকে পোরা হবে গারদে। পুরো টাকাই মিটিয়ে দিয়েছে বর মহোদয়, রতন মারফত এ খবরও শুভময়ের জানা। এর বাইরে আর কীই বা করার আছে শুভময়ের?

তাপসী অবশ্য ঘ্যানঘ্যান করল না। লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, —আমার এবারের জেলিটা কেমন খেলেন হুজুর?

—ভাল। তবে বড় মিষ্টি।

—আপনি বুঝি মিষ্টি কম খান? ...এবার একটু কম চিনি দিয়ে বানাব।

—না না, তার প্রয়োজন নেই। আমি জ্যাম জেলির তত ভক্ত নই। রুক্ষ হতে গিয়েও শুভময় নিজেকে সামলে নিল, —দাম টাম রতনের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছ তো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।

—তোমার ব্যবসা এমনি চলছে কেমন? বিক্রিবাটা হচ্ছে?

—হচ্ছে টুকুর টুকুর। দোকানিরা মাল নিলে পয়সা দিতে বড্ড ঘোরায়। ঘরে ঘরে বেচতে পারলেই লাভ বেশি। তাও তো এখন দু'-তিন মাস হবে না।

—কেন?

—মা চলে যাবে হাউর। ছোট দিদি পোয়াতি, শ্বশুরবাড়িতে আর কোনও

মেয়েলোক নেই, মাকে গিয়ে থাকতে হবে মাস কয়েক। তখন কি এই মেয়ে ট্যাঁকে আমি ট্যাঙোস ট্যাঙোস ঘুরতে পারব?

হুম্, সমস্যা বটে। তবে সমাধানের ভার আইনের হাতে নেই। শুভময় বলল, —দ্যাখো, যেটুকুনি যা পারো করো।

—আপনি আছেন মাথার ওপর, আমার ঠিক চলে যাবে। ...স্পেশাল বড়ি বানিয়েছি হুজুর, হিং দেওয়া। বাড়িতে দিয়ে আসব?

শুভময় হ্যাঁও বলল না, নাও বলল না। চোয়াল ফাঁক করল সামান্য। তাতেই ভারী কৃতজ্ঞ নয়নে তাকাচ্ছে তাপসী, চিকচিক করছে কালো চোখের মণি। আবার একটা প্রণাম সেরে চলে গেল বাজারের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে মা মেয়েকে একটুক্ষণ দেখল শুভময়। তাপসীর গায়ে সস্তা দামের চাদর। ওই চাদরে কি শীত আটকায়? বাচ্চাটার আধছেঁড়া সোয়েটার প্রায় হাঁটু ছুঁয়ে আছে। কারুর কাছে চেয়েচিন্তে পেয়েছে কি? আহা রে।

ছোট্ট শ্বাস ফেলে শুভময় হাঁটা শুরু করল। ব্রিজের ধার ঘেঁসে চলার সময়ে একবার চোখ পড়ল নদীতে। জল সামান্য বেড়েছে যেন। স্বাভাবিক। মাঘের গোড়ায় যা বৃষ্টিটা হল। দূরে কোথায় কোন সাগরের বুকে বাতাসের নিম্নচাপ, তার জেরে পর পর টানা তিনদিন ঝমর ঝমর। তারপরও তো আকাশ কেমন মুখ ভার করে রইল ক'দিন। দিনভর পাতলা মেঘের আস্তরণে ঢাকা পড়ে থাকছে সূর্য, তার তেজও নেই, প্রসন্নতাও নেই, সে এক বিশ্রী ওয়েদার। গত মঙ্গলবার থেকে অবশ্য মেঘ কেটেছে। ঠান্ডাও ঘুরে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্যিস এল, নইলে অসুখ বিসুখ বাড়ত নির্ঘাত। তবে এখানকার আলু চাষের বারোটা যা বাজার বেজে গেল। বসন্তর বাবা নাকি ধারদেনা করে দেড় বিঘে জমিতে আলু লাগিয়েছিল, সব নাকি খেতেই পচে ঢোল। টাকার চিন্তায় বসন্তর বাবা নাকি চুল ছিঁড়ছে।

টাকার কথা মনে হতেই শুভময়ের ভাবনাটা অন্য পথে বেঁকে গেল। পরশু রাতে আবার ফোন করেছিল ঋতি। দোকান মালিকের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা হয়ে গেছে, অনেক বলে কয়েও তিন লাখের নীচে নাকি তাকে নামানো যায়নি। শুভময় কোথ্থেকে জোগাড় করবে অত টাকা? তেরো চোদ্দো বছরের চাকরিতে কতই বা জমেছে প্রভিডেন্ড ফান্ডে? বড়জোর এক লাখ ষাট পঁয়ষট্টি। সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট তুললেও এক লাখ পনেরো-বিশের বেশি পাবে না। তাও অ্যাপ্লাই করে মাস খানেক অপেক্ষায় থাকতে হবে। ঋতি বলছিল অত নাকি সময় নেই, মাঘ মাসের মধ্যেই করতে হবে যা করার।

কোথ্থেকে যে কী হবে? ব্যাঙ্কেও তো ঘুরে আসা হল, তারাও তো লাখ খানেকের বেশি পারসোনাল লোন দেবে না। তারও আবার শোধ করার হাজারো ফ্যাকড়া। প্রথমেই আটচল্লিশখানা পোস্টডেটেড চেক দিতে হবে। শুভময়ের তো বদলির চাকরি, এখান থেকে চলে গেলে প্রতি মাসে এসে ব্যাঙ্কে ফেলে যেতে হবে টাকাটা। সে কি সম্ভব? ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও সেটা আন্দাজ করেছে, তাই বোধহয় কিন্তু কিন্তু করছিল একটু। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক লোন নিতে গেলে সি-জে-এমের কাছ থেকে পারমিশান আনতে হয়, সেখানেও সময় যাবে কিছুটা। এত সব বাধাবিঘ্ন টপকে যদি বা দু'জায়গা থেকে টাকা তোলাও যায়, তারপরও বাকি থাকে আশি হাজার। ঋতি বলছিল, মাঘ মাসের মধ্যেই করতে হবে সবকিছু। ওফ্, কোত্থেকে যে কী হবে?

ছুটির সকাল। সাড়ে নটা বাজে। নির্মেঘ আকাশের নীচে এখন ঝলমল করছে প্রজাতন্ত্র দিবস। স্কুলের মেয়েরা প্রভাতফেরিতে বেরিয়েছিল, দল বেঁধে ফিরছে কলকল করতে করতে। এক লরি যুবকের কুৎসিত চিৎকারে বিষাক্ত হয়ে গেল দৃশ্যটা। পিকনিক পার্টি? সরকারি অফিসগুলোতে পতাকা উড়ছে। নতুন, আধছেঁড়া, ঝকঝকে, মলিন।

বাংলোর কাছাকাছি এসে শুভময় দেখল সরোজ বেরোচ্ছে গেট খুলে। মুখোমুখি হতেই সরোজের মুখ উজ্জ্বল, —ফ্ল্যাগ তুলেই কোথায় হারিয়ে গেছিলেন শুভময়দা?

শুভময় স্মিত মুখে মাথাটা দেখাল। বলল, —তুমি হঠাৎ? কাজ ছিল নাকি?

—উপলক্ষটা কাজই, তবে আসল উদ্দেশ্য আড্ডা।

—তা হলে আর ফিরছ কেন? এসো।

ঘরে নয়, সরোজকে নিয়ে লনেই বসল শুভময়। রোদ্দুরে পিঠ রেখে। চেয়ারের সঙ্গে ছোট একটা টেবিলও রেখে গেছে রতন, শুভময় টেবিলে পা তুলে দিয়ে বলল, —আগে তা হলে কাজের কথাটাই সেরে ফ্যালো।

সরোজ সিগারেট ধরিয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, —অমিতাভবাবুর সঙ্গে রাত্তিরে আমার ফোনে কথা হল। উনি বললেন আমার পি-এফ সংক্রান্ত ট্রেজারি স্লিপটা নাকি দিন পনেরো আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাই পোস্ট।

—তাই নাকি? আমার কাছে তো এখনও অফিস থেকে পুট আপ্ করেনি!

—আপনি একটু দেখুন না। যদি এসে থাকে, তা হলে চটপট...। উইদিন দিস ফিনানশিয়াল ইয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে বাঁচি।

—সে তো বটেই। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেও যদি পাঠাতে পারি, তোমার কামিং স্টেটমেন্টে ভুলটা রেকটিফায়েড হয়ে যাবে। কাল শনিবার, কালকের দিনটা বাদ দাও, আমি সোমবার দেখছি।

—আর একটা কথা ছিল দাদা।

—বলো।

—ফেব্রুয়ারির মিডলে আমি কিন্তু দিন দশেকের ছুটি নেব। পল্লবী আর পুপাইকে কৃষ্ণনগরে রেখে আসতে হবে।

—ও। পল্লবীর এক্সপেক্টেড ডেট যেন কবে?

—দেরি আছে। এপ্রিলের দশ...। আমি কোনও রিস্ক নেব না, ওর বাবা মা'র হাতে সঁপে দিয়ে এসে...। পুপাই হওয়ার আগে যা সব কম্‌প্লিকেশান হয়েছিল।

—তার মানে এপ্রিলে তোমার আবার ছুটি চাই?

—কান্ট বি হেল্‌পড শুভময়দা। সরোজ কাঁধ ঝাঁকাল, —জানেনই তো, পল্লবী কী রকম সেন্টিমেন্টাল, ডেলিভারির টাইমে আমি না থাকলে...

—আরে যেও, যেও। তবে আগে থেকে নোটিস দিও, তোমার ঘরের মামলাগুলোকে তো সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

—তা তো দেবই। আপনাকে জাস্ট একবার মুখে বলে রাখলাম।

রতন জলখাবার নিয়ে হাজির। চিকেন স্যান্ডুইচ, কলা, সন্দেশ। ট্রে টেবিলে রেখে বলল, —স্যার, ম্যাডামের ফোন এসেছিল।

শুভময়ের বুকটা ধক করে উঠল। পরশুর পর আবার আজ? জিজ্ঞেস করল, —কখন?

—ন'টা নাগাদ।

—কিছু বলল?

—না স্যার। শুধু আপনাকে খুঁজছিলেন।

—আবার করবে?

—তেমন কিছু বললেন না তো।

—ও।

সরোজের সঙ্গে দিব্যি খোশমেজাজে আলাপচারিতা চলছিল এতক্ষণ, নতুন করে ফিরে এল চাপটা। ঋতি নিশ্চয়ই খুব মরিয়া হয়ে গেছে, নইলে কি এত ঘন ঘন ফোন করে? ঋতিকে নিরাশ করাটা কি শুভময়ের উচিত? ব্যবসাটা ডুবে যাচ্ছে ঋতির, হালে পানি পাওয়ার একটা সুবর্ণসুযোগ শুভময়ের অক্ষমতায় নষ্ট হয়ে যাবে? সবচেয়ে বড় কথা, আর কারও কাছে চাইছে না

ঋতি, নির্ভর করছে শুধু শুভময়ের ওপর। কাছে না আসুক, সঙ্গে না থাকুক, বিপন্ন মুহূর্তে শুভময়কেই ঋতির মনে পড়েছে তো। এতেই কি ধন্য হয়ে যাচ্ছে না শুভময়?

সরোজ বুঝি লক্ষ করছিল শুভময়কে। জিজ্ঞেস করল, —দাদা, এনি প্রবলেম?

—নাথিং অফ দা সর্ট। শুভময় তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, —খেয়ে নাও ভাই। শুরু করো।

ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে শুভময় আলোচনা করবে না, ক'মাস শুভময়কে দেখে এটুকু অন্তত বুঝে গেছে সরোজ। স্যান্ডুইচ তুলে কামড় বসাল। হাল্‌কা চালে বলল, —আপনার কোর্টে কাল তো ধুন্দুমার হয়ে গেল! আশিসতরু আর চন্দ্রচূড়ে নাকি হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল?

—ছাড়ো তো। ওটা উকিলদের নাটক। দ্যাখো গে, বিকেলেই হয়তো দুই ওস্তাদ গলা জড়াজড়ি করে চা বিস্কুট খেয়েছে। প্রসঙ্গ বদলে যেতে শুভময় সহজ। কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, —আশিসতরুই বেশি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিল। হওয়ারই কথা অবশ্য। আরগুমেন্টের সময়ে চন্দ্রচূড় ঠান্ডা মাথায় পাশ থেকে যা সব টিপ্পনী কাটছিল!

—আরগুমেন্ট কি শেষ?

—সোমবার লাস্ট। সেদিন চন্দ্রচূড়ের পালা। দেখা যাক আশিসতরু সেদিন চন্দ্রচূড়কে কতটা তাতাতে পারে।

—যাই বলুন, কেসটা কিন্তু জমে উঠেছে। খুব ভিড় হচ্ছে আপনার কোর্টে। উকিলরাও তো দেখি, বিনি পয়সায় আশিসতরু চন্দ্রচূড়ের লড়াই দেখতে ছুটছে।

—আবার বলে লড়াই! ওরা তো স্রেফ ভাড়াটে সেনাপতি। আসল যুদ্ধ তো দুই মক্কেলের। প্রেস্টিজ ফাইট। এ বলে, আমি তোকে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব। ও বলে, আমার এগেনস্টে ফোর নাইনটি এইট করেছিস, এবার আমি তোর মজা বার করব। দু'জনেরই বিশাল প্রতিপত্তি। অগাধ পয়সা। জলের মতো টাকা ঢালছে, আর আশিসতরুরা চোঁ চোঁ গিলে তলোয়ারের খেলা দেখাচ্ছে।

—মেয়ের বাপ টাউনেই থাকে না? কী সামন্ত যেন নাম?

—দুর্জয় সামন্ত। দু'দুখানা কোল্ড স্টোরেজ আছে। প্লাস একাধিক রাইসমিল্। বলতে পারো মিনি ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

—আর ছেলের বাপের পেট্রল পাম্প?

—একটা নয়। গোটা পাঁচেক। তার মধ্যে গোটা দুয়েক ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর। শুধু তাই নয়, চন্দ্রকোণার বাবু অধীর মাইতি জেলা পেট্রল ডিলারস অ্যাসোসিয়েশানের ভাইস প্রেসিডেন্টও বটে। সুতরাং বুঝছ তো, কাঠে কাঠে পড়ে গেছে , কেউ কাউকে ছাড়বে না।

—তবে দুর্জয় কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডটা জিতে আছে। অধীরকে সপরিবার কদিন হাজতবাস করিয়ে এনেছিল তো!

—সে পুলিশমহলে খুঁটির জোর থাকলে এমনকী কঠিন কাজ। আমার প্রিডিসেসার ধীরেন সেন কড়া লোক ছিলেন, তাই অধীররা একবারে বেল পায়নি, দু' হপ্তা থাকতে হয়েছিল পিসিতে। তবে পুলিশ যে হাজতে এদেরও কেশাগ্র স্পর্শ করেনি, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। টাকা থাকলে পুলিশ হাজতেও সেলাম বাজায়। অবশ্য যদি না কোথাও কোনও পলিটিকাল দুর্গন্ধ থাকে। তা অধীর সে দিক দিয়ে যথেষ্ট সেয়ানা, সব পার্টিকেই নাকি প্রণামী ঠেকিয়ে রাখে।

—আপনি এত সব জানলেন কী করে? লোকাল ট্যাবলয়েড?

—হ্যাঁ, ওসব থেকেই...। না পড়েও তো উপায় নেই, বুকপোস্টে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

—আচ্ছা শুভময়দা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? সরোজ আর একখানা স্যান্ডুইচ নিল, —ফোর নাইটি এইটের সঙ্গে আর কী কী সেকশান আছে?

—একগাদা। পাঁচশো নয়, পাঁচশো ছয়, তিনশো তেইশ, তিনশো সাতাশ, তিনশো সাঁইত্রিশ, থ্রি ফরটিসেভেন, থ্রি এইট্টিফাইভ... শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েকে বেরোতে দিত না বলে থ্রি ফরটিওয়ানও জুড়ে দিয়েছে।

—নিশ্চয়ই আশিসতরুর প্ল্যান? এই সেকশানে পিছলে গেলে ওই সেকশানে পাকড়াও করবে! আমাদের এপিপি সাহেবের মগজ থেকে নিশ্চয়ই এতগুলো সেকশান বেরোয়নি?

—অবশ্যই না। তিনি তো সেকশানগুলো আওড়াতে গিয়েই গুলিয়ে ফেলেন। রমেন মান্নার দৌড় জানে বলেই না আশিসতরুকে এক্সট্রা ইঞ্জিন হিসেবে লাগিয়েছে মেয়ের বাপ। এখন তো রমেনবাবু সাইফার, হাল ধরে আছে আশিসতরু। রণক্ষেত্র একাই সামলাচ্ছে।

—তা দেখেশুনে আপনার কী মনে হচ্ছে দাদা? বধূনির্যাতন হয়েছে?

—ইনফরমালি বলব, হয়েছে তো বটেই। সত্যি সত্যি অত্যাচার না হলে

কোনও বাপ মেয়েকে নিয়ে কোর্টে দৌড়ে আসে না।

—তা কেন দাদা? ফলস্‌ ফোর নাইনটি এইট কি হচ্ছে না? পঙ্গু অশক্ত শ্বশুর শাশুড়ি, যারা হুইলচেয়ার ছাড়া নড়াচড়া করতে পারে না, তাদেরও তো কাঠগড়ায় ধরে আনতে দেখেছি!

—দোজ আর এক্সেপশানস্‌ সরোজ, পারসেন্টেজে আসে না। তা ছাড়া ইনভ্যালিড হলেই যে সে নির্দোষ, এ কথাও হলফ করে বলা যায় না। মেন্টাল টরচার বলেও একটা ব্যাপার আছে। প্লাস, আর একটা জিনিসও তুমি লক্ষ করবে, যে সব ক্ষেত্রে অ্যালিগেশানটাই ফল্‌স হয়, সেখানে সো কলড্‌ নির্যাতিতা মেয়েটিই কিন্তু মামলায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে, বাবা মা অনেকটাই প্যাসিভ থাকে। বোঝা যায়, তারা মেয়ের মান রাখতে মেয়ের পক্ষ অবলম্বন করছে।... ইন দিস কেস, দি ম্যাটার ইজ ডিফারেন্ট। দুর্জয় সামন্ত সত্যি সত্যি খুব বিচলিত। ছেলের বাড়ির কব্‌জির জোর সে জানে, নিজেদের বাঁচাতে কত দূর অব্দি তারা নামতে পারে সে আন্দাজও তার আছে, মেয়েকে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হবে তাও তার অজানা নয়, তার পরেও মিথ্যে অভিযোগ হেনে সে দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবে, এ সম্ভাবনা কিন্তু কম সরোজ। খুবই কম।

—তার মানে ছেলেপক্ষ তা হলে ঝুলছে?

— তাই বা বলি কী করে! অভিযোগ করলেই তো হবে না, প্রমাণ চাই। বাদীপক্ষের কয়েকটা সাক্ষীকে চন্দ্রচূড় ভাল মতোই দুরমুশ করে দিয়েছে। আশিসতরুর ফেভারে মেন যে ইন্সিডেন্টটা আছে, সেটা হল মেয়ের ফোন পেয়ে রাতদুপুরে দুর্জয়ের মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ছোটা, সেখান থেকে মেয়েকে নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে ডায়েরি করা এবং মেয়েকে যে সেদিন সন্ধে থেকে প্রচুর মারধর করা হয়েছিল তার সাপোর্টে কিছু মেডিকেল রিপোর্ট। আরগুমেন্টে আশিসতরু এটাতেই বেশি স্ট্রেস দিয়েছে। যদিও অ্যাকিউজডরা বলছে, মেয়ে সেদিন শাড়িতে পা জড়িয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, তার ফলেই শরীর জুড়ে কালশিটে আর মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তারাই নাকি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছিল, কোথ্‌থেকে বাবা এসে হাজির হয়েছে। তবে আশিসতরুর সেকশান থ্রি টোয়েন্টি থ্রিটা কিন্তু উইক হয়ে গেছে। অভিযোগ— শাশুড়ি নাকি ইচ্ছে করে বাথরুমে সাবানজল ফেলে রাখত, যাতে আছাড় খেয়ে মেয়েটির হাড়গোড় ভাঙে। চন্দ্রচূড় খোদ মেয়েটিকে দিয়েই জেরার কৌশলে বলিয়ে নিয়েছে শাশুড়ি মহোদয়া নাকি স্বয়ং বাথরুমে পা পিছলে বার দুয়েক

চোট পেয়েছিল। সোমবার আরগুমেন্টে চন্দ্রচূড় নির্ঘাত বলবে বাথরুমে সাবানজল ফেলে রাখা শাশুড়ির অন্যমনস্কতাই প্রমাণ করে, নট হার ক্রিমিনাল ইন্‌টেনশান।

—হুম। তা তো বলবেই।

—আরও আছে। যেমন ধরো সেকশান তিনশো সাতচল্লিশ। রংফুল কনফাইনমেন্ট ফর দা পারপাস অফ এক্সটর্টিং প্রপারটি। মনোযোগী জুনিয়ারকে পেয়ে শুভময়ের ক্ষণপূর্বের উদ্বেগ উধাও, উৎসাহিত মুখে মেতেছে পেশাদারি আলোচনায়, —মেয়েপক্ষ বলছে, মেয়ের নামে রাখা দুর্জয় সামন্তর একটা রাইস মিল নাকি অধীর মাইতির ছেলের নামে লিখে দেওয়ার জন্য দুর্জয়ের মেয়েকে জোর করে আটকে রেখেছিল বর আর শ্বশুর। কিন্তু তার কনক্লুসিভ এভিডেন্স কোথায়? মেয়ে ফোনে বলেছে বললেই কি হবে? তখনই থানায় ডায়েরি হয়নি কেন? আশিসতরু অবশ্য বলেছে মেয়ের বাপ গোড়া থেকেই এত অশান্তি চায়নি, তাই...

—তা হলে বাদীপক্ষও স্বস্তিতে নেই?

—থাকবে কী করে! চন্দ্রচূড় যা করেছে...! কোথ্‌থেকে আস্ত একটা প্রেমিকই জোগাড় করে আনল মেয়ের। সে ছোকরা গীতা ছুঁয়ে দিব্যি ঘোষণা করে গেল, বিয়ের পরেও দুর্জয়ের মেয়ের সঙ্গে তার নাকি গভীর সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, মেয়েটা যে দুশ্চরিত্রা ব্যভিচারিণী সেটাকে অথিনটিকেট করার জন্য মেয়েটার প্রাইভেট পার্টসের বিবরণ পর্যন্ত দিয়েছে ছেলেটা। ব্রেস্টে কী মার্ক আছে, থাই-এর কোন্ পজিশানে লম্বা জড়ুল...

—এসব নোংরামিও হয়েছে নাকি? আমি জাস্ট শুনেছিলাম মেয়েটার ক্যারেক্টার নিয়ে কী সব কনট্রোভারসি হচ্ছে...!

—ইয়েস ব্রাদার। মেয়ের বদনাম ছড়ানোর ভয়েই তো শেষে আশিসতরু ইনক্যামেরা হিয়ারিং প্রে করল। ট্যাবলয়েডরা ওই খোসগপ্পোটি পায়নি।

—মেয়েটা তা হলে পুরোপুরি ধোওয়া তুলসীপাতা নয়?

—বিয়িং আ ম্যাজিস্ট্রেট, কী করে এ কথা বললে সরোজ? মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা দেওয়া কী এমন কঠিন কাজ, অ্যাঁ? যেখানে বর স্বয়ং আসামির কাঠগড়ায়! বর-শ্বশুররা তো প্রমাণই করতে চাইছে ফোর নাইনটি এইট ইজ ফল্‌স। মেয়েটার পরপুরুষে আসক্তি ধরা পড়ে গেছে বলেই শ্বশুরবাড়ির নামে অভিযোগ এনে মেয়েটি একটি সম্মাননীয় পরিবারকে সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়।

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, বর নিজেই সাজানো সাক্ষীকে বউয়ের শরীরের...?

—হতেই পারে। দুনিয়ায় সবই সম্ভব। বিশেষ করে যেখানে সারভাইভালের প্রশ্ন রয়ে গেছে। আশিসতরু অবশ্য নাজেহাল করে ছেড়েছে ছেলেটাকে। সাক্ষীর দাবি, মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ের আগে থেকেই সম্পর্ক। অথচ মেয়েটির সম্বন্ধে খুব ছোটখাটো ব্যাপারে সে কয়েকটা ভুল ইনফরমেশান দিয়েছে। ফর এগ্‌জাম্পল্, ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বিয়ের আগে তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিন মেয়েটি কী রঙের সালোয়ার কামিজ পরে এসেছিল। উত্তরে ছেলেটি ঝটপট বলে দেয়, নীল। অথচ মেয়েটি কোনও কালেই সালোয়ার কামিজ পরে না। বিয়ের আগেও ফ্রক ছাড়ার পর শাড়িই ছিল তার একমাত্র পোশাক।

—ট্রিকি প্রশ্ন করেছে তো আশিসতরু?

—এই চলেছে, বুঝলে। দু' পক্ষই ভূরি ভূরি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। এরা যদি সাবানজলের গপ্পো ফাঁদে, ওরা ধরে আনে প্রেমিক...

—আর এই সব মিথ্যের মধ্যে থেকেই সত্যিটা আমাদের খুঁজে বার করতে হয়। কী আয়রনি!

—সরোজ, এবার কিন্তু তুমি আমায় সত্যিই হাসালে। শুভময়ের ঠোঁটে ব্যঙ্গ,—সত্যি বলে আলাদা করে কিছু আছে নাকি? সত্য তাই, যা রচিবে তুমি। কী বুঝলে? সাক্ষী সাবুদ, সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি জোড়া লাগিয়ে উকিলবাবুরা যা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে, তাহাই সত্য। ইট মে বি ফ্যাক্ট। ইট মে বি কংকক্টেড। ভুলে যেও না, ন্যায়াধিকারীর দু' চোখ বাঁধা। ওই অন্ধত্ব মেনে নিয়েই তাকে নিক্তি হাতে বুঝতে হয় ন্যায়ের পাল্লা কোনদিকে ঝুঁকেছে।

রতন কফি দিয়ে গেছে, কাপ তুলল সরোজ। ঠোঁট কুঁচকে বলল,—তা অবশ্য ঠিক। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তো আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

—কিন্তু তার মধ্যেও খেয়াল রাখতে হবে, এভিডেন্স আরগুমেন্টস তুমি যুক্তি দিয়ে বিচার করছ কিনা। এবং সেই বিশ্লেষণটাও আইনের কাঠামোর মধ্যে আছে কিনা। এবং গোটা প্রক্রিয়াটাই তোমায় চালাতে হবে একজন মানুষের হৃদয় দিয়ে। নট লাইক এ রোবো, অর কম্পিউটার। এ যদি পারো, তোমার বিবেক সাফ। অ্যাট লিস্ট, আমি তো তাই বিশ্বাস করি। শুভময়কে ক্ষণিকের জন্য যেন ম্লান দেখাল। উদাস গলায় বলল,—বুঝলে সরোজ, মাঝে

মাঝে খুব খারাপ লাগে। মিথ্যে কথা বলতে পারব না, মিথ্যের সঙ্গে আপোস করব না, তাই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলাম। মাথায় ভূত চেপেছিল ন্যায়ের ধ্বজা আকাশে তুলে রাখব। ভূতটা যে মাথা থেকে নেমে গেছে তা নয়, তবে ইদানীং মনে হয় সত্যি মিথ্যের ভেদাভেদগুলো যেন ক্রমশই লোপ পেতে বসেছে।

—আপনি এভাবে বললে আমরা কোথায় যাই দাদা? আপনার মতো অনেস্ট, স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপলের মানুষ আর কটা আছে?

—ভেতরে সংশয়গুলো জাগে বলেই বোধহয় কড়া থাকি সরোজ। শুভময় ঢিলতে হাসল,—কিংবা বলতে পারো কড়া সাজি।

সরোজ যেন ঠিক মানতে পারল না কথাটা। তবে আমলও দিল না সেভাবে। হয়তো ধরে নিল শুভময় তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। এমন মনোরম সকালে শুভময়ের মতো নীরস মানুষের মনে কিঞ্চিৎ লঘুতা জেগেছে, সরোজ হয়তো এও ভাবতে পারে।

সরোজ চলে যাওয়ার পরও শুভময় বসে আছে চেয়ারে। বসেই আছে। একা হতেই আবার মস্তিষ্কে ভনভন। কেন এত বার করে তাড়া লাগাচ্ছে ঋতি? শুভময়ের অসহায়তার কথা ঋতি কোনওদিন ভাবলই না। কোথায় এখন টাকা চাইবে? সহকর্মীদের কাছে? চাওয়া যায়? কী বলবে? আমার বউ বুটিক খুলছে, তোমরা আমায় যে যা পারো ধার দাও?

প্রজাপতি উড়ছে লনে। শুভময় তাকিয়েই আছে, দেখছে না। পিছনের আমগাছটায় একটা অচেনা পাখি ডেকে উঠল। শুভময়ের কান পর্যন্ত পৌঁছল ডাকটা, তবু সে শুনতে পেল না। রোদ্দুরে তেতে উঠেছে পিঠ, চামড়া জ্বলছে, তবু হুঁশ নেই শুভময়ের।

রতনের ডাকে সম্বিৎ ফিরল,—স্যার, স্নানে যাবেন না?

আলগা আড়মোড়া ভাঙল শুভময়,—হ্যাঁ, এবার তো যেতে হয়।

—জল গরম করেছি, বাথরুমে দিয়ে দেব?

—দে। আমি আসছি।

পায়ে পায়ে ঘরে এল শুভময়। সোয়েটার ছেড়ে বাথরুমে যেতে গিয়েও কী ভেবে থমকেছে। হনহনিয়ে এসে টেলিফোন তুলল। ডায়াল করছে লেকটাউনের নম্বর।

—হ্যালো মেজবউদি, মেজদা আছে?

—ওমা শুভ যে! কী খবর তোমার? কেমন আছ?

—আছি। বাবার শরীর কেমন?

—যথা পূর্বং, তথা পরং। যখন তখন মেজাজ, বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি ...

—কী করবে বলো, দ্বিতীয় শৈশব। ... মেজদাকে একটু ডেকে দেবে?

—ধরো। দেখি তিনি আবার কোথায় আছেন।

বড় জোর মিনিট দুয়েকের অপেক্ষা, শুভময়ের মনে হচ্ছিল সহস্র বছর। তেজোময়ের গলা গমগম বেজে উঠতে হাঁপ ছাড়ল। স্নায়ু সংযত রেখে বলল,—তোর সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার ছিল রে মেজদা।

—কী রে?

—আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পারবি? একটু বেশি অ্যামাউন্ট।

—কত?

—এই ধর, লাখ তিনেক। দু'-আড়াই হলেও চলবে।

—বলিস কী রে? কী করবি অত টাকা দিয়ে?

—না জানালে দিবি না?

—তাই বললাম নাকি? ভাবছি তোর কী এমন প্রয়োজন পড়ল ...! চিন্তায় ফেলে দিলি। ঝোঁকের মাথায় গাড়ি কিনে বসলাম, আমার হাত তো এখন একেবারেই খালি।

—কোথাও থেকে লোনের ব্যবস্থা করা যায় না? চার-পাঁচ বছরের টার্মে?

—সেরকম তো ... কেউ আমার ... ঠিক চেনা নেই ...। একমাত্র ব্যাংক ট্যাংক ... তা সেখানেও তো স্পেসিফিক কারণ দেখাতে হবে। কোনও একটা অ্যাসেট ফ্যাসেট কিনছিস ... গাড়ি, কিংবা বাড়ি ...

—না না, ওসব নয়। আমার কারণটা অন্য।

—আশ্চর্য, আর কী কারণে মানুষের অত টাকা লাগে?

শুভময় শ্বাস চাপল। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ করে বলল, —পিওরলি পারসোনাল রে মেজদা। তুই তা হলে পারছিস না, তাই তো?

—সম্ভবপর হলে তোকে কি না বলি? আমাদের মধ্যে কি সেই সম্পর্ক? ... টেনেটুনে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত অ্যারেঞ্জ করতে পারি। তার বেশি তো এই মুহূর্তে ...

—বড়দাকে বলব? পারবে কি বড়দা?

—একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস। তবে ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, নেগেটিভটাই ধরে রাখ। ... তুই এক কাজ কর। কলকাতায় চলে আয়। দেখছি এদিক ওদিক করে যদি আমরা হাজার পঞ্চাশও তুলে দিতে পারি ...

তিন লাখের প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজারে মেটে? শুভময়ের হাসি পেয়ে গেল। এতে তো ঋতির সেলামির জলও গরম হবে না।

নাহ্, অন্য কিছু একটা ভাবতে হবে। অন্য কোনও পন্থা।

আট

কোথায় যেন একটা সুরেলা ধ্বনি বাজছে। মৃদু থেকে ক্রমশ উচ্চগ্রামে চড়ছে সুর। রান্নাঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন স্মৃতি। প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারেননি শব্দের উৎসটাকে, পরক্ষণে খেয়াল হয়েছে। ঋতির মোবাইল না?

হাত মুছতে মুছতে স্মৃতি মেয়ের ঘরে এলেন। এদিক ওদিকে খুঁজছেন পুঁচকে টেলিফোনটাকে। ঝাপসা ঝাপসা চোখে দেখতেও পেয়ে গেলেন। যা ভেবেছেন তাই, মোবাইল গড়াগড়ি খাচ্ছে বিছানায়।

সম্প্রতি মোবাইলে কথা বলা শিখেছেন স্মৃতি। ইচ্ছে ছিল না, মেয়েই আহ্লাদিপনা করে বোঝাল কায়দাকানুন। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপলেন ঠিকঠাক। কানে চেপেছেন, —হ্যালো?

—কী গো, এতক্ষণ লাগে ফোন ধরতে? আমি যে তোমায় ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি ঋতি।

শুভময় তো নয়! বিষম খেতে গিয়েও স্মৃতি সামলে নিলেন। কে রে বাবা? ঋতির সঙ্গে এই ঢঙে কথা বলে?

আবার স্বর ভেসে এল, —এই ঋতি, আমার বসন্তঋতু ...? সাড়া দাও না কেন? চোখে না দেখতে পাই, অন্তত গলাটা একটু শুনি।

স্মৃতির কান গরম হয়ে উঠছিল। চুপ থাকতে পারলেন না, গোমড়া গলায় বললেন, —আমি ঋতি নই। ঋতির মা।

—ও, মাসিমা? সরি সরি সরি। একটু থেমে রইল গলাটা, তারপর জিজ্ঞেস করল, —ঋতি কোথায়?

—স্নানে গেছে। তুমি কে?

—আমি সোমদত্ত। ... আমি আবার পরে ফোন করব।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্মৃতি। সোমদত্তর সঙ্গে এইরকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ঋতির? আশ্চর্য, ছেলেটাকে দেখে তো বোঝা যায় না? ঋতির আর পাঁচটা বন্ধুর মতোই আসে, গল্পগাছা

করে ... আলাদা কিছু স্মৃতি তো লক্ষ করেননি! তলে তলে ঋতি এইসব চালাচ্ছে নাকি? উঁহু, এ তো ভাল কথা নয়!

মুড়িঘণ্ট বসানো আছে গ্যাসে। মঙ্গলা আজ বাজার থেকে কাতলা মাছের মাথা এনেছিল, সে ঠিক এই পদটা রাঁধতে পারে না, আঁশটে আঁশটে গন্ধ থেকে যায়, তাই স্মৃতিই করছিলেন নিজের হাতে। পাছে রান্নাটা ধরে যায়, স্মৃতি রান্নাঘরে এলেন তাড়াতাড়ি। খুন্তি নাড়ছেন, ভুরুতে ভাঁজ।

মঙ্গলা ব্যালকনি থেকে শুকনো কাপড় তুলছিল। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। নাক টেনে বলল, —বেশ বাস বেরিয়েছে তো গো মা!

—মশলা ঠিকমতো কষালেই বেরোয়। স্মৃতির চোখ পড়ল মঙ্গলার কাঁধে,— ধর্মের নামে কাপড়গুলো ফেলে রেখো না। দুপুরে টিভির সামনে পা ছড়িয়ে না বসে ইস্ত্রি কোরো।

—হাতের কাজ ফেলে আমি টিভি দেখি?

—তক্কো কোরো না। ছানি পড়েছে বলে কি কিছুই নজরে আসে না? ঠেলে ঠেলে না করালে কোন কাজটা তুমি নিজে থেকে করো বাছা? পোকামাকড় বাড়ছে বলে জলে একটু ফিনাইল মিশিয়ে নিতে বলি, তাও কি তোমার খেয়াল থাকে? ভেতরের ঝাঁঝটা মঙ্গলার ওপরই আছড়ে পড়ছে। তেতো স্বরে স্মৃতি বললেন, —গরম মশলাটুকু আন্দাজ করে মেশাতে পারবে?

মঙ্গলার মুখ হাঁড়ি, —না পারার কী আছে।

—তা হলে কাপড়চোপড়গুলো দয়া করে রেখে এসো। আমায় নিষ্কৃতি দাও। খাওয়া দাওয়ার আয়োজনটা করো।

ঋতির স্নান শেষ। বাথরুম থেকে বেরিয়ে জলকাচা নাইটি মেলছিল ব্যালকনিতে। সেখান থেকেই প্রশ্ন ছুড়ল, —মা, মোবাইলটা বাজছিল মনে হল?

স্মৃতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অতই যখন কান খাড়া, ছুটে এসে ধরলেই পারতে! গিলে নিলেন কথাটা। চটাচটি না করে মেয়ের ভাবগতিক আগে বোঝা দরকার। মা হিসেবে এটা তাঁর কর্তব্য। একটা কেলেঙ্কারি ঘটে গেলে শুভময়ের কাছে তিনি কী কৈফিয়ত দেবেন? দাঁড়াতে পারবেন জামাইয়ের সামনে?

শীতল গলায় স্মৃতি বললেন, —হ্যাঁ, তোর বন্ধুর ফোন ছিল। কী যেন নাম বলল?

—সোমদত্ত?

দেখেছ কাণ্ড! মেয়ে কি ওই নামই জপে সারাদিন? ঠোঁট বেঁকে গেল স্মৃতির, —হ্যাঁ। ওই ছেলেটাই।

—কী বলছিল?

স্মৃতি প্রায় বলে ফেলছিলেন, আমি তো তোমার মতো বেহায়া নই! মা হয়ে ওইসব কথা আমার জিভে আসবে না।

শ্লেষ ফুটল স্মৃতির গলায়, —সে আমায় আর কী বলবে! তোমাকেই চাইছিল। আবার তোমাকেই করবে ফোন।

মায়ের বক্র বাচনভঙ্গিটি ধরতেই পারল না ঋতি। ভেজা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেছে ঘরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফের মোবাইলে বাজনা।

স্মৃতি মেয়ের দরজার পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন এবার। পরদা আধখোলা, ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন মোবাইল কানে চেপে বিছানায় বসেছে ঋতি। কী ঝকঝক করছে মেয়ের চোখমুখ! হাসছে। হাসতে হাসতেই মোবাইল সহ গড়িয়ে পড়ল শয্যায়। কথা বলছে খুব নিচু স্বরে, একটি শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এত কেন গলা নামিয়ে কথা বলতে হয়, যদি না ...? দরজার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি পড়ছে মেয়ের, কিন্তু সে এখন এতই বাহ্যজ্ঞানরহিত, যে মাকে তার চোখেই পড়ে না! হা কপাল, মেয়ের কী হল?

—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন মা?

ঋতি নয়, মঙ্গলার প্রশ্ন। স্মৃতি সরে এলেন দরজা থেকে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, —তাতে তোর কী রে পোড়ারমুখি? তুই ভাত বাড় না।

—বেড়েছি তো। থালা সাজিয়েই তো পিতিক্ষে করছি।

শোনা মাত্র ঘুরলেন স্মৃতি। ঢুকে পড়েছেন মেয়ের ঘরে। কোমরে হাত রেখে বললেন, —শুধু রঙ্গালাপ করলেই চলবে? না এবার খেতে বসা হবে?

—অ্যাঁ? ফোনটা চাপল ঋতি, —কিছু বললে?

—ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাও। তোমার নয় ছুটির দিন, চারটের সময় খেতে বসলেও চলবে। আমি তো বুড়ো মানুষ, আমার তো খিদেতেষ্টা বলে কিছু বস্তু আছে।

—বসে যাও না তুমি। আমি আসছি।

—একটু তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করো। তুমি খেলে মঙ্গলা খাবে, বাসন টাসন মেজে সেও একটু জিরোবে ...

—বললাম তো আসছি। যাও না।

স্মৃতি ডাইনিং টেবিলে এসে বসলেন বটে, তবে খাচ্ছেন না, তাকাচ্ছেন ঘুরে

ঘুরে। ঋতি এল মিনিট দুয়েকের মধ্যেই। চেয়ার টানতে টানতে বলল, —তোমার জ্বালায় শান্তিতে কোনও দরকারি কথা বলারও জো নেই! এমন মাত মাত করে তাড়া লাগাবে ...।

বাঁকা চোখে মেয়েকে দেখে নিলেন স্মৃতি। দরকারি কথার কিছু নমুনা তিনি পেয়েছেন বই কী!

প্রজাতন্ত্র দিবস বলে স্পেশাল কোনও রান্নাবান্না হয়নি আজ। ডাল, মুলো পালঙের চচ্চড়ি, আর কাটাপোনার ঝোল। মুড়িঘণ্টটাই যা উপরি। মঙ্গলাকে আজ একটু পাঁঠার মাংস আনতে বলেছিলেন স্মৃতি, দোকানে লম্বা লাইন বলে মঙ্গলা আর সেদিকে ঘেঁসেনি। নিজে অবশ্য স্মৃতি পাঁঠার মাংস খান না, কোনও কালেই ভালবাসতেন না, বিধবা হওয়ার পর পরিত্যাগ করে বেঁচেছেন। মাছেও যে তাঁর খুব আসক্তি আছে তা নয়, তবে ছেলে, ছেলের বউ, আর মেয়ের উপরোধে ওটা ছাড়তে পারেননি। শাকসবজিই তাঁর বেশি প্রিয়। এখনও।

পালংশাক থেকে বড়ি বেছে স্মৃতি মুখে পুরলেন। আড়চোখে তাকিয়ে মেয়েকে বললেন, —সকালে তুই শুভকে ফোন করছিলি না?

—হুঁ।

—কী বলল শুভ? তোর টাকার জোগাড় হয়েছে?

—শুভ ছিল না। রতন বলল চুল কাটতে গেছে।

—তো আর একবার করলি না কেন? এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছে!

—কী বার বার ঘাড়ে চাপি বলো তো মা? ও বেচারা পারবে না। মাঝখান থেকে হয়তো টেনশান করে মরছে।

—তা হলে তোর নতুন বুটিক হবে না?

—দেখি। আরও তো এদিক ওদিক চেষ্টা চালাচ্ছি। এই তো, সোমদত্তর সঙ্গেও টাকা নিয়ে কথা হচ্ছিল। ওদের অফিসে একটা কো-অপারেটিভ আছে, সেখান থেকে কিছু তুলে দেবে বলছে। ভাবছি, যা হয় নিয়ে তো রাখি।

স্মৃতি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, —না না, কক্ষনও অমন কাজটি কোরো না।

—কেন?

—অন্য কারও কাছ থেকে কেন তুই টাকা নিবি? শুভ থাকতে?

—আরে বাবা, সে তো পারছে না।

—সেই জন্যই বলব, তোর নেওয়াটা আরও অনুচিত। এতে শুভকে অসম্মান করা হয়। তোর যখন যা দরকার সে তোকে দিচ্ছে, মাস গেলে তার কাছ থেকে থোক টাকা পাচ্ছিস ... না না ঋতি, উটকো কারও কাছ থেকে

তোমার টাকাপয়সা নেওয়াটা ঠিক নয়।

—আশ্চর্য, সোমদত্ত উটকো? সে আমার বন্ধু। বিপদ আপদে বন্ধুরা বন্ধুকে সাহায্য করে না? ঋতি মুড়িঘণ্টর কাঁটা চুষছে। থালার ওপর হাত উল্টে বলল, —এতে শুভর অপমানের কী আছে আমার মাথায় ঢুকছে না। ব্যবসা আমার, সুতরাং টাকা জোগাড় করার প্রাথমিক দায়িত্বও আমার। শুভকে বলেছি, সে তার মতো করে চেষ্টা করছে। কিন্তু তা বলে কি আমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব? আমার সোর্সগুলো আমি ট্যাপ করব না? ... আজ শুভ যদি ব্যবসা করত, আর আমি যদি তার চাকরি করা বউ হতাম, তখন শুভর টাকার প্রয়োজন পড়লে সে কি তার বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য চাইত না?

স্মৃতির মুখ দিয়ে এবার বেরিয়েই গেল, —মেয়েবন্ধুদের কাছে যেত কি?

—সিলি কমেন্ট কোরো না তো। ঋতি যেন ঈষৎ রুক্ষ হয়েছে, —বন্ধু ইজ বন্ধু। তার আবার ছেলে মেয়ে কী?

—কোনও তফাত নেই? এত জনের সঙ্গে তো তুই মিশিস, সবাই তোর চোখে সমান? ছুঁয়ে বল্।

—স্ট্রেঞ্জ! ছোঁয়াছুঁয়ি কী আছে? ঋতি খাওয়া থামাল, —মা প্লিজ, মুড নষ্ট করে দিও না। এমনিই আমার মনমেজাজ খারাপ হয়ে আছে ...।

—তবু আমি বলব, শুভর মনে তুমি দুঃখ দেবে না।

—তুমি থামবে? ঋতি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, —শুভর ব্যাপারটা তুমি আমাকে বুঝতে দাও। তোমাকে নাক গলাতে হবে না।

সেই পুরনো বাক্যি! এই নিয়ে বোধহয় এক হাজার এক বার শুনলেন স্মৃতি। পাল্টা অনেক কথাই মেয়েকে শোনানো যায়। আজ আমার ব্যবসা আমার ব্যবসা করে লাফাচ্ছিস, শুভময় পাশে না থাকলে পাড়ার বুটিকটাও কি তোর হত? কে তখন তোকে টাকা জুগিয়েছিল? তোর কোন সোমদত্ত? শুভর মতো ভরসার লোক আছে বলেই না কলকাতায় বসে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে যেমন খুশি জীবন কাটাতে পারিস তুই! আর মা কেন নাক গলায়, তার তুই কী বুঝবি? মা হওয়ার কত জ্বালা তা তো আর পুরোপুরি টের পেলি না!

চোখ ফেটে জল আসছিল স্মৃতির। মেয়ে খেয়ে উঠে গেছে, একা টেবিলে বসে আছেন চুপচাপ। ছোটবেলা থেকেই জেদটা বড় বেশি ঋতির। বাবা খুব আদর দিত, কোনও বায়নাতেই না বলত না, বুঝি বা সেই কারণেই জেদ আরও প্রশ্রয় পেয়েছে। ছটফটেও ছিল খুব। শুভময়কে দেখে একসময়ে স্মৃতির মনে হয়েছিল, ওই শান্ত গম্ভীর যুবকটি হয়তো আস্তে আস্তে স্থিত করতে পারবে

ঋতিকে। হয়তো বা হতও, কিন্তু ঈশ্বর বাদ সাধলেন। বাচ্চাটা মরে গিয়ে কেমন যেন ছিটগ্রস্ত, খ্যাপাটে হয়ে গেল মেয়ে। নাকি আর বাচ্চা হবে না, সেই দুঃস্বপ্ন ঋতিকে ...? শুভময়ই বা কেমন ধারার স্বামী? শোকাতাপা মেয়েটার মাথার ব্যামো হয়েছে ধরে নিয়ে তাকে তুই চিরতরে কলকাতায় ফেলে গেলি? কাছে রেখে কি বউয়ের চিকিৎসা করাতে পারতিস না? মায়া মমতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে ঋতি হয়তো এত বারমুখো হত না আজ! সোমদত্ত ছেলেটাকে স্মৃতি তো দেখেছেন, অমন একটা ফচকে ছোঁড়া ঋতির পাশে, শুভময়ের জায়গায় ... কল্পনা করলেই কেমন গা কিশকিশ করে ওঠে। অনেক বছর তো হল, ঋতি তো এখন ঠিকই আছে, এখনও কেন শুভময় বউকে ফেলে রেখেছে কলকাতায়? কেন ঘেঁটি ধরে নিয়ে যাচ্ছে না? বুক ফুলিয়ে বলতে পারে না, ওসব ব্যবসা ফ্যবসা ছাড়ো, তোমাকে আমার চাই? একসঙ্গে না থাকলে টান তো কমে আসবেই। এত ডাকসাইটে হাকিম সে, এই বোদা সত্যটুকু বোঝে না?

আঁচিয়ে উঠে মেয়ের ঘরে আর একবার উঁকি দিলেন স্মৃতি। শুয়ে পড়েছে। গায়ে পাতলা কম্বল, পাশবালিশখানা আঁকড়ে আছে ... সেই ছোট্ট ঋতির মতো। দেখে ভ্রম হয় শরীরটাই বেড়েছে, ঋতি এখনও বড় হয়নি। নইলে কি এই বয়সে ওসব ছেলেমানুষিতে জড়িয়ে পড়ে!

স্মৃতি ঘরে ফিরলেন। সিংগলবেড খাট, বেঁটে আলমারি, আলনা, আয়না, ঠাকুরের সিংহাসন, জলচৌকি আর দু'খানা খোপ-অলা সাইডটেবিল শোভিত ছোট কামরা। বিছানায় বসলেন স্মৃতি। ইদানীং হজমের গোলমাল হচ্ছে বলে দু'বেলা ওষুধ খাচ্ছেন নিয়মিত। সাইডটেবিলে ওষুধের শিশি, মাপ করে তরল ঢাললেন কাপে, গলাধঃকরণ করে জল খেলেন। মশলাও মুখে পুরলেন সামান্য। জোয়ান লেবু বিটনুনের সুস্বাদু মিশ্রণ, ঘরেই বানানো। চিবোচ্ছেন। শোবেন কি? বালিশে মাথা রেখেও উঠে পড়লেন। থাক, শীতের বেলায় ঘুমিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই, গা ম্যাজম্যাজ করবে সারা সন্ধে। বসার জায়গায় এসে চালালেন টিভিটা। দুর ছাই, সিরিয়াল টিরিয়ালগুলো গেল কোথায়, সর্বত্রই তো শুধু দেশভক্তির সিনেমা! টিভির কণ্ঠ পেয়ে মঙ্গলার বাসন মাজা বন্ধ, ডিঙি মেরে মেরে দেখছে রান্নাঘরের দরজা থেকে। তারও দেশপ্রেম কম, মুখ ভেটকে সরে গেল।

স্মৃতিও সুস্থির হয়ে বসতে পারলেন না। ঘরে এসে উল কাঁটা নিয়েছেন হাতে। গত বছর নাতিকে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিলেন, এ বছর নাতনির

পালা। দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে এসেছে, কিছুক্ষণ কাঁটা চালালে আঙুলে ঝিঁ ঝিঁ ধরে, তবু মোটামুটি শেষ করে এনেছেন। বুক পিঠ হাত সব রেডি, টুকটুক করে জোড়াও লাগিয়ে ফেলেছেন, এবার ঘর তুলে কলারটুকু বুনে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। শীত তো প্রায় ফুরিয়ে এল, এখনই না দিয়ে দিলে কবে আর পরবে চুমকি!

পশ্চিমের ব্যালকনিতে একটা বেতের চেয়ার রাখা থাকে বছরভর। দুপুরের পর থেকে ওই অলিন্দে হানা দেয় সূর্য। শীতে বিছিয়ে থাকে নরম রোদ। মায়াবী। সোনালি। চেয়ারে হেলান দিয়ে কাঁটা ধরেছেন স্মৃতি। চুমকির মুখটা মনে পড়ল এক ঝলক। এই সেদিন জন্মাল, দেখতে দেখতে এখনই দশ। ভারী মিষ্টি হয়েছে মেয়েটা, ঠাম্মাকে দেখলে কী খুশিই যে হয়! আহা রে, স্মৃতি যদি পাকাপাকি ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারতেন! মেয়ে যে কী নাগপাশে আটকে ফেলল, এখন বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর মুক্তি নেই। ছিঃ, এসব আবার কী ভাবনা! পেটের মেয়েকে তিনি ছাড়া আর কে আগলাবে এই শহরে? কিন্তু যা বেচালপনা শুরু করেছে ঋতি। নেশা-টেশার মতো বিচ্ছিরি ব্যাপারগুলো স্মৃতি অনেকটা সইয়ে নিয়েছেন, তা বলে ওই কমবয়সি ছেলেটার সঙ্গে মাখামাখি? বন্ধুবান্ধবরা মিলে বাড়ি করছ, কবিতা লিখছ, নাম হচ্ছে, স্মৃতির তো ভালই লাগে, কিন্তু এই সব কেন?

হঠাৎই আঙুল থেমেছে স্মৃতির। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন কী যেন। বেড়ালপায়ে ফের ড্রয়িংস্পেসে। টেলিফোন তুলে চেনা নম্বরটা ঘোরাচ্ছেন।

যাক, বাবলুই ধরেছে ফোন। স্মৃতি গলা ঝাড়লেন, —কী রে, শুয়েছিলি নাকি?

—এই ... একটু ...। বাবলুর গলায় ঘুম ঘুম ভাব, —কী হয়েছে, বলো?

—ভুটুন চুমকি কী করছে রে?

—এই তো ছিল ... কোথায় যেন গেল ... ডাকব ওদের?

—থাক। তোর সঙ্গেই কথা ছিল।

—কী?

—কাউকে বলবি না তো? বউমাকেও নয়।

—হয়েছেটা কী?

এদিক ওদিক তাকিয়ে স্মৃতি গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফেললেন, —ঋতির হাবভাব আমার ভাল লাগছে না রে।

—কী করেছে?

—ওই যে, একটা ছেলে আছে ... কবিতা লেখে ... ঋতির কাছে আসে ... ঋতির হাঁটুর বয়সি ... তার সঙ্গে মনে হচ্ছে ঋতির ...

—উম্। ... তো?

—আমার তো ঋতির সঙ্গে কথা বলতেই ভয় করে। যা মেজাজ। ... তুই এসে একটু বোনকে বোঝা না।

—দেখো মা, ঋতি আর কচি খুকিটি নেই। নয় নয় করে চল্লিশ হতে চলল। ওর ভালমন্দ ওকেই বুঝতে দাও।

—তারপর যদি কিছু একটা হয়ে যায়?

—হলে হবে। তুমি আমি কিছুই আটকাতে পারব না মা।

—শুভর কথাটাও তো একবার ভাববি।

—মা, একটু বাস্তববাদী হও। শুভময় আর ঋতি যে জীবনটা বেছে নিয়েছে, তার পরিণতি ওদেরই ফেস করতে দাও। ঋতি যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়, করবে। তোমার শুভরও তাতে খুব একটা কিছু যাবে আসবে বলে মনে হয় না।

ফোনটা রেখে একটা ভারী শ্বাস ফেললেন স্মৃতি। ছেলেও তাঁর উদ্বেগকে পাত্তা দেয় না। মা হওয়ার বড় জ্বালা। বড্ড জ্বালা।

শ্লথ পায়ে স্মৃতি ফিরলেন পশ্চিমের ব্যালকনিতে। সব কটা ঘর খুলে গেছে, আবার একটা একটা করে ঘর তুলছেন কাঁটায়। চোখ ঝাপসা হয়ে এল, আঙুল অবশ, তবু ঝুঁকে খুঁজছেন হারিয়ে যাওয়া ঘরগুলোকে।

বিকেল মরে আসছিল।

নয়

বারোটা থেকে একটা পঁচিশ, টানা প্রায় দেড় ঘণ্টা যুক্তিজাল বিছিয়ে গেল চন্দ্রচূড়। নাটুকে ঢঙে। একবার গলা ওঠায়, একবার নামায়, নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দেয়, কত যে তার কায়দা! আশিসতরুও চুপ থাকার পাত্র নয়, সেও মাঝে মাঝেই ফুট কাটছে, সঙ্গে সঙ্গে এমন দৃষ্টিবাণ হানছে চন্দ্রচূড়, যেন কোনও দুগ্ধপোষ্য শিশুর নির্বোধ বাচালপনায় সে স্তম্ভিত।

চন্দ্রচূড়ের অভিনয় দেখতে আজ ভালই ভিড় জমেছিল কোর্টে। সমবেত মানুষের নিশ্বাস আর ফিসফাসে যথেষ্ট গরম হয়ে উঠছিল ঘরের আবহাওয়া।

নিলয় আজ ছুটি নিয়েছে। আদালতের কার্যবিবরণী স্বহস্তে লিখছিল শুভময়। চাপা গুঞ্জন একটু উচ্চকিত হলেই সে খেই হারিয়ে ফেলছিল আজ। ধমকাধমকি করে, আবার ঘরে পিনপতন নৈঃশব্দ্য আনা, ফের গতি নিয়ে কলম চালানো, প্রতিমুহূর্তে মস্তিষ্ককে সজাগ রাখা— শুভময় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। চন্দ্রচূড়ের আরগুমেন্টস্ শেষ হওয়ার পর সে যখন এজলাস থেকে নামল, মাথা একেবারে থান ইট।

শুভময় চেম্বারে ফিরতেই ভবানী শশব্যস্ত। ডিশ বার করে ধুয়ে রেখেছিল, চটপট সাজিয়ে দিয়েছে টিফিন। রতনকে মানা করার পর আজকাল লুচি পরোটা আসা কমেছে বটে, কিন্তু রুটি সে প্রাণে ধরে দিতে পারে না। ভাজাভুজির বদলে এখন ফল আসছে রাশি রাশি। সঙ্গে রুটিমাখন, ডিমসেদ্ধ, সন্দেশ, অথবা এখানকার নিরেট রসগোল্লা। স্যারের যাতে ক্যালরির ঘাটতি না পড়ে সেদিকে রতনের প্রখর নজর।

আজ আহারে স্বাদ পাচ্ছিল না শুভময়। কলা দু'কামড় খেয়ে ফেলে দিল, আপেল ছুঁয়েও দেখল না, মাখন পাউরুটি আটকে যাচ্ছে গলায়। ডিমসেদ্ধটা শুধু খেল কোনও রকমে, এক টুকরো শসা মুখে পুরে সরিয়ে রাখল প্লেট।

ভবানী গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিল স্যারের ভোজনপর্ব। যেন এটাও তার ডিউটি। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, —স্যারের কি আজ শরীর ভাল নেই?

রুমালে ঠোঁট মুছতে মুছতে শুভময় বলল, —জিভে টেস্ট পাচ্ছি না।

—ভেতরে ভেতরে জ্বর নেই তো স্যার?

—না।

—এই সময়টায় একটু তেতো টেতো খেতে হয় স্যার। অসুখ বিসুখও আটকায়, মুখে রুচিও আসে।

শুভময় উত্তর দিল না।

ভবানী চুপ থাকার বান্দা নয়। আবার সে সোডার বোতলের গ্যাসের মতো বুড়বুড় করে উঠেছে, —নিমপাতা সবচেয়ে উপকারী স্যার। বেটে রস খাওয়া যায়, ভেজে খাওয়া যায়, নিমবেগুন তো অতি উপাদেয় ...। স্যার, বাংলোয় কি নিমপাতা ...?

—অত বড় একটা নিমগাছ আছে তোমার চোখে পড়ে না?

বকুনি খেয়ে চুপসে গেল ভবানী। চোখ পিটপিট করে দু'এক সেকেন্ড আন্দাজ করল স্যারের মেজাজটা।

মিনমিনে গলায় বলল, —তা হলে চা আনি স্যার? গরম চা খেলে হয়তো একটু আরাম ...

—জিজ্ঞেস করার কী আছে? রোজ রোজ বলতেই বা হবে কেন?

শুভময়ের স্বরের তীব্রতায় ভবানী এবার প্রায় ছিটকে গেছে ঘর থেকে। দোলদরজার অশান্ত আন্দোলন দু'-এক পল স্থির তাকিয়ে দেখল শুভময়। দু'আঙুলে কপাল টিপেছে। কাল থেকেই মেজাজ হারিয়ে ফেলছে বারবার। অকারণে। তুচ্ছ কারণে। বিকেলে কাল কিশলয় আর মিহির ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য ডাকতে এল, মুখের ওপর তাদের না বলে দিল। সকালে মাছের ঝোলে নুন কম বলে রতন দাবড়ানি খেল জোর। কোর্ট চলাকালীন মাঝবয়সি কনস্টেবলটা হঠাৎ ঢুলছিল, কী বিশ্রী ভাবে চেঁচিয়ে উঠল তার ওপর। আরগুমেন্টসের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক উদাহরণ টানার জন্য চন্দ্রচূড়কেও আজ রেয়াত করেনি। আর এখন প্রভুঅন্তপ্রাণ ভবানীকেও ...! কী হচ্ছে এসব? নিজে একটা টেনশানে পড়েছে বলে অন্যদেরও তার আঁচ সইতে হবে?

—আসব স্যার?

দোলদরজায় পরেশের মুখ। শুভময় সোজা হয়ে বসল।

মোলায়েম স্বরে পরেশ বলল, —একটু কাজ ছিল স্যার।

—আসুন।

পরেশ টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছে, —স্যার, শুক্কুরবার দুটো জাজমেন্ট আছে। কেসফাইলগুলো কি আপনি নিয়ে যাবেন?

—কী কী কেস বলুন তো?

—ওই যে স্যার, নবপুরের ফসল কাটা নিয়ে মারামারি। আর খড়ারে পাঁচিল ভেঙে দেওয়ার কেস। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝামেলা।

—ও হ্যাঁ। শুভময়ের মনে পড়ে গেল। সহজ মামলা, তেমন কোনও আইনি জটিলতা নেই। মাথা দুলিয়ে শুভময় বলল, —আজ তো সবে সোমবার ... এখন থাক। আজ আর কী কী মামলা আছে?

—বেশি কিছু নেই স্যার। দুটো পাল্লা-বাটখারার কেস, একটা আবগারি দপ্তরের, আর পুলিশ প্রোডাকশান। ও হ্যাঁ, একটা কোল্ডস্টোরেজে হামলার কেসও আছে।

—ঠিক আছে। ... আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি এজলাস ছাড়ব। অফিসের কিছু কাজ জমে আছে।

—আচ্ছা স্যার।

পরেশ হেলেদুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পিছন থেকে আচমকাই ডেকে ফেলল শুভময়, —পরেশবাবু ...?

—আজ্ঞে স্যার?

—আপনি কি একটা উপকার ...। বলতে গিয়ে আপনাআপনি গলা বুজে গেল শুভময়ের, —না, কিছু না। আপনি যান।

ধুরন্ধর পরেশ সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুমান করে ফেলেছে। ফিরে এল পায়ে পায়ে, —কী বলছিলেন স্যার?

ঝোঁকের মাথায় পরেশকে ডেকে ফেলেই শুভময় সচকিত। ছি ছি, এ কী মতিভ্রম হল তার! শেষে পরেশ জানার মতো একটা লোককে ...!

পরেশ ঝুঁকল টেবিলে, —কিছু দরকার হলে বলতে পারেন স্যার।

শুভময় নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিল। গলা ঝেড়ে বলল, —আমাকে একটা ইনফরমেশান দিতে পারেন?

—কী ব্যাপারে স্যার?

—আপনি তো টাউনের লোক, তাই বলছি। এখানে কোনও অফিশিয়াল মানিলেন্ডার আছে?

—মানিলেন্ডার? পরেশ চমকে গেল,—কেন স্যার?

—একটু দরকার ছিল।

—আছে স্যার। জনা তিনচার। চাষের জন্য অনেকের ধার-টার লাগে তো।

—কী রকম ইন্টারেস্ট পড়ে?

—সেটা স্যার পারসন টু পারসন ভ্যারি করে। লোক বুঝে। পরেশ মাথা চুলকোল,—অফিশিয়ালি তো ব্যাংক রেটের থেকে বেশি নেওয়া যায় না, তবে ওরা মাসে তিন পারসেন্ট, চার পারসেন্ট, পাঁচ পাবসেন্ট, সব রকমই নিয়ে থাকে।

অর্থাৎ প্রতি লক্ষ টাকায় মাসে তিন থেকে পাঁচ হাজার সুদ। যদি শুভময় দু' লাখও ধার করে, মাসিক সুদ গিয়ে দাঁড়াবে আট-দশ হাজার। এর পর প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে যদি লাখ খানেক তোলে, সেখানেও মাসে মাসে কাটাতে হবে প্রায় হাজার তিনেক। শুভময়ের মাইনে এখন পঁচিশ হাজার ছুঁই ছুঁই, তবে কেটেকুটে হাতে পায় আঠারো-উনিশ। হাজার বারো চলে গেলে পড়ে থাকবে সাত-আট মতন। তার থেকে ঋতিকেই বা কী দেবে, নিজেরই বা কী করে চলবে!

শুভময়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, —এত সুদ নেয় কেন?

পরেশ বুঝি ঠিক ধরতে পারছে না শুভময়ের উদ্দেশ্য। ধন্দ মাখা মুখে বলল, —লোকে ঠেকায় পড়ে ধার করে তো, তাই ঝোপ বুঝে কোপ মারে আর কি!

—ভেরি ব্যাড। ঘোরতর অন্যায়। মানুষের বিপদের সুযোগ নিয়ে...।

—ন্যায় অন্যায় নিয়ে কে আর আজকাল মাথা ঘামায় স্যার! পরেশ চোরা চোখে শুভময়কে দেখে নিল,—তো আপনি যদি বলেন, ওদের ডেকে এনে একটু কড়কে দিতে পারি।

—থাক। প্রয়োজন নেই। জাস্ট মনে হল, তাই বললাম।... গ্যারান্টি কী রাখে?

—এ তো স্যার সব মুখের কথার ব্যবসা। হুন্ডি টুন্ডিতে সই করায় বটে, তবে ওসব কিছু নয়। ওখানে দেড় পারসেন্টই লেখা থাকে, বাকিটা অলিখিত চুক্তি। তা বলে ওদের ফাঁকি দেওয়ারও কোনও উপায় নেই। ঘাড় মটকে টাকা আদায় করে স্যার। এই করে করে কত লোকের জমিবাড়ি যে ওদের গর্ভে চলে গেল!

—ও। পরেশের চোখে চোখ রাখল শুভময়, —তা আপনারও তো শুনেছি তেজারতি ব্যবসা আছে?

—আমার? পরেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। মাথা ঝাঁকাচ্ছে জোরে জোরে, —না স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার। আমি মাসমাইনের চাকর, কোনওক্রমে দিন গুজরান করি, আমার অত টাকা কোথায়?

—কিন্তু আমার কাছে তো অন্য খবর আছে।

—কে এসব বলে স্যার? সব শয়তান লোকেদের রটনা। বিশ্বাস করুন স্যার, আমার কোথাও কোনও কারবার টারবার নেই। মা কালীর দিব্যি।

ভবানী এসে গেল। শুভময়কে চা দিয়ে ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে ভবানী। শুভময় কথা থামিয়ে দিল। ভবানীর সামনে এসব আলোচনা সঙ্গত নয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পেশকারের কাছে টাকাপয়সা সংক্রান্ত খোঁজখবর নিচ্ছে, এসব সংবাদ কীভাবে পল্লবিত হয় তার ঠিক কী! ভবানীকে কি একটু বাইরে যেতে বলবে শুভময়?

আশ্চর্য, টাকা ধার নেওয়া এমন কিছু ভয়ংকর অপরাধ নয়, অনৈতিকও বলা যায় না, শুভময় তা ভালমতোই জানে। সুদে আসলে শোধ করবে টাকা, এতে দোষেরই বা কী আছে? ধারধোর করার ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে কিছু বিধিনিষেধ আছে ঠিকই, তবে তেমন জরুরি প্রয়োজনে ঝটপট ঋণপর্ব সেরে

সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে অবহিত করে দিলেও তো চলে। তাও কেন এত সংকোচ? উচ্চাসন থেকে নিজেকে নামিয়ে ফেলতে হচ্ছে, তাই? কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে পরেশের কাছে খোঁজখবর নেওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এই প্রায় অচেনা শহরে আর কাকেই বা সে বলতে পারে? সহকর্মী ম্যাজিস্ট্রেটরা নিশ্চয়ই তাকে পেশাদার মহাজনের সন্ধান দিতে পারবে না! কিংবা রতন টতন ...? পারলে তো একমাত্র তার পেশকারই ...! এতে কি তার পদের অপব্যবহার হয়? কোনও গর্হিত কাজ করছে কি সে? তবে কেন এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব?

শুভময়কে বিস্মিত করে ভবানী নিজেই বেরিয়ে গেছে সহসা। পরেশ কি ইশারা করল কোনও? শুভময় বুঝতে পারল না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে পরেশের গলা শুনতে পেল শুভময়, —একটা প্রশ্ন করব স্যার?

—কী?

—টাকাটা কার চাই স্যার?

—আছে কেউ একজন। শুভময় মুখটা হাসি হাসি করতে গিয়েও পারল না, —ধরুন যদি আমিই নিই?

পরেশের চোখের মণি পলকের জন্য কেঁপে উঠল যেন। পরক্ষণে দৃষ্টি সতর্ক। গলা নামিয়ে বলল, —যদি কিছু না মনে করেন ... একটা কথা বলব?

—হ্যাঁ, বলুন না।

—খাতক যদি আপনি হন ... মানে যদি হন আর কি ... পেশাদার ঋণদাতারা কিন্তু আপনাকে টাকা দেবে না।

—কেন? শুভময় ফ্যাকাশে হাসল, —আমার কি শোধ করার ক্ষমতা নেই?

—সে প্রশ্ন আসছেই না স্যার। পরেশের স্বর আরও নেমেছে, —যারা এসব কারবার করে, তারা তো আপনার থেকে বেশি সুদ নিতে পারবে না। ভয় পাবে। আপনি রাজি থাকলেও তারা ভাববে আপনি ফাঁদ পাতছেন।

তার মানে পরেশও এই আতঙ্কেই নিজের সাইড ব্যবসাটা অস্বীকার করছে? শুভময় মৃদু মাথা দোলাল, —তা হলে আর কী, বাদ দিন।

—তবু যদি বলেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি। কোর্ট শেষ হলেই গিয়ে কথা বলছি। ... কত টাকা দরকার স্যার?

—ছিল। লাখ দুয়েকের মতো। ছেড়ে দিন। ... আপনি আসুন, আমি এবার তৈরি হই।

যেন কিঞ্চিৎ নার্ভাস মুখেই চলে গেল পরেশ। সম্ভবত ভাবল, স্যার তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। স্যার তাকে বাজিয়ে দেখল, এরকমও মনে করল কি? একটা মলিন হাসি ফুটল শুভময়ের মুখে। দুর দুর, ওসব আগডুম বাগডুম প্ল্যান ভেঁজে লাভ নেই। ব্যাংকে বত্রিশ হাজার মতো পড়ে আছে, আজই বিকেলে পি এফ লোনের দরখাস্ত জমা করে দেবে, তারপর দেখা যাক কী হয়! চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না সে, তা হলেই তো হল।

এজলাসে দ্বিতীয়ার্ধটা গতানুগতিক ভাবেই কাটল শুভময়ের। অফিসের কাজকর্ম সেরে বেরল প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। দিন বড় হচ্ছে, আকাশে তখনও শেষ বিকেলের রেশ।

কোর্টের গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসেছে, বিপ্লবের সঙ্গে দেখা। বিপ্লব হইহই করে উঠল, —তোমার ব্যাপারখানা কী বল তো? এত আন্‌সোশাল হয়ে যাচ্ছ কেন?

শুভময়ের টেনশান এখন অনেকটা কম যেন। খোলামেলা ভাবেই হাসল, —তাও ভাল, অ্যান্টিসোশাল বলনি।

—এবার থেকে তাই-ই বলব। কাল কিশলয়দের হাঁকিয়ে দিলে যে বড়? জান, কাল আমার গিন্নি একটা মিনি পার্টির আয়োজন করেছিল! তুমি যাওনি বলে খুব চটে গেছে।

—এ হে হে, ভোজনের ব্যাপারটা তো জানতাম না! নতুন কী বানাল তোমার মিসেস?

—অফকোর্স কপির কোনও পদ নয়। কপি এখন গোরুও ছুঁচ্ছে না। পিঠে বানিয়েছিল। পুলিপিঠে, পাটিসাপটা ...। প্লাস চিকেনের কী একটা আইটেম... বিদঘুটে নাম।

—তা পাঠিয়ে দিল না কেন?

—তোমাকে আর কোনওদিন পাঠাবে না বলেছে। গেলে পাবে, নইলে নয়।... আরে ভাই, আমরা তো এই কটা মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট আছি। সকলেই বাড়ি থেকে আইসোলেটেড। তা ছাড়া আজ আছি, কাল নেই। সবাই মিলে একটু আড্ডা ফাড্ডা মারব, তোমার তাতেও অ্যালার্জি?

—না রে ভাই, কাল আমার একদম মুড ছিল না।

—কেন? কলকাতার খবর সব ভাল তো?

—চলছে একরকম।

—ও হ্যাঁ, যেটা তোমায় বলব ভাবছিলাম। এই উইকএন্ডে যাবে নাকি

কলকাতায়? পরশু থেকে বইমেলা শুরু, একবার তো অন্তত ঢুঁ মেরে আসতে হয়।

—আমার অত ভিড়ভাট্টা পোষায় না। তুমি ঘুরে এসো। পুরনো সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দেখা হবে, চাইলে লিটল ম্যাগাজিন স্টলে গিয়ে আগের মতো বসে থাকতেও পার ...

—না না, ওসব বসাবসি আর করি না। বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। এখন জাস্ট ঘুরে ঘুরে বই টই দেখব, কারও সঙ্গে মিট হল তো খানিক আড্ডা মারলাম, ব্যস্। কপালে থাকলে তোমার মিসেসের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে যেতে পারে।

—হ্যাঁ, ঋতি তো প্রায় রোজই যায়।

—এ বছর ঋতির কোনও বই বেরোচ্ছে মেলায়?

শুভময় ফাঁপরে পড়ে গেল। ঋতিকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, ঋতিও যেচে বলেনি কিছু। তবু আনতাবড়ি বলল, —কথা তো ছিল। জানি না শেষ পর্যন্ত কী হল। বলেই চকিতে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়েছে, —আচ্ছা, একটু আগে শুনছিলাম, টাউনে নাকি দুপুরে আজ গণ্ডগোল হয়েছে? তুমি কিছু জানো?

—গণ্ডগোল নয়, বার্ষিক ইভেন্ট। এখানকার কলেজের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ইলেকশন ছিল ... নির্বাচন মানে তো বোঝই। দু' দলে হাতাহাতি, মারামারি, বোম-টোমও নাকি পড়েছে।

—তাই? শুভময় হাসল, অ্যারেস্ট করে ধরে না আনলেই বাঁচি। তা হলে তো কাল যেই প্রোডিউস করবে, স্লোগানে স্লোগানে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

—মনে হয় না কোর্ট অব্দি গড়াবে। আজকাল পুলিশ আর ছাত্রদের হ্যাপা পোয়াতে চায় না। নিয়মমাফিক পাকড়াও করে থানায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। ... যাক গে, আজ কি আসছো?

—দেখি।

—তোমার তো আবার মুডের ব্যাপার। মুড ভাল থাকলে চলে এসো। ব্যাডমিন্টনের গোটা সিজনটাই তো প্রায় ডুব মেরে রইলে। তিনটে দিনও বোধহয় র‍্যাকেট হাতে নাওনি। আর তো বড় জোর হপ্তাখানেক হবে খেলা।

—যাব যাব। হয়তো আজই...

আরদালি বেয়ারা সমভিব্যাহারে বাংলোর পথে হাঁটা দিল শুভময়। পৌঁছে দেখল রতনের বাপ বনমালী এসেছে। ধরাচুড়ো ছাড়তে না ছাড়তেই সে গুটিগুটি সামনে হাজির।

ঠান্ডা আজ কম। তবু একটা শাল জড়িয়ে সোফায় বসে ছিল শুভময়। চোখ

তুলে বলল, —কী, ছেলের বিয়ের দিন পাকা হল?

বছর পঁয়তাল্লিশের বনমালীর ঘাড় ঝুলে গেল, —আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। পনেরোই ফাল্গুন দিন ধার্য হয়েছে। আর সতেরোই বউভাত। ওইদিন আপনি যদি একটু অনুগ্রহ করে পায়ের ধুলো দ্যান...

—সে দেখা যাবেখন।

—যেতে কোনও অসুবিধে নেই স্যার। ইড়্পালার বাসে চেপে জামতলার মোড়ে নামবেন। সেখানে রিকশা, ভ্যানরিকশা সব থাকে। চড়ে শুধু বলবেন, নালুয়া যাব, তা হলেই...। সব কটা রিকশা, ভ্যান আমার বাড়ি চেনে স্যার। একবার বনমালী নামটা বললেই হবে।

খুবই স্বাভাবিক। বনমালী নিজেও ওই লাইনে ভ্যানরিকশা চালায়। তবে তার নামডাক হওয়ার কারণটি অন্য। ওই তল্লাটে বনমালীর তুল্য মাতাল আর দ্বিতীয়টি নেই। ভবানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত সমাচার। বনমালীর সন্তানসংখ্যা চার। পর পর তিন ছেলে, শেষেরটি মেয়ে। জ্যেষ্ঠপুত্র রতনকুমারকে সে বছর ছয়েক আগে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় চালান করেছিল, অন্য দুটিকেও নাকি লাগিয়েছে কোথায় কোথায়। তিন পুত্রের রোজগারে তার সংসার চলে, নিজের উপার্জন শুঁড়িখানায় যায়।

বনমালী হাত কচলাতে কচলাতে বলল, —আমার গোটা কয়েক নিবেদন ছিল স্যার।

শুভময় ভাল করে বনমালীর চোখ দুটো পরখ করে নিল। নাহ্, লাল নেই। গন্ধও বেরোচ্ছে না। অর্থাৎ এখন সে প্রকৃতিস্থই আছে। সোফায় হেলান দিয়ে শুভময় বলল, —পেশ করো তোমার আর্জি।

—রতনকে বিয়ের দিনকতক আগে ছেড়ে দিতে হবে স্যার। ওর মা বলছিল বাড়িতে কী সব আচার অনুষ্ঠান হবে।

—আমার তো বলাই আছে, লোক দিয়ে রতন চলে যাবে।

—তারপর ধরুন স্যার, কটা পয়সাই বা আয় হয়...ছেলের বাড়ি হলেও খরচ-খরচা তো আছে...

—কত টাকা পণ নিচ্ছ?

—আমরা পণ নিই না স্যার। আমাদের পরিবারে ওই রীতি নাই। গয়নাগাটি, বাসনকোসন, ছেলের একখানা সাইকেল, ঘড়ি, আংটি, এটুকুই শুধু চেয়ে নিয়েছি। আর আমার জন্য একখানা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো। নগদ নিলে আমার হাতে কুড়িকুষ্ঠি হবে স্যার।

বনমালী মিথ্যেটাও বেশ গুছিয়ে বলে। তার মতো লোক ক্যাশ নেবে না, এ কি হতে পারে! বউভাতের খরচ আসবে কোত্থেকে? শুভময় মুচকি হেসে বলল, —বুঝলাম। এবার পয়েন্টে এসো।

—কিছু টাকা যদি দয়া করে দ্যান...

—কত?

—আজ্ঞে, ভাঙা টালিগুলো বদলাব...কুটুমবাড়ির সামনে একটা মানমর্যাদারও তো ব্যাপার আছে... যদি পাঁচ হাজার দ্যান...

অর্থাৎ বত্রিশ থেকে পাঁচ কমে সাতাশে দাঁড়াবে! বাঁদরের বাঁশ বেয়ে এই ওঠানামাই তো চলছে চিরকাল। তাও জমতে জমতে বছর তিনেক আগে একবার লাখ পেরিয়েছিল, ঋতির বুটিকের দৌলতে ভুস করে নেমে গেল তলানিতে। দু' জায়গায় দুটো সংসার চালানো যে কী দুঃসাধ্য কাজ। কসবার ফ্ল্যাটের ভাড়াই তো সাড়ে তিন হাজার। এ ছাড়া হুটহাট এক্সট্রা খরচা এসে পড়ে যখন তখন। এই তো, এ বছরও পুজোর আগে মাল তোলার জন্য পনেরো হাজার লাগল ঋতির। গত বছর রং করানো হল লেকটাউনের বাড়ি, শুভময় থাকুক চাই না থাকুক, তিন ভাগের এক ভাগ তো তাকে দিতেই হয়েছে। যাক গে, ওসব ভেবে আর কী হবে। রতন তার জন্য যা করে, বিয়ের সময়ে ওই টাকাটুকু তো তার প্রাপ্য।

শুভময় হাতে অভয়মুদ্রা করল, —বেশ। তাও হবে। নেক্সট?

—কী যেন আর একটা ছিল স্যার। বনমালীকে ভাবিত দেখাল, —মনে পড়ছে না।

—তা হলে স্মরণ করে আর একদিন এসো।

বিগলিত চিত্তে বিদায় নিল বনমালী। চা-জলখাবার সেরে শুভময়ও উঠল। কাল খুব অভদ্রর মতো ফিরিয়ে দিয়েছিল কিশলয়দের, ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণটুকুও জানায়নি, আজ একবার গিয়ে দোষ স্খালন করে আসা উচিত। তার ভাল লাগে না জেনেও কেন যে বার বার ডাকে ওরা? গিয়ে শুভময় করবেটা কী? ব্যাডমিন্টন তো উপলক্ষ, আসল উদ্দেশ্য তো গুলতানি। সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। কে কী ভাবে ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাচ্ছে, কবে নেক্সট ডি-এ বাড়বে, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে মহার্ঘভাতায় কত পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রাজ্য, কোথায় কোন জজ কী কুকীর্তি করল...। আর বউরা উপস্থিত থাকলে শিশুসুলভ কিছু রঙ্গরস। এর কোনওটাতেই যে শুভময় দড় নয়, প্রায় এক বছরেও কি কেউ টের পায়নি?

রওনা হওয়ার মুখে মুখে হঠাৎই বাধা। দরজায় করাঘাত। নিজেই ছিটকিনি খুলেছিল শুভময়, খুলেই হকচকিয়ে গেছে। চন্দ্রচূড় চৌধুরী!

চন্দ্রচূড় মিটিমিটি হাসছে, —অবাক করে দিলাম তো স্যার?

শুভময় পলকে বুঝে গেল। দুর্জয় সামন্তর মেয়ের মামলাটার আইনি লড়াই আজ সাঙ্গ হল, রায় বেরোবে দিন পনেরো পর। আজই নির্ঘাত জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটায় নিশ্চিত হতে চায় চন্দ্রচূড়।

চোয়াল শক্ত করে শুভময় বলল, —অবাক তো হওয়ারই কথা। আপনার তো কোনও ভাবেই আমার এখানে আসা উচিত নয়।

চন্দ্রচূড়ের মুখে তবু হাসি, —মানুষকে জীবনে কখনও কখনও অনুচিত কাজ করতে হয় স্যার।

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কোনও লইয়ারকেই আমি বাড়িতে এন্টারটেন করি না?

—বিলক্ষণ জানি। চন্দ্রচূড় নির্বিকার, —তা বলে অতিথি হয়ে এলেও তাকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না?

আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো! শুভময় বিরস স্বরে বলল, —আসুন।

চন্দ্রচূড় চটি ছেড়ে সোফায় এসে বসল। পরনে কোর্টের পোশাক নেই, ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি, গায়ে বহুমূল্য শাল। আলগা চোখ বোলাচ্ছে ঘরটায়। কপাল কুঁচকে বলল, —ইশ, বাংলোর দেওয়ালগুলোর কী হাল! গভর্নমেন্টের মেন্টেনেন্স বড্ড পুওর। সুন্দর জিনিস রক্ষা করার দিকে কোনও হুঁশই নেই! একটু রং-ও ফেরাতে পারে না?

শুভময় বসেছে মুখোমুখি। বিদ্রূপ হেনে বলল, —আপনি নিশ্চয়ই পি-ডব্লু-ডি-র নিন্দে করতে আসেননি?

—সত্যি কথা বলব? চন্দ্রচূড় আঙুল তুলল, —আমি আপনার নিন্দে করতে এসেছি।

কী বলতে চায় চন্দ্রচূড়? শুভময়ের চোখ সরু।

—আই মাস্ট সে, কাজটা আপনি ভাল করেননি স্যার।

—কী কাজ?

—বলছি। এক কাপ চা অন্তত খাওয়ান।

—সন্ধের পর আমার বাড়িতে আর চা হয় না।

—কফি টফিও না?

—এটা কোর্টরুম নয় চন্দ্রচূড়বাবু। প্লিজ, ড্রামা করবেন না। যা বলার চটপট বলুন। আমায় বেরোতে হবে।

—তা হলে সরাসরিই বলি স্যার। চন্দ্রচূড়ের হাসি নিবল, —লোনের জন্য পরেশ জানাকে অ্যাপ্রোচ করা কিন্তু আপনার শোভন হয়নি।

শুভময় হতভম্ব, —লোনের কথা আপনি জানলেন কী করে?

—সেই জন্যই তো বলছি। আপনি ভুল লোককে বলেছেন। পরেশ মজা পেয়েছে, রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। চন্দ্রচূড় একটু থেমে থেকে ফের বলল, —আমি কিন্তু খুব ক্ষুব্ধ হয়েছি স্যার। আপনি ঈশ্বরপ্রতিম মানুষ, আপনার সম্পর্কে কোনও ধরনের গসিপ. আমার খুব খারাপ লাগে। কেন আপনি পরেশকে ওই সুযোগটা করে দিলেন?

—কী বলেছে পরেশ?

—এমনি কিছু বলেনি, তবে রসিয়ে রসিয়ে গপ্পো করছে তো।... প্রয়োজনটা আপনি আমায় বলতে পারতেন, কাকপক্ষীও টের পেত না, টাকা আপনার কাছে পৌঁছে যেত। কত দরকার আপনার? এক লাখ? দু' লাখ? তিন লাখ? চন্দ্রচূড় চৌধুরী কি মরে গেছে? একজন বিপন্ন ভদ্রলোকের পাশে এসে কি দাঁড়াতাম না?

বিস্ময়ের প্রাথমিক অভিঘাত সইয়ে নিয়ে কঠিন হল শুভময়, —আপনার কথাগুলো কিন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে চন্দ্রচূড়বাবু। জানেন নিশ্চয়ই, এভাবে বাড়ি বয়ে এসে ঘুস অফার করার জন্য আমি আপনাকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে পারি।

চন্দ্রচূড় ঘাবড়াল না। স্মিত মুখে বলল, —আপনি আমার কথার ভুল অর্থ করছেন স্যার। যদিও আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তবু আমি আপনার বন্ধুই হতে চাই।

—কিন্তু আমি তো আপনার বন্ধুত্ব চাই না। শুভময় তির্যক সুরে বলল, —আমি বন্ধুকৃত্য করতেও অভ্যস্ত নই।

—আবার ভুল করছেন স্যার। বন্ধুত্বে কোনও শর্ত থাকে না। আপনার টাকার প্রয়োজন, মা ভবানীর কৃপায় আমার কিছু অর্থ আছে, চাইলে আপনি নিন। এমনি নয়, ধার হিসেবেই নিন। ব্যাঙ্ক থেকে নিলে যা সুদ দিতেন, আমাকেও তাই দেবেন। এবং আপনার সুবিধে মতন শোধও করবেন। বাজারের নোংরা লোকগুলোর কাছে চুল পর্যন্ত বিকিয়ে দেওয়ার বদলে আমার কাছে ন্যায্য রেটে নেবেন, এইটুকু যা তফাত।

—আশ্চর্য, আমাকে এত বোকা ভাবছেন কেন? শুভময় সিধে হল, —ঝোলা থেকে বেড়ালটা এবার বার করুন তো। আপনার সহৃদয়তার বিনিময়ে কী করতে হবে আমাকে? ফোর নাইনটি এইটের মামলায় ফেভারে রায় চান, তাই তো? অধীর মাইতি বুঝি আপনাকে ব্ল্যাংক চেক দিয়ে রেখেছে?

—এবার কিন্তু আপনি সত্যিই আমায় অপমান করছেন স্যার। বেশ তো, আপনি না হয় অধীর মাইতির এগেনস্টে রায় দিয়েই আমার কাছ থেকে লোন নেবেন।

—আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নেব ভাবছেন কী করে?

—তা ঠিক। সেটা অবশ্য আপনার ব্যাপার। চন্দ্রচূড়ের মুখে যেন ভাঙচুর হল একটু, —তবে বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কোনও অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে আসিনি। আপনার কোর্টে তো আমার কম কেস নেই। কোনওটায় জিতছি, কোনওটায় হারছি।

—ভবিষ্যতেও হারবেন।

—হারজিত তো আমার পেশারই অঙ্গ স্যার। ও নিয়ে আমার কোনও প্রেজুডিস নেই। লাস্ট মাসেই তো হাউস ট্রেসপাসের কেসটা আমার বিপক্ষে গেল। সেটাও কম ইম্পর্ট্যান্ট ছিল না। আপনি জেলও দিয়েছেন আমার ক্লায়েন্টকে। তখন কিন্তু আপনার কাছে কোনও অফার নিয়ে আসিনি। এসেছি কী?

—হতে পারে। তবে আপনার আজকের আগমনকে আমি মোটেই ভাল চোখে দেখছি না চন্দ্রচূড়বাবু। একটা সামান্য ছুতো পেয়েই আপনি যা করছেন...

—নাহ্, আপনাকে বোঝানো আমার কম্মো নয়। চন্দ্রচূড় এতক্ষণে যেন দৃশ্যতই হতাশ, —আপনার মতো মানুষের বিপন্নতায় কষ্ট পেয়েছি বলেই না...।

—বার বার বিপন্ন বিপন্ন করছেন কেন? শুভময়ও যথেষ্ট অধৈর্য, —কে বলেছে আমি বিপন্ন? আমার টাকার দরকার ছিল। এখন আর নেই। এবার আপনি যেতে পারেন।

চন্দ্রচূড় তবু বসে রইল দু'-চার সেকেন্ড। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, —জানতাম... জানতাম আপনি রিফিউজই করবেন।

—তারপরও এলেন কোনও সাহসে?

—আগেও তো বলেছি আপনাকে, আমি পেশার সঙ্গে মানবিক সম্পর্কগুলোকে গুলিয়ে ফেলি না। চন্দ্রচূড় বড় করে একটা শ্বাস ফেলল,

—যাক গে, একটাই রিকোয়েস্ট, পরেশ টরেশের চক্করে আর ভুলেও যাবেন না। প্লিজ। বয়সে বড় হওয়ার সুবাদে এটুকু পরামর্শ বোধহয় আমি আপনাকে দিতেই পারি। লোকটা ডিস-অনেস্ট। টোটালি নীতিহীন। রজতমুদ্রার দাস।

শেষ বাণীটুকু শুনিয়ে বেরিয়ে গেছে চন্দ্রচূড়। শুভময় বসে আছে নিশ্চল। গা চিড়বিড় করছে। জ্বলছে ব্রহ্মতালু। পরেশ জানাকে বলা ঠিক হয়েছে, না ভুল হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। চন্দ্রচূড়কে সে এতক্ষণ সহ্য করল কী করে? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল না কেন? নাকি তার মধ্যেও কোনও দোদুল্যমানতা ক্রিয়া করছে?

নাহ্, চাপটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। শুভময় স্থির করে ফেলল, আর সে টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। সহজ স্বাভাবিক পথে যেটুকু সে জোগাড় করতে পারবে, সেটুকুই দেবে ঋতিকে। তাতে ঋতির ব্যবসা হলে হবে, না হলে না হবে। শুভময় আর মোটেই মাথা ঘামাবে না।

দশ

...আলোময় এক সবুজ জঙ্গলে একা একা ঘুরছিল ঋতি। চারদিকে ডালপালা মেলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, তাদের ফাঁক দিয়ে তীব্র সূর্যকিরণ এসে পড়ছে মাটিতে। এত তেজ আলোর, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। ঋতি এগোচ্ছিল পায়ে পায়ে। যত সে এগোয়, ঘন হয় মহীরুহ, কমে আসে আলো। হঠাৎই গাছপালাগুলো ঝুঁকে পড়ে ঋতির পথ আটকাতে শুরু করেছে। দু'হাতে তাদের সরাতে চাইছে ঋতি, পারছে না। সহসা বৃক্ষরাজি উধাও, নীলচে অন্ধকারে প্রকট হল এক গুহা। ভেতরে একটা বাচ্চা খিলখিল হাসছে। কে ও? মুনিয়া না? কোত্থেকে যেন শুভময়ের গলা গমগম করে উঠল, আমি আছি ঋতি, চলে এসো। ঋতি দৌড়ে গুহাটায় ঢুকতে গেল। হা ঈশ্বর, কোথায় গুহা, এ যে শুভময়ের এখনকার বাংলো। গোল বারান্দায় কাঠের ইজিচেয়ারটায় বসে আছে মা! এখনকার মা নয়, ঋতির ছোটবেলার মা। পরনে ডুরে শাড়ি, হাতে শাঁখা, কপালে ছোট্ট টিপ। মা গান গাইছে দুলে দুলে। স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা...। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সুরটা। বাংলো থেকে বেরিয়ে আসছে শুভময়। আশ্চর্য, শুভময়ের গায়ে পাদরির জোব্বা! কোলে মুনিয়ার মৃতদেহ, সাদা কাপড়ে মোড়া। মুনিয়াকে নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে

চলে যাচ্ছে শুভময়। ঋতি চিৎকার করে শুভময়কে থামতে বলল। এক কণা শব্দ ফুটছে না গলায়...

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ঋতি। মাঘের সকালেও কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বুকের ঠিক মধ্যিখানে চিনচিনে যন্ত্রণা। মা গোঃ, এ কী দুঃস্বপ্ন? কেন যে এখনও ওই নিষ্ঠুর দৃশ্যটা তেড়ে আসে হঠাৎ হঠাৎ? শুভময়ের কোলে মুনিয়ার নিষ্প্রাণ দেহ, আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা!

মেয়েটাকে চিরকালের মতো মাটির বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছে শুভময়। আজ থেকে ঠিক ন'বছর আগে। এই দিনটাতে। প্রতি বছরের মতো দিনটা আবার ফিরে এল। আবার নতুন করে ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত করবে ঋতিকে।

বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না ঋতির। তবু নামল জোর করে। টলতে টলতে বাথরুম ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়। দিন ফুটে গেছে বহুক্ষণ। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে পৃথিবী, আকাশ ঝকঝকে নীল। চেনা পাড়া ভিজে আছে হলুদ রোদে। হাওয়া তেমন ঠান্ডা নেই আর। অনেকটাই নরম। স্নিগ্ধ। এলাকার ছেলেরা রাস্তায় গত বছর গাছ লাগিয়েছিল কয়েকটা, তরতরিয়ে বেড়ে ওঠা আকাশমণির পাতারা কাঁপছে তিরতির। বিপুল উদ্যমে বেরিয়ে পড়েছে রিকশা, ছুটছে উল্লাসে, হর্ন বাজছে ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো। থলি দোলাতে দোলাতে বাজারে বেরোল ওপরের ফ্ল্যাটের মোহনবাবু। নীচে গাড়ি ধুতে এসেছে শিবু, চেঁচিয়ে কী যেন বলল দুধঅলাকে, দু'জনে হেসে উঠল গলা ছেড়ে।

ঋতির কণ্ঠনালিতে জমাট ডেলা। কেন আজ দিনটা এত খুশি খুশি? আকাশ বাতাস পাড়াপ্রতিবেশী কেউ কি বুঝবে না ঋতির আজ মন ভাল নেই? দিনটা আজ মেঘলা হলে কী ক্ষতি ছিল? পাঁশুটে আকাশ, ঝমঝম বৃষ্টি ছাড়া কি মুনিয়ার মৃত্যুদিন মানায়?

ঋতি পরদা টেনে জানলা থেকে সরে এল। নিঝুম বসে আছে বিছানায়। দু' হাঁটুতে থুতনি রেখে, ভাঙাচোরা মূর্তির মতো।

কলিংবেল বাজছে জোরে জোরে। মঙ্গলা কাজে এল। মা খুলেছে দরজা, শব্দ পেল ঋতি। মঙ্গলার সঙ্গে মা কথা বলছে, ঋতি শুনতে পাচ্ছিল। না শুনে উপায়ও নেই। যা উচ্চগ্রামে আলাপ চালায় দু'জনে। কাল বুঝি কোন বাসনে এঁটো লেগে ছিল, তাই নিয়ে বকাবকি করছে মা, মঙ্গলাও নিজস্ব ঢঙে জবাব দিয়ে চলেছে। সক্কালবেলাই কি এসব না শুরু করলে নয়? অন্তত আজকের দিনটাতে?

বিরস মুখে খাট থেকে নামল ঋতি। সিগারেট আর লাইটার নিয়ে বাইরে এসেছে। তাকে দেখেই তিরস্কার থেমেছে স্মৃতির। অবাক চোখে বললেন, —ওমা, তুই উঠে পড়েছিস?

—কী করব! যা চেল্লাচ্ছ তোমরা!

—দ্যাখ না, এত করে বলি...

—মা প্লিজ...। সোফায় বসে দু' আঙুলে কপাল টিপল ঋতি, —মঙ্গলা, চা দাও।

স্মৃতির ভুরুতে ভাঁজ, —কী হয়েছে রে তোর? মাথা ধরেছে?

—হুম্।

—সেদিন বললাম আমার সঙ্গে তুইও চোখটা দেখিয়ে নে...

ঋতি উত্তর দিল না।

—অম্বলের মাথা ধরা নয় তো? তা হলে কিন্তু শুধু চা খাস না। সঙ্গে বিস্কুট নে।

সকালে চায়ের সঙ্গে ঋতি কিছুই খায় না। তবে এখন কোনও আপত্তি জানাল না। কথা বলার স্পৃহা নেই। টেবিলে খবরের কাগজটা পড়ে আছে, টানল। চোখ বোলাচ্ছে এলোমেলো।

খেয়ালি মেয়ের ঝুম হয়ে থাকা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামালেন না স্মৃতি। কেনই বা ভাববেন? ঘুম থেকে উঠে ঋতির এভাবে ঝিম মেরে থাকা তো অত্যাশ্চর্য কিছু নয়। আর নাতনির মৃত্যুদিনটা তো স্মৃতির স্মরণে থাকার কথাই নয়। কম সময় তো নয়, দেখতে দেখতে ন'টা বছর কেটে গেল। ঘটাপটা করে পালন করলে তাও নয় মনে থাকে, কিন্তু সেই শুরু থেকেই এমন নিঃসাড়ে চলে যায় দিনটা। স্মৃতির কাছে মুনিয়া এখন অনেকটাই আবছা। ধূসর হয়ে আসা এক ক্ষতচিহ্ন মাত্র।

মঙ্গলা চা দিয়েছে। স্মৃতি গেছেন নিজের ঘরে। চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল ঋতি। দিনের প্রথম সিগারেট। অন্য দিন প্রথম টানেই মাথা চনচন করে ওঠে, আজ কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না। দূরমনস্কভাবে টেলিফোন টানল কোলে। নম্বর টিপছে।

রিং বাজছে ওপ্রান্তে। বাজতে বাজতে থেমেও গেল ঝংকার। এখনও কি শুভময় মর্নিংওয়ার্ক থেকে ফেরেনি? রতনই বা গেল কোথায়?

বর্ষার মেঘের মতো বিষাদ চারিয়ে যাচ্ছে বুকে। শুভময়ের কি মনে আছে দিনটা? হয়তো আছে। হয়তো নেই। টের পেতে দেবে না শুভময়। ভুল করেও

শুভময় কখনও মুনিয়ার নাম উচ্চারণ করে না। কী ভাবে শুভময়? সে মুনিয়ার কথা না তুললে আস্তে আস্তে ঋতির মন থেকে মুছে যাবে মুনিয়া?

সিগারেট শেষ করে ফের গিয়ে ঋতি শুয়েছে বিছানায়। চোখ বুজতেই সামনে মুনিয়া। টালিগঞ্জের নার্সিংহোমে বেবিকটে হাত-পা ছুড়ছে। একটু একটু করে ঘাড় শক্ত হল। খলবল করতে করতে উপুড় হল হঠাৎ। পিছলে পিছলে ঘুরছে খাটে। উঠে বসল নিজে নিজে। হামা টানছে। দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে বার বার। টলোমলো পায়ে হাঁটছে। প্রতিটি ছবিই এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটে আছে ঋতির বুকে। ওফ্, কেন যে সে স্মৃতিহীন হল না!

আবার সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল ঋতি, কানের পাশে মোবাইলের সুরেলা ধ্বনি। বালিশের তলা থেকে যন্ত্রটা তুলে ঋতি নম্বর দেখল। অলকানন্দা।

লম্বা শ্বাস টানল ঋতি, —হ্যাঁ, বল্।

অলকানন্দার সতেজ রিনরিনে স্বর ধ্বনিত হল, —কী রে, শনি রোববার কোথায় ছিলি? গোটা বইমেলা চষেও তোর পাত্তা পেলাম না?

—লাস্ট দু' দিন যাইনি রে।

—সে কী? শনিবার তোর মঁমার্তে কবিতাপাঠ ছিল না?

অলকানন্দার সঙ্গে যথেষ্ট সখিত্ব আছে ঋতির। কিন্তু তাকেও কি বলা যায় এই ভয়ংকর দিনটা এগিয়ে এলে অদ্ভুত এক অবসাদ ছেয়ে ফেলে ঋতিকে! ভিড়, বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, হইহল্লা, কিছুই তখন সহ্য হয় না। কাউকে একটা উগরে দিতে পারলে হয়তো তার উপকারই হত, খানিক কেঁদেকেটে হালকা হত বুক। কিন্তু ঋতি তা পারে কই? শুভময়কেই কি কোনওদিন বলতে পারল?

আলগা ভাবে ঋতি বলল, —হয়ে উঠল না রে। মা'র চোখ নিয়ে একটা প্রবলেম যাচ্ছে... ডাক্তার ফাক্তার...

—কী হয়েছে মাসিমার?

—সিরিয়াস কিছু নয়। ক্যাটার‍্যাক্ট।

—কাটিয়ে নে।

—হুম্। ভাবছি এ মাসেই...। তোদের প্রোগ্রাম কেমন হল?

—মন্দ নয়। ... জানিস তো, রোববার তোর দুটো কবিতা আমি রিসাইট করেছি। জেগে থাকো আর, এবং নির্জনে।

অন্য সময় হলে ঋতি উৎফুল্ল হত, আজ তেমন প্রাণিত বোধ করল না। অল্প হেসে বলল, —থ্যাঙ্কস।

—ধন্যবাদের কী আছে। বন্ধুকে বন্ধু না প্রোমোট করলে কে করবে, অ্যাঁ? অলকানন্দার উচ্ছল স্বর এর পরই বদলে গেল, —অ্যাই, এসব কী শুনছি রে?

—কী?

—রেণু বলছিল আমাকে নাকি ঋদ্ধি থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে? দেবাশিস নাকি রটাচ্ছে আমি পুচকে ফ্ল্যাট নেব না?

ঋতি সিঁটিয়ে গেল সামান্য। বলল, —তুইই তো একদিন গল্প করছিলি বড় ফ্ল্যাট না হলে চলবে না, তাই শুনেই হয়তো...

—দেবাশিসের ঢ্যামনামো আমি জানি। ওই ছেনাল মেয়েটাকে ঢোকানোর ধান্দা! তোর তো দেবাশিসের সঙ্গে খুব দোস্তি, হারামিটাকে বলে দিস ফ্ল্যাট আমি ছাড়ছি না। থাকি, না থাকি, ও ফ্ল্যাট আমি রাখব। ওখানে আবৃত্তির ক্লাস নেব। মাগিটার জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে বল।

রেগে গেলে অলকানন্দার ভাষার মাত্রা থাকে না। আরও খানিকক্ষণ খিস্তি-খেউড় চলল একনাগাড়ে। ঋতির দুঃখী সকালটা আরও তেতো হয়ে যাচ্ছিল। অলকানন্দা ফোন রাখতেই মোবাইলের সুইচ অফ করে দিয়েছে। আর নয়, আজকের দিনটা সে বন্ধুবান্ধবদের ধরাছোঁওয়ার বাইরে থাকবে। ল্যান্ড লাইনের প্লাগটাও খুলে দেবে নাকি? থাক, মা যদি ফোনটোন করে।

দরজায় মঙ্গলা। ঋতি বেজার চোখে তাকাল, —কিছু বলবে?

—তোমাদের জল-খাবার কী হবে?

—আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? মাকে বল।

—উনি এখন জপে বসেছেন। মঙ্গলার গলায় বাঁকা সুর, —ডাকলে মুখ করবেন।

—তা হলে জপ শেষ হওয়া অব্দি অপেক্ষা করো।

—তোমার বেরনোর তাড়া নেই তো?

—কেন?

—তবে টাকা দাও, বাজারটা আগে সেরে আসি।

বাজারের টাকাও স্মৃতির কাছে থাকে। কী কী আনতে হবে তার নির্দেশও দেন তিনিই। আজ মঙ্গলার গোঁসা হয়েছে, তাঁকে বলবে না। ঋতি রুক্ষ হতে গিয়েও সামলে নিল। উঠে আলমারি খুলে ব্যাগ থেকে বার করে দিল টাকা। গত সপ্তাহে শুভময় ড্রাফট পাঠিয়েছে কুরিয়ারে। দশ হাজার টাকার। বড়দিনে এসেও সাত হাজার রেখে গেছিল ড্রয়ারে। এসব কাজে শুভময়ের কখনও ভুল হয় না। শুধু আসল ব্যাপারেই...

একটু অস্থির পায়ে ঋতি ফের ড্রয়িংস্পেসে এল। রিসিভার কানে নিয়ে টিপল রিডায়ালের বোতাম। রিং হচ্ছে আবার। সাড়াও মিলল ও প্রান্তের। তবে শুভময় নয়, রতন ধরেছে। ডেকে দিতে বলবে শুভময়কে? দোনামোনা করে ঋতি কেটেই দিল লাইন।

বাষ্প ঘন থেকে ঘনতর হচ্ছে হৃদয়ে। ঋতির সুপ্ত অভিমান ফের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, এই দিনটায় কক্ষনও ঋতিকে ফোন করে না শুভময়। ঋতি করলেও মুনিয়ার প্রসঙ্গ সচেতন ভাবে এড়িয়ে যায়, কথা বলে হাবিজাবি। ভান করে ভুলে গেছে মুনিয়াকে। হ্যাঁ ভান ভান। শুভময় মোটেই ভোলেনি। শুভময় কিছু ভোলে না। নইলে কি ঋতিকে দূরে দূরে থাকতে হয়?

শুভময়কে বিয়ে করাটাই কি ঋতির ভুল হয়েছিল? সে কি ভুল লোককে বেছেছিল? আজকাল মাঝে মাঝেই প্রশ্নটা খেপা কুকুরের মতো তাড়া করে ঋতিকে। শুভময়ের কোন বৈশিষ্ট্য টেনেছিল তাকে? চেহারা? ঢ্যাঙা রোগা শুভময়ের চেহারায় সত্যিই কি কোনও আকর্ষণ ছিল? নাকি শুভময়ের গুণ...? লাজুক, মিতভাষী, শান্ত শুভময়ের ঠিক কোন গুণটা বেঁধে ফেলেছিল ছটফটে ঋতিকে?

শুভময়ের সঙ্গে ঋতির আলাপ হয়েছিল ভারী অদ্ভুত ভাবে। তবে আদৌ সেটাকে আলাপ বলা যায় কি না সন্দেহ। লেকটাউনের মোড়ে একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনছিল শুভময়। ঋতি যাচ্ছিল কলেজের এক বান্ধবীর বাড়ি। পথনির্দেশ বেমালুম ভুলে গেছে, আবছা আবছা শুধু মনে আছে ঠিকানাটা। পথে অচেনা শুভময়কে জিজ্ঞেস করতেই সে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিল কীভাবে যেতে হয়। সোজা গিয়ে দুটো রাস্তা ছেড়ে তৃতীয় রাস্তা, তারপর বাঁয়ে ঘুরে...। তিন নম্বর রাস্তার মুখে এসে ঋতি বিভ্রান্ত। রাস্তা দু'দিকেই আছে. ছেলেটা কোন দিকে যেতে বলল? ডাইনে? না বাঁয়ে? আবার কাকে জিজ্ঞেস করা যায় ভেবে ইতিউতি তাকাতেই চোখে পড়ল, ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি এদিকেই স্থির। প্রায় দুশো গজ দূর থেকে ইশারা করল ছেলেটা, বাঁয়ে, বাঁয়ে। বাড়ি খুঁজে পেতে সেদিন আর অসুবিধে হয়নি। ঋতি ভেবেছিল ফেরার পথে যদি দেখা হয়, ছেলেটাকে একটা ধন্যবাদ দেবে। হয়নি দেখা। ছোট্ট ঘটনা, তবে ঋতির অবচেতনে তার একটা রেশ যেন রয়েই গেল।

এর পর শুভময়ের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ বেশ নাটকীয় ভাবে। ঋতির পিসতুতো দিদি বিয়ের পর আমেরিকা চলে যাচ্ছে, ঋতি গেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। শ্রাবণী অবশ্য নামেই দিদি, ঋতির চেয়ে মাত্র বছর খানেকের

বড়, আসলে সে প্রিয় বান্ধবী। শ্রাবণীর শ্বশুরবাড়িতে সেদিন কাকতালীয় ভাবে শুভময়ও উপস্থিত। শ্রাবণীর বব পুলকের নাকি বন্ধু সে।

ঋতি প্রথমটা চিনতে পারেনি শুভময়কে। প্রায় বছর খানেক আগে রাস্তায় ক্ষণিক দেখা তরুণের মুখ কে আর মনে রাখে! পুলক পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভময় কিন্তু প্রথম প্রশ্ন করেছিল, সেদিন বাড়িটা খুঁজে পেয়েছিলেন তো? শুধু তাই নয়, অবলীলায় বলে দিয়েছিল, ঋতি কী রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছিল সেদিন, দোপাট্টার রং-ই বা কী ছিল! শ্রাবণী পুলকের বিয়ে-বউভাতেও নাকি সে ঋতিকে দেখেছে আবার! বউভাতের দিন ডান পায়ের চটিতে কিছু সমস্যা হচ্ছিল ঋতির, অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছিল সে, তাও শুভময়ের নজর এড়ায়নি! শুনে শ্রাবণী আর পুলক তো রীতিমতো খেপাতে শুরু করে দিল, তোমাকে তো সাধুসন্ত টাইপ বলে জানতাম হে, তুমিও তা হলে মেয়ে দ্যাখো? শুভময় জড়তাহীন, আমার ফিলজফি তো খুব সিম্পল ভাই। যা দেখি, যতটুকু দেখি, আমি ভাল করেই দেখি। নইলে তাকাইও না।

একেই কি নিঃশব্দে প্রেমে পড়া বলে? ঋতি যত না চমকেছিল, তার চেয়ে বেশি আলোড়িত হয়েছিল সেদিন। তাকে চিনতে পেরেও বিয়ে বউভাতে যেচে এসে কথা বলল না, এ কেমন ছেলে? অথচ তার অগোচরে তাকে দেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে! এমন পুরুষও হয়? স্কুল কলেজ সবই ঋতির কো-এডুকেশনে, সেই ছোট্ট থেকে ছেলেদের সঙ্গে মিশছে সে, শুভময় যেন তাদের সবার চেয়ে আলাদা। একেবারে অন্যরকম। শুভময়ের সঙ্গে কথা বলেও সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল ঋতি। কেন যেন মনে হয়েছিল, শুভময়ের মধ্যে কোনও আদেখলেপনা নেই, ন্যাকামো নেই,...। মনে হয়েছিল, হয়তো বা এই পুরুষটার ওপর একান্ত ভাবে নির্ভর করতে পারে সে।

এর পর তো ঋতি নিজেই চলে গিয়েছিল শুভময়ের কাছে। আলিপুর কোর্টে। তারপর ক্রমে ক্রমে আলাপের ঘনত্ব বাড়া, বিয়ে, সব তো রুটিন মাফিক ঘটনা।

বিয়ের পর মোটামুটি ঠিকঠাকই চলছিল। ছোটখাটো ঠোকাঠুকি, শুভময়ের একগুঁয়ে আপোসহীনতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, কিংবা মতবিরোধ ছিল বটে, তা সত্ত্বেও ঋতির মনে হত সে ঠকেনি। কিন্তু জীবনের প্রথম গভীর সঙ্কটের মুহূর্তে পৌঁছে ঋতি কী দেখল? ঋতির তো এখন মনে হয় যার কাছে সে নির্ভরতা চেয়েছিল, সে মানুষ নয়, পাথর। তার বুকে মাথা ঠুকলে রক্ত বেরোয়, সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। কিংবা আদতে সে শামুক, নিজের বিপন্নতার আশঙ্কায় স্পর্শ করা

মাত্রই গুটিয়ে যায় খোলের ভেতর। খোলটা দুর্ভেদ্য, ইস্পাতের চেয়েও দৃঢ়।

ভয়ংকর সেই সময়টায় শুভময়ের কাছে কী চেয়েছিল ঋতি? একটু উত্তাপ। আর একটু বেশি সান্নিধ্য। শুভময় সেভাবে ঋতিকে তখন জড়িয়ে রইল কই? ঋতির কোন হতাশা যে রামপুরহাটে রাগ হয়ে আছড়ে পড়ত, শুভময় তা বুঝলই না। একবারও কি বলেছে, এসো ঋতি, আবার নতুন করে শুরু করি? চেষ্টা করি আমাদের মাঝের বেড়াটাকে উপড়ে ফেলার? বেড়া পাঁচিলে পরিণত হওয়ার আগেই? ঋতির সামান্য ছোঁয়ায় যে মানুষ কুঁকড়ে যায়, কেন ঋতি বাস করবে তার সঙ্গে? এত সে আইনের পণ্ডিত, বাস মানে যে সহবাস এই তুচ্ছ কথাটা কি সে জানে না?

পলকের জন্য দৃশ্যটা দুলে গেল ঋতির চোখে। দীর্ঘ শুভময় লম্বা পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, কোলে মুনিয়ার নিথর দেহ, আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা! শুধু মুনিয়া কেন, ঋতির সমস্ত নির্ভরতাকেও তো মাটির নীচে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল শুভময়। একমাত্র মুনিয়ার কারণেই যে শুভময়ের পাশ থেকে ঋতি সরে আসেনি, শুভময় কি তা অনুভব করতে পেরেছে কখনও? মাসে মাসে কিছু টাকা ধরে দেওয়াই কি সব? আরও কিছু কি ঋতি আশা করেনি?

স্মৃতি বেরিয়েছেন ঘর ছেড়ে। রান্নাঘরে যেতে গিয়েও থমকালেন, —কী রে, এখনও ওভাবে বসে আছিস? মাথা ধরা কমেনি?

ঋতির ঘাড় থেমে আসা পেন্ডুলামের মতো দুলল একটু।

—একটা ট্যাবলেট ফ্যাবলেট খেয়ে নে না।

—হুঁ। ঋতি সোফায় মাথা রাখল।

—জ্বরটর আসেনি তো? পায়ে পায়ে সামনে এলেন স্মৃতি। মেয়ের কপালে হাত রাখলেন, —নাহ্, গা তো ঠান্ডাই।

ঋতি মা'র হাতটা ধরল। নামিয়ে দিল কপাল থেকে হাত, তবে ছাড়ল না।

স্পর্শও কখনও কখনও বাঙ্ময়। স্মৃতি স্থির চোখে দেখছেন মেয়েকে। চোখের ওপর পরদা পড়েছে তাঁর, হয়তো বা স্মৃতিতেও, তবু যেন আঁচ করতে পারলেন খানিকটা। কোমল গলায় বললেন, —যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আজ আর কোথাও বেরোতে হবে না। মঙ্গলাকে দিয়ে বুটিকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঋতি মনে মনে বলল, সেই ভাল। আজ সারা দিন একটু একা একাই থাকি।

একটা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল ঋতি। চোখ খুলল সন্ধে নামার পর। সকালে দুপুরে খায়নি, পেটে এখন চনচনে খিদে। মঙ্গলা চলে গেছে, স্মৃতি টোস্ট ওমলেট করে দিয়েছেন মেয়েকে, ঋতি খাচ্ছিল। ধীর লয়ে, বিছানায় বসে। পাকস্থলী হাঁ হাঁ করে খাবার চাইছে, কিন্তু জিভ বিরক্তির সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেন।

ফোন বাজছে। স্মৃতিই ধরেছেন ফোন। ডাকলেন মেয়েকে, —তোর বন্ধু। দেবাশিস। দুপুরেও করেছিল। কথা বলবি?

ঋতির ক্ষণিকের জন্য মনে হল না বলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অলকানন্দার কথাগুলো মনে পড়ে গেছে। আরও কিছু ঘোঁট পাকল নাকি? অলকানন্দা যা মেজাজি, সরাসরি দেবাশিসকেই গালাগাল দেয়নি তো? প্রত্যক্ষই হোক, অপ্রত্যক্ষই হোক, অলকানন্দা আর দেবাশিসের কোঁদলে ঋতির তো একটা দায় আছেই। কেন যে দেবাশিস পরের মিটিং পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে পারল না?

ঋতি বিস্বাদ মুখে বলল, —ধরতে বলো। আসছি।

প্লেট ডাইনিং টেবিলে রেখে এসে ঋতি রিসিভার কানে চাপল, —হ্যালো?

—কীরে, কী হল তোর? সারা দিন ঘুমোচ্ছিস কেন?

—এমনিই।

—মাসিমা বললেন তোর শরীর খারাপ?

—এই একটু গা ম্যাজম্যাজ...

—ঠান্ডা লেগেছে তো? বইমেলায় আরও স্টাইল মেরে ঘোরো, গরম জামা ছাড়া! সেদিন আমি টুপি পরেছিলাম বলে তো খুব আওয়াজ মেরেছিলি!

ঋতি হাসল না। কেজো গলায় বলল, —দুপুরেও ফোন করেছিলি শুনলাম?

—হ্যাঁ। মোবাইলকেও তো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিস, তাই ল্যান্ডলাইনে...। বেচারা মাসিমা বোধহয় তখন শুয়ে ছিলেন, ডিস্টার্ব করলাম।

—কাজের কথা বল।

—বলবি তো তুই। আমাকে এরকম ফলস পজিশানে ফেলে দিচ্ছিস কেন?

ঋতি অস্ফুটে বলল, —আমি কী করলাম?

—তুই নিজেও ঝুলছিস। আমাকেও ঝোলাচ্ছিস।

—মানে?

—দোকানটা নিবি নিবি বলে নেচে স্পিকটি নট হয়ে বসে আছিস যে বড়? আজ বুড়ো সাতসকালে আমায় ফোন করেছিল। বলল, কী মাস্টারমশাই, আপনার দিদিমণি তো একবার মুখ দেখিয়েই ভোকাট্টা হয়ে গেলেন! মাঘ মাস

তো ফুরিয়ে এল, আর কদ্দিন আমি ওঁর জন্য বসে থাকব?

ঋতি স্বস্তি পেল। যাক, অলকানন্দার ব্যাপারটা নয়। শুকনো গলায় বলল, —ও, তুই গড়িয়াহাটের স্পেসটার কথা বলছিস? টাকা তো জোগাড় হচ্ছে না রে।

—এখনও ম্যানেজ করে উঠতে পারলি না?

—কোথায় আর। পারব বলে তো মনেও হয় না। তুই বরং ভদ্রলোককে না বলে দে।

—ছেড়ে দিবি? এমন একটা গোল্ডেন সুযোগ...!

—কী করব, উপায় তো নেই। অত টাকার ব্যাপার...।

—তোর বরকে বলেছিলি?

—ওই বা কোত্থেকে পাবে?

—ধারধোর করেও হচ্ছে না?

—উহুঁ। ভদ্রলোককে কুইট্‌সই করে দে রে।

—তুই একটা যাচ্ছেতাই। বলে দেবাশিস থেমে রইল একটু। তারপর গলা ঝেড়েছে,— ঠান্ডা মাথায় শোন। আমি এক্ষুনি এক্ষুনি যেচে ভদ্রলোককে কিছুই বলছি না। আজকালের মধ্যে আবার ফোন করলে তোর সঙ্গে দেখা হয়নি বলে কাটিয়ে দেব। ইন দা মিন টাইম, তুই আর একবার মরিয়া ট্রাই নে। বুড়োর আজকের কথাবার্তার টোনে মনে হল কোনও পার্টিফার্টি পেয়েছে। তবে অন্তত আমাকে না জানিয়ে ও অন্য ডিলে যাবে না।

— বুঝলাম। ...কিন্তু পারব না রে।

—আমার বক্তব্য আমি জানিয়ে রাখলাম। যাক গে, তুই রেস্ট নে। পরে কথা হবে।

ঘরে ফিরে সিগারেট ধরাল ঋতি। বিছানায় বসল না, পায়চারি করছে শ্লথ পায়ে। টানা সাত-আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে তার শরীর এখন বেশ ঝরঝরে হওয়ার কথা। মাথাও। কিন্তু চোখে তার একটা করুণ ভাব ফুটে ওঠে কেন? দোকানটা ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে সে কি আশাহত? নাকি টাকার প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে শুভময়কে মনে পড়ছে তার? কিংবা সেই স্বপ্ন...সেই অপ্রিয় ছবি... লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে শুভময়, কোলে সাদা চাদরে মোড়া প্রাণহীন মুনিয়া! একবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল ঋতি, লেখার খাতাটা খুলল। কাল রাতে একটা কবিতা লিখেছিল, স্থির তাকিয়ে আছে লাইনগুলোর দিকে। উঠে পড়ল খাতা বন্ধ করে। আবার হাঁটছে ঘরময়। এক একবার বসছে খাটে, উঠে

পড়ছে পরক্ষণে। কী এমন অস্থিরতা জাগল ঋতির গহীনে?

হঠাৎই ঋতি বাইরে এল। স্মৃতি টিভিতে নিমগ্ন। বাংলা সিরিয়াল। দূর থেকে দেখতে অসুবিধে হয় বলে ইদানীং একেবারে পরদার সামনেটায় গিয়ে বসেন স্মৃতি। তাঁকে ঝলক দেখে নিয়ে ঋতি টেলিফোনটা তুলল। নম্বরের বোতাম টিপতে গিয়েও থেমে গেল হাত। ঘরে ফিরে মোবাইল অন করেছে।

প্রথম ঝঙ্কারও পুরো হল না, তার আগেই রিসিভার উঠিয়েছে শুভময়। এত তাড়াতাড়ি? ঋতির ফোনের প্রতীক্ষাতেই ছিল নাকি?

শুভময় বলল, —হ্যালো? হ্যালো?

—আমি ঋতি বলছি। কখন ফিরলে কোর্ট থেকে?

—এই তো, কিছুক্ষণ আগে।

—চা জলখাবার খেয়েছ?

—হ্যাঁ। রতন হালুয়া বানিয়েছিল। জানো তো, রতনের বিয়ে... তোমাকে তো বলেছিলাম।...

—দিন ঠিক হয়েছে?

—হুম্। পনেরোই ফাল্গুন। এ মাসের শেষে। চার-পাঁচ দিন আগে চলে যাবে।

—কদিন ছুটি নিচ্ছে?

—দিন পনেরো-কুড়ি তো বটেই।

—লোক দিয়ে যাচ্ছে তো?

—বলছে তো দেবে।

—ও। ঋতি একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, —আমি গিয়ে থেকে এলে চলবে?

—আসবে? তোমার তো কাজ আছে...অত দিন... তোমার হয়তো অসুবিধে হবে।

শুভময়ের স্বরে আমন্ত্রণ, না প্রত্যাখ্যান, সঠিক বুঝতে পারল না ঋতি। ফের একটু সময় নিয়ে বলল, —ও হ্যাঁ, তোমায় একটা কথা জানানোর ছিল। তোমায় আর ওই সেলামির টাকা নিয়ে টেনশান করতে হবে না।

—তোমার কি জোগাড় হয়ে গেছে?

—না। ওটা আমি ক্যানসেল করে দিয়েছি। ঋতির স্বর নির্লিপ্ত।

—কী হল? কোনও গণ্ডগোল...?

—না না। আমিই নেব না।

—কেন?

—অনেক ভেবে দেখলাম। আমার কপালে ভাল কিছু সহ্য হবে না। আমার যা ফাটা কপাল।

শুভময় একটুক্ষণ নীরব। তারপর নৈঃশব্দ্য ভেঙে বলল, —তুমি কি টাকার কথা ভেবে পিছিয়ে যাচ্ছ?

—টাকা তো একটা ফ্যাক্টর বটেই। তিন লাখ তো মুখের কথা নয়!

—কিন্তু দোকানটা হলে তোমার ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে যেত।

—ছাড়ো। যেটা হওয়ার নয়, তা নিয়ে আমি আর ভাবি না। মিছিমিছি তোমারও দুশ্চিন্তা বাড়ানো।... তুমি তো লেকটাউনেও টাকা চেয়েছিলে, তাই না? তোমার বড়বউদি ফোন করে বলছিল।

এবার শুভময় অনেকক্ষণ চুপ। ঋতির মনে হল ফোনটা বোধহয় কেটে গেছে। কিংবা শুভময় ফোন নামিয়ে রেখেছে।

ঋতির ক্ষণিক বিভ্রম চূর্ণ করে দিয়ে ফের শুভময়ের স্বর ভেসে এল, —আমি যে টাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছি ঋতি।

প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গেল ঋতি। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল, —কোত্থেকে? কী করে?

—হয়ে গেছে এদিক ওদিক করে। পি-এফ লোনটোন, হেন তেন...। তুমি দোকানটা ছেড়ো না ঋতি। যেমন করে হোক, ধরে রাখো।

—কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নেই। আমি শনিবার বিকেলে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে?

মোবাইল অফ করার পরেও ঋতি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। যা শুনল, তা কি সত্যি? ঋতি জানতেও পারল না, অনেক দূরে মফস্‌সলের এক শহরে, ম্যাটমেটে আলোর নীচে বসে শুভময় তখন কাঁপছে থর থর। ঘামছে। ঝিঁঝিপোকার উল্লসিত ডাকে বধির হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

এগারো

মানুষ বুঝি নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি অসহায়। কখনও কখনও জীবনে তার এমন মুহূর্ত আসে, যখন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের সঙ্গেই তাকে আপোস করতে হয়। শুধু কি ইচ্ছে, রফা করতে হয় নিজের ধ্যানধারণার সঙ্গেও। এমনকি আজন্মলালিত সংস্কারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের সঙ্গেও সন্ধি করতে হয় একতরফা। আর সেই সমঝোতার মুহূর্তটা তার জীবনের চূড়ান্ত এক ক্ষণ। মনের সঙ্গে মনের কী ভয়ংকর যুদ্ধ যে চলে তখন। এগোবে, না পিছোবে, এই টানাটানিতে তার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসে। তারপরও জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা বজায় রাখতে হয় তাকে। কথা বলতে হয় লোকজনের সঙ্গে, কাজ করতে হয়, খেতে হয়, ঘুমোতে হয়, এমনকী হাসতেও হয় কখনও কখনও। এ সবেরও ধকল খুব কম নয়।

শুভময়ও ভয়ানক ক্লান্ত বোধ করছিল। ধর্মতলা থেকে ট্যাক্সি নিয়েছিল, চোখ বুজে এখন হেলান দিয়ে আছে সিটে। দূরপাল্লার বাসে আসতে আসতেও গোটা রাস্তা ভেবেছে, ফিরে যাই, ফিরে যাই। তার আর ঋতির সম্পর্ক তো শুকিয়েই গেছে, টাকাগুলো দিলেই মরাগাঙে জোয়ার আসবে? তা ছাড়া অর্থের বিনিময়ে গড়ে ওঠা সম্পর্কে তো শুভময়ের আস্থাও নেই। ওতে তো শুধু কর্তব্য সম্পাদিত হয় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অর্থের সংস্থান না করতে পারলে তার ওপর ঋতির ক্ষোভ হয়তো বাড়ত আর একটু, তবে তাতে কি শুভময়ের এখন সত্যিই কিছু আসে যায়?

তবু এত কিছু জেনে বুঝেও শুভময়ের ফেরা তো হল না। কেন যে হতাশা জানানোর জন্য ওই দিনটাকেই বেছে নিল ঋতি?

সাড়ে ন'টা বাজে। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু। গরমও নয়, ঠান্ডাও নয়, বেশ একটা আমেজ মাখা। মিঠে বাতাসটাও ভাল লাগছিল না শুভময়ের, গা শিরশির করছিল। চোখ খুলে দেখল, ট্যাক্সি ঢুকে পড়েছে কসবায়। বড় রাস্তায় বেশির ভাগ দোকানপাটই বন্ধ, পথেঘাটে লোক আছে, তবে ভিড় নেই তেমন, রুবিপার্কের দিকটা তো প্রায় ফাঁকাই। শীত চলে গেলেও বেশির ভাগ বাড়িরই জানলা বন্ধ। সম্ভবত মশার কারণে। কীই বা রাত এখন, এর মধ্যেই কমে এল নাগরিক কোলাহল?

ঋতির বাড়ির গেটে থামল ট্যাক্সি। হ্যাঁ, ঋতির বাড়ি। কলকাতার ফ্ল্যাটটাকে

আজকাল ঋতির বাড়ি বলেই মনে হয় শুভময়ের। সে এখানে অতিথি মাত্র। ঋতি যেমন তার বাংলোয়।

মিটারে পঁচাত্তর টাকা উঠেছে। পার্স খুলে শুভময় একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল। ছোকরা বাঙালি ড্রাইভার পকেট হাতড়াচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,—আপনার কাছে পাঁচ টাকা হবে?

—না ভাই।

—আমারও তো নেই। তা হলে পাঁচ টাকা কমই রাখুন। ...এখান থেকে এখন প্যাসেঞ্জার জোটে কিনা ঠিক কী?

যেন সেই মূল্যটাও শুভময়কেই চোকাতে হবে! ক্রুদ্ধ হতে গিয়েও শুভময় সামলে নিল। কত কিছুই সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে আজ, এ তো সামান্য পাঁচ টাকা!

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে আবার গেটটা ভেজিয়ে দিল শুভময়। প্রায় নিঃসাড়ে। ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছেও থমকে রইল একটুক্ষণ। বেল বাজালেই কী দেখবে এক্ষুনি? ঋতির খুশিমাখা মুখ?

খুশিমাখা মুখই সে দেখল বটে, তবে ঋতির নয়, স্মৃতির। দু' গাল ছড়িয়ে স্মৃতি বললেন, —তোমার এত দেরি হল যে?

শ্রান্তি সরিয়ে রেখে শুভময়ও হাসল, —দেরি কোথায়! কোর্ট থেকে বেরিয়ে বাড়ি গেলাম, তার পর তো...

ঋতি ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসেছে। সহজ স্বরেই জিজ্ঞেস করল,—টানা বাসে এলে?

—হ্যাঁ। ব্রেকজার্নি আর পোষায় না।

জুতো ছেড়ে শুভময় বসতে না বসতেই স্মৃতি জল নিয়ে হাজির। গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, —চা খাবে একটু? করব?

—না থাক। এত রাতে আর...

—তা হলে হাত মুখ ধুয়ে একেবারে খেয়ে নাও।

কলকাতায় এক সেট পাজামা পাঞ্জাবি রাখাই থাকে। বাথরুমে দেওয়াই ছিল, ব্রিফকেস ঘরে রেখে পোশাক বদলে এল শুভময়। মুখে চোখে জলও ছিটিয়েছে ভাল করে, যা ধুলো মেখেছে আজ। এ যেন হার্মাটান, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, যার গায়ে লাগে সেই শুধু টের পায় ধুলোর অস্তিত্ব।

রাত্রে আজ খাওয়া-দাওয়ার ভালই আয়োজন। ঝাল ঝাল আলুর দম,

রুইমাছের কালিয়া, কষা কষা খাসির মাংস, নলেন গুড়ের রসগোল্লা। এবং রুটি নয়, পরোটা। রতনের মতো স্মৃতিরও বদ্ধমূল ধারণা, শুকনো রুটি খাওয়ালে শুভময়ের অমর্যাদা হয়।

শুভময় পল্‌কা আপত্তি জুড়ল,—এত সব কেন? আমি রাত্রে আজকাল খুব একটা খাই না।

স্মৃতি ফ্রিজ থেকে স্যালাডের প্লেট বার করছিলেন। ঘুরে তাকিয়ে বললেন, —কেন বাবা? শরীর টরির খারাপ নাকি?

—না না, স্টমাকটা হাল্‌কা থাকলে ভাল লাগে। বেশি রাত অবধি জেগে থাকতে সুবিধে হয়।

—রাত জাগো কেন? চটপট শুয়ে পড়লেই পারো।

—হয়ে ওঠে না। পড়াশুনো থাকে...। মাংসটা অর্ধেক করে দিন।

—কিচ্ছু বেশি দেওয়া হয়নি। ওটুকু তুমি পারবে।

—তা হলে মাছটা তুলে রাখুন। ওটা কাল সকালে খাব।

—এক পিস অন্তত খাও এখন। আমি নিজে হাতে করলাম...

—বললাম তো, কাল খাব। রাতে পরোটা মাংসই যথেষ্ট।

ঋতিও বসে গেছে খেতে। স্মৃতি মেয়ের দিকে তাকালেন। চোখে অনুনয়, তুই একটু বল্ না!

—থাক না মা। জোর করছ কেন? যেটুকুনি ইচ্ছে, সেটুকুনিই খাক। ও যখন চাইছে না...।

ঋতির স্বর তাপহীন। শুভময় তাড়াতাড়ি বলল, —ঠিক আছে, মাছ এক পিস খাচ্ছি।... আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? একসঙ্গে বসে পড়ুন না।

জামাইয়ের সামনে স্মৃতি কোনও কালেই তেমন স্বচ্ছন্দ নন। জামাইকে তিনি রীতিমতো সমীহ করেন। তার সঙ্গে খেতে বসার ব্যাপারে স্মৃতির খানিকটা সংস্কারও আছে। তবু বুঝি শুভময়ের উপরোধ অগ্রাহ্য করতে ভরসা পেলেন না তিনি। বসে গেছেন থালা নিয়ে। মিনমিন করে বললেন,—তোমায় খেতে দিতে যে অসুবিধে হবে বাবা।

—সবই তো সাজানো আছে। পরোটাটুকু আমি নিজের হাতে নিতে পারব না? আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন।

আহারে যোগ দিলেন স্মৃতি। তবে যত না খাচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বকবক করছেন। অপ্রতিভতাও তো কখনও কখনও মানুষকে বাচাল করে দেয়। নিজের আসন্ন চোখের অপারেশানের কথা শোনালেন। তাঁর এক ভাইপোর

বিয়ের ঠিক হয়েছে বৈশাখে, পাত্রীর বাড়ি নাকি লতায় পাতায় শুভময়দের কীরকম আত্মীয় হয়, এ নিয়েও গবেষণা চালালেন একটুক্ষণ। নীচের গ্যারাজে এবার কেমন ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হল তাও জানাতে ভুললেন না।

মেজাজ যেমনই থাক, শুনছিল শুভময়। বরাবর সে দেখে আসছে তার শাশুড়ি মহিলাটি ভারী সরল, কথা বলেন তাকে ভারী আপন ভেবে। স্মৃতির গল্প বলার ঢঙে মাঝে মাঝে হাসিও ফুটছিল শুভময়ের ঠোঁটে। ঋতি কিন্তু মাথা নিচু করে খেয়ে চলেছে। এক মনে। মা'র কথাগুলো সে কানেই তুলছে না। উচ্ছ্বাসহীন ওই মুখ দেখে ঈষৎ অস্বস্তিও হচ্ছিল শুভময়ের।

হঠাৎই স্মৃতি বললেন,—ও হ্যাঁ শুভ, কথায় কথায় মনে পড়ে গেল। বউমা তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলেছিল। একটা আইনি পরামর্শ।

শুভময় পরোটা ছিঁড়ছিল। চোখ তুলেছে, —কী ব্যাপারে?

—তা হলে গোড়া থেকে বলি। বউমার বাপের বাড়ির এক প্রতিবেশী মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন। এই তো, গেল পোষমাসে। সংক্রান্তির দু'-তিন দিন আগে। ভোরে হাঁটতে হাঁটতে মৌরিগ্রাম লেভেল ক্রসিংটা পার হচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন আপ লাইনের মধ্যিখানে একটা বস্তা! ভাল ভাবে খেয়াল করতেই দেখেন নড়ে নড়ে উঠছে বস্তাটা। তখনই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে, জ্যান্ত কিছু আছে নাকি? গিয়ে কাছ থেকে দেখবেন, ওমনি হাঁই হাঁই করে ট্রেন। ভদ্রলোক তো ভাবলেন, যাক হয়ে গেল। বস্তায় যাই থাকুক, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা, যাকে রাখে হরি, তাকে মারে কে! ট্রেন চলে যেতে দেখেন, বস্তা একদম অক্ষত। এবং কাছে গিয়ে খুলেই তাজ্জব, ভেতরে একটা সদ্য জন্মানো বাচ্চা! সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ে ভিড়াক্কার। সবাই বলাবলি করছে। বাচ্চাটার অনন্ত পরমায়ু, নইলে ওভাবে বেঁচে যায়! যে মা ফেলে গেছে, তাকেও সবাই গাল পাড়ছে। স্টেশনের জমাদারনি বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের চায়ের দোকানের দুধ খাওয়াল...। সবাই ভাবছে, বাচ্চাটাকে নিয়ে এবার কী হবে? কেউ বলছে, থানায় খবর দাও, কেউ বলছে রেল অফিসে জমা করো...। ভদ্রলোক কারুর পরামর্শ শুনলেন না, বাচ্চা নিয়ে সোজা বাড়ি। বউয়ের কোনও ছেলেপুলে হয়নি, ওই বাচ্চাটাকে তিনি নেবেনই।

—সে কী? শুভময় বলে ফেলল,—ওভাবে নেওয়া যায় নাকি? পুলিশে জানাতে হবে, কোর্টে দত্তক নেওয়ার জন্য আপিল করতে হবে, কোর্ট একটা সার্টেন পিরিয়ড অব্দি অপেক্ষা করে দেখবে বাচ্চার কোনও দাবিদার আছে কিনা...

—সেটাই তো হয়েছে সমস্যা। ভদ্রলোক গিয়েছিলেন থানায়। তারা বলছে, আমাদের কেস নয়, রেল জানে। রেল পুলিশও দায়িত্ব নিচ্ছে না। ভদ্রলোক এবার করেনটা কী? বউমা বলছিল, তুমি যদি একটু বুদ্ধি দাও...। সে ভদ্রলোককে বলেছে, আমার ননদাই জজ, তাকে জিজ্ঞেস করে...।

—বাচ্চা এখন কার কাস্টডিতে? ভদ্রলোকের?

—আর কোথায় থাকবে?

—আইনত পুলিশেরই জিম্মা নেওয়া উচিত। পুলিশ হোমেও পাঠিয়ে দিতে পারত। অবশ্য ভদ্রলোক কোর্টে প্রেয়ার করে আপাতত নিজের কাস্টডিতেও রাখতে পারেন...

—কিন্তু পুলিশ যে তুই থুলি মুই থুলি করছে!

—ওঁকে তা হলে সরাসরি কোর্টে যেতে হবে। বেওয়ারিশ শিশু দত্তক নেওয়ার প্রসেডিওর মানতে হবে।

—কোর্ট ওঁকে দিয়ে দেবে?

—ওই যে বললাম, সদ্যোজাত বাচ্চা তো, টেম্পোরারি কাস্টডি উনি পেয়ে যাবেন। তবে তার পরেও একটা রিজনেবল্ টাইম তো অপেক্ষা করতেই হবে। যদি কেউ এর মধ্যে বাচ্চাটার ওপর ক্লেম জানায়, অফকোর্স উইথ সাফিশিয়েন্ট প্রুফ, তা হলে...। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে কেউ আসে না। এলেই তো ক্রিমিনাল চার্জে পড়ে যাবে।

—যাক বাবা, বাঁচালে। ভদ্রলোক আর ভদ্রলোকের বউ যা টেনশান করছেন।...বিধাতার কী আশীর্বাদ ভাবো! দশ-বারো বছর বিয়ে হয়েছে, একটা বাচ্চার জন্য স্বামী-স্ত্রী হেদিয়ে মরছিল...

কথার মাঝেই সহসা ঋতির চিৎকার, —মা, তুমি থামবে?

স্মৃতি থতমত, —কেন? কী হল?

—তোমার কি আর কোনও টপিক নেই? বুঝি না তুমি কেন বলছ, অ্যাঁ? আমি কি কচি খুকি? বলেই দুমদুম পায়ে টেবিল থেকে প্রস্থান। সিঙ্কে থালা নামিয়ে মুখ ধুয়ে সোজা ঘরে।

স্মৃতি কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন,—বিশ্বাস করো শুভ, আমি কিছু ভেবে বলিনি।

—জানি তো। শুভময়ও আড়ষ্ট,—আমি বুঝেছি।

—বড্ড মেজাজ মেয়েটার। আমি আর পারি না, আর পারি না।

—ওর কথা গায়ে মাখছেন কেন? আপনি খেয়ে নিন।

স্মৃতির বুঝি গলা দিয়ে আর নামছে না কিছু। খুঁটছেন থালা। নাক টানলেন জোরে জোরে।

শুভময়ের খারাপ লাগছিল। স্মৃতির জন্য তো বটেই, ঋতির জন্যও। ঋতির দপ করে জ্বলে ওঠার কারণটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। ঋতির আর বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে বছর পাঁচেক আগে শুভময়দের দত্তক নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল ঋতির দাদা। কোনও এক অনাথালয়ে তার নাকি জানাশুনা আছে, বোন ভগ্নিপতি চাইলে সে খোঁজ করে দেখতে পারে। ঋতি রাজি হয়নি। অন্যের বাচ্চাকে নিজের বলে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি নাকি তার নেই। আজ হয়তো ভাবল, মা ওই প্রসঙ্গটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতে চাইছে। ঋতির ধারণা পুরোপুরি মিথ্যে নাও হতে পারে, স্মৃতি মুখে যাই বলুন না কেন। কোন মা না চায় তার মেয়ে আবার সংসারে পরিপূর্ণরূপে থিতু হোক?

কেন যে ঋতির দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে এত বিরাগ? সে তো অনুদার নয়, জাতধর্মের বাছাবাছিও তার নেই। তা হলে? সংসারে কোনও শিশু এসে গেলে শুভময়ের সঙ্গে একত্রে বাস করতে হবে, এই আশঙ্কাই কি ঋতিকে...? হতে পারে। হতেই পারে। এক ধরনের ছকে সে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছে, সে জীবন ঋতির খুব অপছন্দেরও নয়, সেখান থেকে বেরিয়ে সে আবার বন্ধনের জটিলতা চাইবেই বা কেন? কিংবা ঋতি হয়তো সত্যি সত্যিই মুনিয়ার জায়গায় আর কাউকে বসাতে চায় না। শুভময়ও কি চায় অন্তর থেকে? তবু হয়তো সে মেনে নিত। চেষ্টা করে দেখত, মরা নদীর শুকনো খাতে আবার জল আসে কিনা।

যাক গে যাক, অলীক চিন্তায় কী লাভ! রসগোল্লাটা খেয়ে শুভময় উঠে পড়ল। স্মৃতিরও আহার শেষ, বাসনকোসন গোছাচ্ছেন। ফ্রিজে মাছ মাংসর বাটি তুলতে তুলতে হঠাৎই অনুচ্চ স্বরে বললেন, — শুভ, তোমায় একটা কথা বলব?

শুভময় কুলকুচি করছিল। সেও গলা নামিয়ে বলল,—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

—জানি তুমি জোর দেখাতে পারো না। তবে সংসারে সেটারও কিন্তু প্রয়োজন আছে।

শুভময় বুঝতে পারল ইঙ্গিত কোন দিকে। নিজের মতো করে কিছু একটা কৈফিয়ত হয়তো দিতে পারত, কিন্তু স্মৃতি তা মানবেন কী? তাঁর যা বয়স, সেখানে যুক্তি চলে না।

স্মৃতির আরও বুঝি কিছু বলার ছিল। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন একটু। তারপর ফ্রিজের ডালা বন্ধ করতে করতে মাথা নাড়লেন, —যাও এবার। ক্লান্ত হয়ে এসেছ, শুয়ে পড়ো।

ঋতি লেখার টেবিলে ছিল। হাতে সিগারেট। খাতায় কী যেন আঁকিবুকি কাটছে। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে সামনে, ঘাড় নুইয়ে।

ব্রিফকেস খুলে শুভময় শেভিংসেট টুথব্রাশ আর চিরুনি বার করল। প্লাস্টিকে মোড়া টাকার প্যাকেটটাও। বিছানায় প্যাকেটটা রেখে জিনিসগুলো নিয়ে ঢুকল লাগোয়া বাথরুমে। ইদানীং দাঁতব্যথা হচ্ছে মাঝে মাঝে, দু'বেলাই তাই ব্রাশ করছে। বেরিয়ে এসে দেখল ঋতি একই ভাবে বসে আছে তখনও।

পাশে গিয়ে দাঁড়াল শুভময়। সাবধানী গলায় বলল,—টাকাটা আলমারিতে তুলে রাখো। পুরো তিনই আছে।

ঋতি চোখ উঠিয়েছে। ভুরুতে ভাঁজ, —তুমি আমাকে নিজে থেকে জানাওনি কেন?

—কী?

—টাকাটা তোমার জোগাড় হয়ে গেছে!

—ভেবেছিলাম... তোমাকে সারপ্রাইজ দেব...।

ঋতি যেন বিশ্বাস করল না। কপালের রেখা ঘন হয়েছে,—এত টাকা তুমি পেলে কোত্থেকে?

শুভময় মনে মনে বলল, জেনে কী করবে ঋতি? কিছু কিছু কথা তো অন্তরালে থাকাই ভাল।

মুখে ফ্যাকাশে হাসি টানল শুভময়, —পি-এফ লোনের দরখাস্ত করেছিলাম। প্লাস, কিছু ধার...। ইজি টার্মে। বেশি সুদ দিতে হবে না।

—তবু... কত?

—ব্যাংকে যেরকম নেয় আর কি! শুভময় কথা ঘোরাল, —তুমি কবে পেমেন্ট করছ?

—কালই দিয়ে আসব। ফেলে রাখব না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে সকালে?

—যেতে পারি।

শুভময় বিছানায় এসে আধশোওয়া হল। ঋতিও ছেড়েছে চেয়ার, প্লাস্টিকের প্যাকেটখানা রাখছে লকারে। আলমারি বন্ধ করতে করতে বলল,—তুমি কাল লেকটাউনে যাচ্ছ?

—হুঁ। ভাবছিলাম বিকেলে বাবার সঙ্গে দেখা করে ওখান থেকেই সন্ধের

বাসে ব্যাক করব।

—কালকের দিনটা থাকবে না? তুমি তো ইউজুয়ালি ভোরবেলা যাও!

—ভোরে খুব সমস্যা হয়। উঠেই হাঁকপাক করে ছোটা, বাস গড়বড় করলে টাইমলি পৌঁছতে পারি না... আগের বার তো রাস্তায় খারাপ টারাপ হয়ে কী অড সিচুয়েশান।

—ও। ঋতির মুখে যেন পলকা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। বিছানার ধারটিতে এসে বসেছে,—লেকটাউনে গেলে একটা ব্যাপার মাথায় রেখো। তোমার বড় বউদি সেদিন জেরা করছিল... হঠাৎ দু'-আড়াই লাখ তোমার লাগবে কেন... তুমি নাকি ওরকমই চেয়েছিলে?

—হুঁ। তবে বড়দাকে বলিনি। মেজদাকে...

—আমি দোকানের কথাটা ইচ্ছে করেই ভাঙিনি।

—বেশ করেছ।

—অবশ্য বলতেই পারতাম, আমার আর কী! ঋতি ঠোঁট উল্টোল,—আমি তো ও বাড়ির খারাপ বউ। তবে বাড়ির ভাল ছেলের মানে লাগতে পারে, সেই ভেবেই এড়িয়ে গেছি।

ঋতির বলার ভঙ্গিতে কিশোরীসুলভ অভিমান। শুভময় হেসে ফেলল। বহুক্ষণ পর এই প্রথম সত্যিকারের হাসি। স্মিত মুখেই বলল,—টাকার অ্যামাউন্ট কাউকেই বলার দরকার নেই। তোমার মা দাদাদেরও নয়।

থমথমে ঘরে হাসিটা বুঝি ম্যাজিকের কাজ করল। ঋতির চোয়াল শিথিল হচ্ছে ক্রমশ।

ক্লেদ মালিন্য তিক্ততা ছাপিয়ে শুভময়ের বুকে হঠাৎ দ্রিমদ্রিম ধ্বনি। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে ফেলল,—তুমি খুশি হয়েছ তো. ঋতি?

এবার ঋতির ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। দু'চোখে ঝিকঝিক করছে আলো। ওই হাসি, ওই আলোই বলে দেয় প্রশ্নটা কত অবান্তর এখন।

ক্ষণিকের জন্য ঋতিকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে হল শুভময়ের। পরক্ষণেই নিবে গেছে বাসনাটা। এই হাতে কি আর ঋতিকে স্পর্শ করা যায়?

হাজরা মোড়ে অপেক্ষা করছিল দেবাশিস। ঋতি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাকে তুলে নিয়েছে। ধীরেন দাস থাকেন ভবানীপুরে, হরিশ পার্কের আশেপাশে। দেবাশিস বাড়িটা চেনে, দোকানটার ব্যাপারে গোড়া থেকেই সে মধ্যস্থতা করছে, তাকে বাদ দিয়ে টাকা দিতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ট্যাক্সিতে উঠেই দেবাশিস হাসি হাসি মুখে শুভময়কে বলল,—জানতাম, পারলে আপনিই পারবেন। সেই জন্যই তো ঋতিকে বলছিলাম সাহেবকে একটু চেপে ধর।

ঋতি তরল মেজাজে, বলল,—আমি কিন্তু ওকে একটুও প্রেশার দিইনি। কী, দিয়েছি প্রেশার? তুমি বলে দাও।

শুভময় মৃদু স্বরে বলল,—না না, ও তো বারণই করেছিল। আমিই জোর করলাম...।

—এসব ব্যাপারে জোরই করতে হয়। মরিয়া হতে হয়। দেখবেন, ছ'মাসের মধ্যে ঋতি দাঁড়িয়ে যাবে। আর তিনটে পুজো পার করতে পারলেই তিন লাখ ওয়াপস্। নাহলে আপনি আমার নামে কুকুর পুষবেন।

—কুকুরের নাম দেবাশিস? যাহ্, ক্যাড শোনাবে। ঋতি খিলখিল হাসছে, —তোর কোনও ডাকনাম নেই? দেবু ছাড়া? ভুলু ফুলু গোছের?

—টিজ করিস না, টিজ করিস না। অধমের কথা ফলে কিনা মিলিয়ে নিস।

—ফলবে। যদি তমালিকা টমালিকারা পায়ের ধুলো দেয়।

—ইল্লি রে! তুই টুপি মেরে পাঁচশোর মাল দু' হাজারে বেচবি, আর মুরগি হবে আমার বউ? তোর বুটিক চালু হলে আমি ভাবছি ওর গড়িয়াহাট যাওয়াই বন্ধ করে দেব।

—তা হলে আর কী। আমাকে একটা ডালমেশিয়ান বা স্পিৎজ্ কিনতে হবে। মোটামুটি তোর গায়ের সঙ্গে কালার মিলিয়ে।

বন্ধুসঙ্গ পেয়ে ঋতি উথলে পড়ছে নিয়মমতোই। দু'জনের ঠাট্টা-তামাশার মাঝে নিজেকে হঠাৎ কেমন বোকা বোকা লাগছিল শুভময়ের। তুৎ, না এলেই হত, দেবাশিস তো ছিলই। কেন যে মিছিমিছি কাল রাজি হয়ে গেল? তাকে কি এসব সেলামির টাকা ফাকা দিতে আসা মানায়?

হাহ্, না মানানোরই বা কী আছে? সে তো আর আগের শুভময় নেই!

কথাটা মনে হতেই একটা কালো মেঘ ঢুকে গেল পাঁজরে। আকাশ ঝুলবর্ণ সহসা। রোদে ধোওয়া ফাল্গুনের সকালও পাঁশুটে যেন। নিজের অজান্তেই শুভময় বিড়বিড় করে উঠল, বিশ্রী বিশ্রী।

দেবাশিস রসিকতা থামিয়ে ঘুরে তাকিয়েছে, —কিছু বললেন?

—না তো। শুভময় জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল, —নাহ্।

ট্যাক্সি বাঁয়ে গলিতে ঢুকেছে। রোক্কে রোককে বলে এক প্রাচীন বাড়ির

দরজায় ড্রাইভারকে থামাল দেবাশিস। নেমেই হাঁকাহাঁকি, —কাকাবাবু? কাকাবাবু?

রাস্তার ধারের একটা জানলার ছিটের পরদা সরে গেল। দেখা দিয়েছে গোল মতন এক প্রবীণ মুখ। মাথাজোড়া টাক, পিছনে অল্প কটা চুল রুপোলি স্মৃতি হয়ে চিকচিক করছে। একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, —এসে গেছেন মাস্টারমশাই? এক মিনিট।

দেবাশিস বাড়ির ডানদিকটা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, —ওপাশটা বড় ভাইয়ের। আই মিন, ভাইপোদের। আমি যখন পড়াতে আসতাম সবাই একসঙ্গে ছিল, এখন পার্টিশান উঠে গেছে। মন্টুদেরও বইয়ের দোকান। কলেজ স্ট্রিটে।

ধীরেন দাস নিজে বেরিয়ে এসে অন্দরে নিয়ে গেলেন শুভময়দের। অন্ধকার অন্ধকার এক ঘরে বসিয়েছেন। পুরনো আমলের সোফা, কাঠের আলমারি, শোকেস, ঢাউস গোলটেবিল, আর একখানা তোশক বিছানো তক্তপোশে ঘরখানা জবরজং। আলমারিতে পুতুল টুতুল আছে কিছু, তবে বই নেই একটাও।

শুভময়রা সোফায়। ধীরেন দাস তক্তপোশে। শুভময়ের সঙ্গে ধীরেনের আলাপ করিয়ে দিল দেবাশিস। তেমন একটা গদগদ হলেন না ধীরেন, কুশল প্রশ্ন করছেন সৌজন্য মাফিক।

দেবাশিস কাজের কথা শুরু করল, —তা হলে কাকাবাবু. আজই ডিলটা ফাইনাল হয়ে যাক।

ধীরেন ঋতির দিকে তাকাচ্ছেন। বুঝতে পেরেই ঋতি বলে উঠল, —আমি টাকাটা এনেছি। আপনার কাগজপত্র সব রেডি তো?

—কাগজ আর কী! শুধু তো একটা ভাড়ার এগ্রিমেন্ট। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সব্‌জেটে চুক্তিপত্রটা নিয়ে ঋতিকে দিলেন ধীরেন, —পড়ে নিন। আমি কবে থেকে আপনার জন্য টাইপ ফাইপ করে বসে আছি।

ঋতি শুভময়কে বলল, —তুমি দ্যাখো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আইনকানুন বোঝেন, আপনিই...

শুভময় খুলল কাগজটা। চশমা নেই, পড়তে কষ্ট হচ্ছে, ধেবড়ে ধেবড়ে যাচ্ছে অক্ষর। অবশ্য কীই বা আছে পড়ার মতো? কিছু বাঁধা গতের কথা, আইনের চোখে যার কানাকড়িও মূল্য নেই। পাঁচশো টাকা করে ভাড়া নেবে, কিন্তু কদ্দিনের জন্য টেনেন্সি, সেটাও উল্লেখ করেনি। যেন চিরন্তন অধিকার

দিয়ে দিচ্ছে! অথচ বুড়োবুড়ি মরলে ভাইপোরা নির্ঘাত হুজ্জুতি শুরু করবে ঋতির ওপর, তখন আবার নতুন করে রফায় আসতে হবে ঋতিকে। তব এও ঠিক, ঋতি যদি নিয়মিত ভাড়া দিয়ে রসিদ রেখে দেয়, তাকে ওঠানো মোটেই সোজা হবে না। সে চুক্তি থাকুক, চাই না থাকুক।

ধীরেন পিটপিট করে দেখছিলেন। গর্বিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, —কী স্যার, ভুল পেলেন কিছু?

—নাহ্। নিখুঁত কাগজ।

—আমার এই বাড়িতে তিন তিনটে ভাড়াটে আছে। সবার জন্যে ওই এক বয়ান। ল'ইয়ারকে দিয়ে বানানো ড্রাফট, গলতি খুঁজে পাবেনই না।

সেই উকিলটি যে বটতলার, বুঝতে অসুবিধে নেই শুভময়ের। ইংরিজির যা ছিরি! একটি বাক্যও শুদ্ধ নয়। কায়দা করে অকারণে নেক্সাস শব্দটা ঢুকিয়েছে তিন জায়গায়, তিনবারই বানান ভুল।

শুভময় কৌতুকমাখা চোখে বলল, —হুম্। তা তো বটেই।

সইসাবুদ হয়ে গেল চুক্তিতে। সেলামির টাকা দেওয়ার আগে ঋতি থমকাল একটু। ঢোক গিলে বলল, —একটা রসিদ দেবেন না?

—সেলামির কি রসিদ হয় দিদিমণি? স্যারকেই জিজ্ঞেস করুন।

এই চরম অবৈধ প্রশ্নের উত্তরও তাকে দিতে হবে? হা ঈশ্বর, শুভময়ের কপালে এও ছিল?

দেবাশিস উদ্ধার করল শুভময়কে। বলল, —এই নিয়ে ভাবিস না ঋতি। এসব ট্রানজ্যাকশান মুখের কথার ওপরই হয়। আমি তো আছি।

বটেই তো। শুভময়ও কি টাকা নেওয়ার সময়ে কোনও লেখাপড়ায় গেছে? সে অবশ্য লিখে দিতে চেয়েছিল, অপর পক্ষ রাজি হল না যে।

ঋতি উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, —কবে তা হলে ঘরটা পাব?

—এক সেট চাবি আপনি আজই নিয়ে যেতে পারেন। তবে বইটই-গুলোর গতি করার জন্য আমায় কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে। ধরে নিন, সামনের রোববার দোকান ফাঁকা হয়ে যাবে পুরোপুরি।

কী ভেবে ঋতি চাবিটা নিয়েই নিল। উঠেও পড়েছে দু'-পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

পাঁচশো টাকার বান্ডিলগুলো গুনে নেওয়ার পর ধীরেন চা খাওয়াতে চেয়েছিলেন, শুভময় ভদ্র ভাবে না বলে দিল। বিশুদ্ধ কালো টাকার লেনদেন হজম করেছে এইমাত্র, আর কিছু তার এক্ষুনি সহ্য হবে না।

বাইরে এসেই দেবাশিস শুভময়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, —কন্‌গ্র্যাচুলেশানস্‌। ঋতির নতুন বুটিক তা হলে হল!

—আমাকে কেন! শুভময় কুণ্ঠিত, —অভিনন্দনটা তো ঋতিরই প্রাপ্য।

—বাট ইউ আর দা ম্যান বিহাইন্ড এভরিথিং। ...ঋতি, কী সেলিব্রেশান করবি?

ঋতির মুখে যেন ঝাড়বাতি জ্বলছে। বলল, —চল, এক্ষুনি খাইয়ে দিচ্ছি।

—উঁহু, এভাবে নয়। একটা গালা পার্টির আয়োজন কর। হাঁটতে হাঁটতে বলল দেবাশিস, —সব্বাই মিলে হুল্লোড় হবে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও চলে আসবেন...। আমরা সেদিন নতুন মায়াবিনীর স্বাস্থ্যপান করব।

—আমার বরের জন্য ওয়েট করলে তোদের আর খাওয়া হয়েছে। ঋতি অপাঙ্গে দেখল শুভময়কে, —এই যে এল, আবার কবে দর্শন দেয় দ্যাখ। সেই জন্যই বলছি, আজই চল্‌।

—হবে না রে আজ। শালি আসবে। এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গেছে। বাইরে থেকে খেয়ে ফিরলে শালি-বউ দু'জনে মিলে পেটাবে।

বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরল শুভময়। দেবাশিসকে বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে ফিরছে দু'জনে।

শুভময় দেখছিল ঋতিকে। খুশি মেখে ঋতি যেন একদম অন্যরকম। মায়াবিনী খোলার সময়েও ঋতিকে এত পুলকিত দেখেনি শুভময়। এ যেন সেই আহ্লাদে গলে গলে পড়া তেরো বছর আগের ঋতি। খাজিয়ারের সবুজ প্রান্তরে হরিণীর মতো ছুটে বেড়ানো ঋতি। আহা, ঋতি জানতেও পারল না, তার মুখে এই হাসিটা ফোটাতে গিয়ে শুভময়কে কী হারাতে হল!

ঋতি ঠেলছে শুভময়কে, —অ্যাই, কী এত ভাবছ?

—কিছু না। শুভময় সিটে হেলান দিল, —তোমার এই বন্ধুটা খুব লাইভলি।

—ব্যাটা পাক্কা শয়তান। ঋতি হিহি হাসছে, —এমন গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলে, কল্পনাও করতে পারবে না।

—কী রকম?

—এই তো একটা স্যাম্পল দিয়ে গেল। কথা শুনে মনে হল না, বউ অন্ত প্রাণ? আসলে ঘেঁচু। একটা ম্যারেড মেয়ের সঙ্গে বহুদিন ধরে লটঘট চালাচ্ছে। ব্যাটা ভণ্ড নাম্বার ওয়ান। দ্যাখো, এখন হয়তো তার কাছেই ছুটল।

শুভময় মনে মনে বলল, দুনিয়ায় কে ভণ্ড নয় ঋতি? আমিও কি সাচ্চা আছি?

মুখে বলল, —যাই করুক, তোমার কিন্তু খুব উপকার করেছে।

—সে আমি একশোবার মানি। দেবাশিসের হার্টটা খুব বড়। আমার রিয়েল বন্ধু। বলে ঋতি হঠাৎই নাক কুঁচকোল, —আচ্ছা, ফ্লোরটা কী করা যায় বলো তো?

শুভময় কথাটা ধরতে পারল না। বলল, —মানে?

—নতুন দোকানের মেঝেটা একেবারে খাজা হয়ে আছে। ওয়াল টু ওয়াল জুট কার্পেট পেতে নেব? নাকি লিনোলিয়াম?

—আমি তো ওসব ঠিক বুঝি না...

—অনেক কাজ আছে, বুঝলে। অনেক কাজ। দেওয়াল পেন্ট করাতে হবে, পুরনো মায়াবিনীর ফার্নিচার ফিট করবে না, নতুন করে কিছু তো বানাতেই হবে। প্লাস ইনটেরিয়ার ডেকরেশান। কবে যে কী করব? এর মধ্যে তো আবার দু'দিনের জন্য শান্তিনিকেতন যাওয়া আছে। কার্পেন্টাররা তো তখন চুটিয়ে ফাঁকি মারবে।

শুভময় শেষের কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না। সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, —তা হলে তো আবার টাকা লাগবে?

—ভয় নেই, তোমার ঘাড়ে আর চাপব না। ঋতির চোখে রহস্যের হাসি, —ওটার বন্দোবস্ত আমার হয়ে গেছে।

—কীভাবে?

—প্রথমে ভেবেছিলাম গয়না বেচে দেব। শুনে সোমদত্ত... তোমার সোমদত্তকে মনে আছে? আমার সেই অ্যাডমায়ারার? ...আমার অ্যাংজাইটি ফিল করে ও ভীষণ মুভড। বেচারার কদ্দিনই বা চাকরি, তেমন সঞ্চয়ও নেই,...। ওদের অফিস কো-অপারেটিভ থেকে যতটা পারে লোন তুলে দিচ্ছে। আমি অবশ্য ওকে বলেছি, মে মাস থেকে রেগুলার শোধ করে যাব।

আশ্চর্য, ঋতি তো কত অনায়াসে বলছে, কিন্তু শুভময়ের হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ সাইক্লোন আছড়ে পড়ে কেন? ঝড় উঠছে এলোমেলো, উত্তাল হচ্ছে ঢেউ, ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সমুদ্র...। শুভময় অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। শুভময়ের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

ঘূর্ণি ঝড়টাকে কোনওক্রমে দাবাল শুভময়। শান্ত করল সমুদ্রতল।

অচঞ্চল গলায় বলল, —খুব ভাল। তোমার তা হলে আর চিন্তা কী!

বাস থেকে নেমে ব্রিফকেস হাতে বাংলোয় ফিরছিল শুভময়। ধীর পায়ে। আবছায়া মাখা পথ ধরে। সারাদিনের ধকলে শরীর যেন ভেঙে আসছে। একটা ঘুম চাই এখন। গাঢ় ঘুম। স্লিপিং পিল কি নেবে আজ?

গেট খুলেই শুভময় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভেতর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ আসছে না? হুঁ, বাচ্চা কাঁদছে! কে এল রে বাবা? রতনের কোনও আত্মীয় টাত্মীয়? নাকি বসন্ত'র? কিন্তু রবিবার বসন্ত বাড়ি যাবে বলেছিল না?

মোরামে শব্দ তুলে বারান্দায় উঠল শুভময়। দরজা বন্ধ নয়, ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুভময় চমকেছে ভীষণ। মাটিতে বসে কে ও? তাপসী না? জোরে জোরে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে মেয়েকে!

শুভময়কে দেখামাত্রই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তাপসী। অমনি বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠল তারস্বরে।

শুভময় একবার বাচ্চাটাকে দেখল, একবার তাপসীকে। বিস্মিত গলায় বলল, —কী ব্যাপার? তোমরা এখানে? এত রাতে?

অন্দর থেকে দৌড়ে এসেছিল রতন। তাপসীর হয়ে সে'ই বলল, —আজ্ঞে স্যার, তাপসীদি খুব বিপদে পড়ে...

—কেউ বিপদে পড়লেই এখানে এসে উঠবে? স্ট্রেঞ্জ! ...তোর তো সাহস কম নয়। আমার অ্যাবসেন্সে ওদের অ্যালাও করেছিস!

—উপায় ছিল না স্যার। এমন ভয় পেয়ে এসেছিল, ফেরাতে পারলাম না।

বিপদ, ভয় কথাগুলো ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল শুভময়ের। বাচ্চাটার কান্না উত্তরোত্তর চড়ছে। কড়া গলায় বলল, —ওকে আগে থামাও।

থরথর কেঁপে উঠেছে তাপসী। ধপ করে বসে পড়েছে মেয়ের পাশে। থপ থপ চাপড়াচ্ছে। হাতের পিঠে চোখ মুছল। ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপছে।

জুতো খুলে শুভময় শোওয়ার ঘরে এল। পিছু পিছু রতনও। তার মুখে যা শোনা গেল, তা বেশ রোমহর্ষক কাহিনী। দিন চারেক আগে তাপসীর বর নাকি শাসিয়ে গেছিল টাকা নেওয়া বন্ধ না করলে সে তাপসীকে দেখে নেবে। তাপসী তার মুখে মুখে তর্ক করেছিল, তাতে নাকি সে বেজায় খেপে যায়। তারপর কাল থেকে শুরু হয়েছে তার দেখে নেওয়ার পালা। কাল নাকি কোন এক গুণ্ডাবদমাশকে পাঠিয়েছিল, সে নাকি সারা রাত দরজা ধাক্কেছে তাপসীর। আজ সন্ধেবেলাতেই লোকটা ঢুকে পড়েছিল তাপসীর ঘরে, হাত ধরে টানাটানিও করেছে। কোনও রকমে তাকে ঠেলে ফেলে বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে এসেছে তাপসী।

শুভময় ঘটনাবলির কার্যকারণ অনুমান করতে পারল। নির্ঘাত বরটা কোথাও থেকে জেনেছে, বউকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ করতে পারলে খোরপোষ দেওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাই নিজেই লোক লেলিয়ে দিয়ে কোর্টে বউয়ের নামে নালিশ ঠুকবে। সাক্ষী টাক্ষিও জোগাড় করে ফেলবে নিশ্চয়ই।

শুভময় ভারিক্কি গলায় বলল, —তা থানায় যায়নি কেন?

—আজ্ঞে, গেছিল স্যার। ওরা নাকি রিপোর্ট নিতেই চায়নি। বলে, তুই কী এমন লাটসাহেবের বেটি এলি রে, যে তোর ঘরে পুলিশ পাহারা বসাতে হবে! পারলে কারও বাড়ি গিয়ে থাক, নইলে আবার বিয়েশাদি করে ফ্যাল্!

ওর মা'টা কোথায়? বলতে গিয়েও শুভময় থেমে গেল। তাপসী বলেছিল বটে, দিদির বাড়ি গেছে মা। অর্থাৎ মেয়েটা একা আছে জেনেই পাজির পা ঝাড়া বরটা সুযোগ নিচ্ছে।

রতন কাচুমাচু মুখে বলল, —তাপসীদি খুব ভয় পেয়ে গেছে স্যার। ঠকঠক করে কাঁপছিল। বলছিল, হুজুর আমার ভগবান, হুজুর আমায় রক্ষা করবেন।

রাত দুপুরে এ তো ভ্যালা ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল। শুভময় অপ্রসন্ন মুখে বলল, —ঠিক আছে, রাত্তিরটা থাকুক। আমার স্টাডিরুমে মা মেয়ের শোওয়ার বন্দোবস্ত করে দে। একটা মশারি থাকলে বার করে দিস। আর পরিষ্কার জানিয়ে দে, সকাল হলেই যেন চলে যায়।

—কোথায় যাবে স্যার?

—যে চুলোয় খুশি যাক, এখানে নয়। আমি কারুর উদ্ধারকর্তা নই।

—স্যার, বেচারির ওপর আবার যদি হামলা হয়?

—তার আমি কী করব? আমি পুলিশ? না পাহারাদার? শুভময় খেঁকিয়ে উঠল। তারপর কপাল কুঁচকে ভাবল একটু, —আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওসিকে ফোন করে বলে দেব। হারামজাদাটাকে ঘাড় ধরে তুলে এনে আচ্ছা করে ধাতিয়ে দেবে। তেমন বুঝলে হাজতে পুরবে, তারপর কোর্টে আমি ওকে শায়েস্তা করছি। তবে আমার সাফ কথা, বাংলোয় কোনও উৎপাত চলবে না। মনে থাকবে?

রতন ঘাড় নাড়ল। গোঁজ মুখে বলল, —আপনাকে তা হলে খেতে দিই স্যার?

—রেডি কর। আমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে আসি।

পেটে চনচন করছে খিদে। বিকেলে লেকটাউনে চারখানা কড়াইশুঁটির কচুরি খেয়েছিল শুভময়, পথেই বেবাক হজম হয়ে গেছে। চা পর্যন্ত ছোঁয়নি

আর, পাকস্থলী এখন দাবানল। পাজামা পাঞ্জাবি পরে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল শুভময়। পরিচ্ছন্ন মেনু। রুটি, মুরগির মাংস, স্যালাড।

রুটি ছিঁড়তে গিয়ে শুভময়ের হাত স্থির। রতনকে জিজ্ঞেস করল, —ওরা কিছু খেয়েছে?

—তাপসীদি কিছু খেল না। মানুকে দুধ রুটি দিয়েছিলাম।

—না খেলে কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

—তা নয় স্যার। বলছিল খিদে নেই।

—হুঁহ্, যত সব ঢঙের কথা। রুটি মাংস দিয়ে দিবি, বলবি আমি বলেছি খেতে।

—আচ্ছা স্যার। রতন মাথা চুলকোচ্ছে, —একটা কথা বলব স্যার?

—কী?

—রাগ করবেন না তো?

—বল্ না।

—বলছিলাম স্যার, আমি তো শুক্র শনিবার চলে যাব... বিশ্বাসী লোক তো স্যার সেভাবে পাচ্ছি না... তাপসীদি যদি মানুকে নিয়ে এখানে থেকে যায়... আপনার রান্নাবান্না করে দেবে, ঘরদোর সামলাবে...

শুভময় কটমট চোখে তাকাল, —এই মতলবে এসেছে নাকি?

—না স্যার, সত্যিই বিপদে পড়েছে। বুদ্ধিটা স্যার আমার মাথাতেই এল। মা ফিরে এলে তাপসীদি চলে যাবে, আমিও তদ্দিনে এসে পড়ব।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তাপসীর এ বাড়িতে যাতায়াত আছে, মোটামুটি চেনাও মেয়েটা, একদম নতুন লোকের চেয়ে...। শুভময় এক টুকরো মাংস মুখে পুরল, —ঠিক আছে, ভেবে দেখব। তবে রাত্তিরেই ওকে কিছু বলার দরকার নেই।

খেয়ে উঠে ঘরে যেতে গিয়েও কী ভেবে বাইরে ঘরের দরজায় একবার দাঁড়াল শুভময়। বাচ্চাটা মেঝেতে ঘুমে কাদা, তাপসী বসে আছে গুটিসুটি মেরে। মায়া লাগে দেখে। এই বয়সে কলকাতায় কত মেয়ের এখন বিয়েই হয় না। আর এই মেয়ের সংসারের পাট শেষ, বাচ্চা আঁকড়ে শুধু ঝড়ঝাপটা সামলাচ্ছে! বেচারা!

বারো

বারান্দার ইজিচেয়ারে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল শুভময়। রবিবারের সকাল, বেরনোর তাড়া নেই, অলস মেজাজে উল্টোচ্ছে পাতা। পড়ার মতো আজকাল বিশেষ কিছুই থাকে না কাগজে। হয় খুন জখম ডাকাতি ধর্ষণ, নয় রাজনৈতিক গুণ্ডাবাজি আর দলবাজির সংবাদ। কিশোর অপরাধও ইদানীং বেড়েছে খুব, বাড়ছে কথায় কথায় ছেলেমেয়েদের আত্মহত্যার প্রবণতাও। খেলার পাতায় যা দু'-চার মিনিট চোখ রাখা যায়। নিরন্ন পরিবারের মেয়ে লড়ে লড়ে অলিম্পিকে যাচ্ছে, দাবায় আরও একটা খেতাব জিতল বিশ্বনাথন আনন্দ, হাড্ডাহাড্ডি খেলে ভারত পাঁচ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে...। এসব খবর তাও ছুটির সকালটাকে সুন্দর করে দেয়।

খেলার পৃষ্ঠাটাই শুভময় পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মূল কাগজ রেখে সাময়িকীটা টেনেছে, হঠাৎ দৃষ্টি সামনের লনে। তাপসীর মেয়ে ঢলঢলে ফ্রক পরে পাঁই পাঁই দৌড়চ্ছে, বসন্তর পিছন পিছন। বসন্ত ঘুরে দাঁড়াতেই উল্লাসধ্বনি বেজে উঠল মেয়েটার গলায়।

এমন দৃশ্যও ছুটির সকালকে মধুর করে দেয়। শুভময় স্মিত মুখে মাথা নাড়ল দু'দিকে। মা মেয়ে শেষ পর্যন্ত রয়েই গেল।

একদিক দিয়ে ব্যবস্থাটা বোধহয় ভালই হয়েছে। অন্তত শুভময়ের তো তাই মনে হয়। রতনের অনুপস্থিতিতে সেও তেমন অসুবিধেয় পড়ল না, তাপসীও বাঁচল আপাতত। অযথা থানাপুলিশ করে কোনও লাভ হত কি? সে হুকুম করলে ওসির অবশ্য সাধ্য ছিল না তাকে অমান্য করার, তাপসীর সুরক্ষার ব্যবস্থা থানাকে করতেই হত। কিন্তু থানার যা হাল! স্টাফ নেই, লঝ্ঝরে গাড়ি, জং ধরা বন্দুক... দেখে করুণা হয়। একসঙ্গে দু'তিন জায়গায় গণ্ডগোল বাধলে কনস্টেবল থেকে ও-সি, সকলের কোমরের বেল্ট খুলে যাচ্ছে, কোথায় কীভাবে সামাল দেবে লোকগুলো তার দিশা পায় না। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, আছে রাজনৈতিক দাদাদের ফাইফরমাশ খাটার চাপ। এমতাবস্থায় দীনস্য দীন একটা মেয়ের নিরাপত্তার জন্য ফি-রাত পাহারাদার পাঠানো কি সম্ভব? তাপসীকে দিয়ে কমপ্লেন ঠুকিয়ে অরুণ পাত্রকে হাজতেও পোরা যেত, তবে তাতেও সমস্যার সুরাহা হত কি? আজকাল সর্বত্রই যা রাজনীতির দাপট, মফস্বলে তো আরও বেশি, অরুণ কোনও পার্টির ছায়া খুঁজে নিলে আর তাকে পায় কে! দুম করে মেয়েটার কোনও সর্বনাশ ঘটিয়ে রাজনীতির রং লাগিয়ে

দেবে, ব্যস্ পুলিশও তখন অসহায় দর্শক। সে বেচারাদেরও তো ট্রান্সফার পোস্টিং-এর দুশ্চিন্তা আছে। কোন প্রভু বিগড়োলে তাদের কোন জাহান্নমে যেতে হয় তার ঠিক কী! সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট-বাংলোর নিরাপদ আশ্রয়েই সে থাকুক না। তাপসীর মা অন্য মেয়ের বাচ্চা বিইয়ে ফিরুক, তারপর নয় দেখা যাবে।

তাপসী চা এনেছে। জলখাবারের ডিশটা পড়ে আছে বেঁটে টুলে, খালি ডিশ তুলে সেখানে বসাল চায়ের কাপ। ব্রেকফাস্টের পর, ছুটির দিনে শুভময়ের যে আরও এক কাপ চা চাই, মেয়েটা জেনে গেছে। রতন যাওয়ার আগে তাকে পাখিপড়ার মতো করে শিখিয়ে দিয়েছে সব।

শুভময় চায়ে চুমুক দিল। তাপসী নড়েনি, দাঁড়িয়েই আছে। শুভময় একটু অবাকই হল। দরকার না পড়লে মেয়েটা তার সামনে থাকে না বড় একটা। সম্ভবত ভয় পায়। সেদিন রাতে যা রুদ্রমূর্তি দেখেছিল শুভময়ের। ব্রিজের ওপর ঢিপ করে প্রণাম ঠুকে সপ্রতিভ সুরে কথা বলা তাপসী, আর এখনকার তাপসীতে যেন অনেকটাই তফাত।

টেরচা চোখে শুভময় জিজ্ঞেস করল, —কিছু বলবে?

—আজ্ঞে, আজ দুপুরে কী খাবেন?

—কী আছে ফ্রিজে?

—কাটা রুইমাছ, ডিম, বাঁধাকপি, পটল, কড়াইশুঁটি, টোমাটো, আলু...।

—অনেক কিছুই তো রয়েছে। আন্দাজ করে রাঁধো না।

—সর্ষে পটল করব? আপনি তো সর্ষে দিয়ে রান্না ভালবাসেন।

শুভময় মজা পেল একটু। হাল্কা গলায় বলল, —জব্বর ট্রেনিং দিয়েছে তো রতন! আর কী কী ভালবাসি বলে গেছে?

—আজ্ঞে দইমাছ, ঝাল ঝাল আলুর দম, ঝিঙে পোস্ত, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল...

—বাহ্, লম্বা লিস্ট ধরিয়েছে তো দেখি! শুভময় হাসল শব্দ করে। তার মনে হল তাপসীর জড়তা খানিকটা কেটেছে যেন। স্বাভাবিক। রতন গেছে পরশু, তারপর থেকে তো একা হাতেই সামলাচ্ছে ঘরদোর। হাসতে হাসতেই বলল, —জেনেই যখন গেছ, আর ভাবনা কী!

—আজ্ঞে টকদই আনতে হবে যে একটু। দইমাছের জন্য। বসন্তদাকে বলব?

—না। ও গভর্নমেন্ট থেকে মাইনে পায়, আমার কাছ থেকে নয়। ওকে দিয়ে কক্ষনও বাড়ির কাজ করাবে না।

—তা হলে আমি যাই?

শুভময় ভাবল দু'-চার সেকেন্ড। সে নিজে কখনই বাজারে যায় না। কেনাকাটার ঝক্কিটা রতনের ঘাড়েই ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু মাঝের কটা দিন...? মেয়েটাকে বাজারহাটে পাঠানো কি সঙ্গত হবে? অরুণ নিশ্চয়ই এত সাহস পাবে না, ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি কাজ করছে জেনেও পথেঘাটে ধরবে তাপসীকে! তা ছাড়া সে থাকে ক্ষীরপাইতে, নিশ্চয়ই তাপসীকে ভয় দেখানোর জন্য সে ধারেকাছে ঘাঁটি গেড়ে বসে নেই! আশা করা যায় লোক লাগিয়ে রাস্তায় হেনস্থা করার মতো বুকের পাটাও আর নেই তার! তবু মেয়েটাকে... শুধু টকদই আনতে...

শুভময়ের দ্বিধা বুঝি টের পেয়েছে তাপসী। সামান্য গলা তুলে বলল, —কিচ্ছু হবে না স্যার। এই তো, ব্রিজের পরেই দোকান। আমি যাব, আর আসব।

হুজুর থেকে স্যার? এও কি রতনের শিক্ষা? শুভময় ফের হেসে ফেলল, —ঘর থেকে আমার পার্সটা নিয়ে এসো।

শুভময়ের হাসিমুখ দেখে সাবলীল ভাব যেন বেড়েছে তাপসীর। ত্বরিত পায়ে পার্স আনল। টাকা মুঠোয় চেপে তুরতুর নামছে লনে। অমনি বাচ্চাটা ছুটে এল কোত্থেকে, খুদে খুদে হাতে আঁকড়ে ধরেছে মাকে, আধো আধো স্বরে কী যেন বলছে। তাপসী চাপা গলায় ডাকল বসন্তকে। মেয়েকে সরানোর জন্য ইশারা করছে। বসন্ত ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে বাংলোর পিছনে নিয়ে যেতেই চটপট বেরিয়ে পড়ল তাপসী, গায়ে আঁচল টেনে।

ছোট্ট একটা দৃশ্য। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবু শুভময়কে যেন পলকের জন্য চলকে দিল ছবিটা। তার নির্জীব বাংলোর প্রেক্ষাপটে দৃশ্যটা যেন একদম অন্যরকম। আহা, রতন বিয়ে করে বউটাকে এখানে নিয়ে এলে বেশ হয়। দিব্যি ভরা ভরা লাগে বাড়িটা।

আশেপাশে কোথায় যেন কোকিল ডাকছে। স্বর ক্রমশ চড়ছে পাখিটার। থেমে গেল। আবার ডাকছে। শুভময়ের কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। লনে নেমে এসে শুভময় খুঁজল পাখিটাকে। কোথায় কোন ডালে যে লুকিয়ে আছে ব্যাটা! জোর জোর হাততালি বাজাল শুভময়, যদি ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে যায় পরভৃত। উঁহু, পাখির কোনও হেলদোল নেই, গলা সাধছে প্রাণ ভরে।

শুভময়ের পাশে হঠাৎই একটা কচি হাতের তালি। তাপসীর মেয়ে কখন যেন এসেছে গুটিগুটি, নকল করছে শুভময়কে।

আবার শুভময় তালি বাজাল। দেখাদেখি বাচ্চাটাও।

হাত ছুঁড়ে শুভময় বলল, —হুশ।
বাচ্চাটাও হাত তুলেছে, —হুঁশ।
শুভময় বলল, —যাহ্ পালা।
বাচ্চাও বলল, —যা, পালা।
খেলা পেয়ে গেল শুভময়। সে যা করছে, তাই নকল করছে মেয়েটা। সে দু'পা দৌড়লে, মেয়েটাও দৌড়োয় দু'পা। সে জিভ ভেঙালে, মেয়েটা জিভ দেখায়।
মিনিট পাঁচেক পর শুভময়ের সংবিৎ ফিরল। বসন্ত অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তার ছেলেমানুষি, দন্তপাটি বিকশিত করে হাসছে।
শুভময় লজ্জা পেয়ে গেল খুব। মুখ সহসা এজলাসের হাকিমের মতো কঠিন করে লন ছেড়ে উঠে এসেছে বারান্দায়। চেয়ারে বসতেই আবার পেট গুলিয়ে হাসি। ওফ্, বসন্তটা আজ যা তাজ্জব হয়েছে! মাঠে ময়দানে গপ্পো না করে বেড়ায়!
টেলিফোন বাজছে। হাসিটাকে বুকে নিয়েই ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলল শুভময়।
চন্দ্রচূড়ের গলা গমগম করে উঠল, —নমস্কার স্যার। কেমন আছেন?
মুহূর্তে বিষ হয়ে গেছে ভেতরটা। শুভময় গম্ভীর, —ভাল। হঠাৎ আপনি?
—একটা নিবেদন ছিল স্যার। দোল পূর্ণিমার দিন কি আপনি এখানে থাকছেন? মানে কাল সোমবারের পরের সোমবার?
—কেন?
—আমার বাড়িতে পুজো। রাধামাধবের। দয়া করে যদি সেদিন সন্ধেয় একবার পায়ের ধুলো দ্যান...
নিজেকে সামলাতে পারল না শুভময়, —আপনি জানেন তো আমি যাই না। কী ভাবছেন আপনি? আমার আপনার সম্পর্ক কি বদলে গেছে?
—ছি ছি, এ কী বলছেন স্যার? কত বার তো বললাম, একটা ব্যাপারের সঙ্গে আর একটাকে গুলিয়ে ফেলবেন না। সেদিন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন তাই...
—যে খুশি আসুক। আমি যাই না। যাবও না। অনুগ্রহ করে আর ফোন করবেন না।
রিসিভার সজোরে ক্রেডলে রেখে দু'হাত মুঠো করে বসে রইল শুভময়। চোয়াল শক্ত, শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। এ কী ফাঁদে পড়ল সে? চন্দ্রচূড় কি

এভাবেই তাকে জ্বালাবে নিয়মিত?

আবার ফোনের ঝংকার। বাজতে না বাজতেই ঝড়াকসে রিসিভার তুলে শুভময় চিৎকার করে উঠেছে, —ভেবেছেন কী আপনি? কেন আমায় ডিসটার্ব করছেন? আই অ্যাম নট বাউন্ড টু গো টু ইওর প্লেস।

—কী হল? চেঁচাচ্ছ কেন? ওপারে ঋতির গলা, —কাকে বকাবকি করছ?

ফুটো করে দেওয়া বেলুনের মতো চুপসে গেল শুভময়। বিড়বিড় করে বলল, —ও, তুমি!

—কার সঙ্গে রাগারাগি করছিলে? তোমার পেশকার?

—না না, অন্য একজন। ...বলো, কী খবর?

—এত মাথা গরম করো না। শরীর খারাপ হবে। ...হ্যাঁ, যে জন্য ফোন করা। ধীরেন দাস কথা রেখেছে। বইপত্র সব সাফ, কালই পজেশান পেয়ে গেছি।

—বাহ্, সুখবর। শুভময় জোর করে প্রগল্ভ হল, —এবার তা হলে তোমার মিস্ত্রি টিস্ত্রি লাগিয়ে দাও।

—হ্যাঁ, দেরি করা যাবে না। কালই কার্পেন্টারকে আসতে বলেছি। এস্টিমেট নিয়ে নেব। ফার্স্টে দেওয়ালের কাজগুলো তো শুরু করি। আমি তো আবার বেস্পতিবার থাকছি না। শান্তিনিকেতন যাব। কবিতাপাঠ। ফিরতে ফিরতে শুক্কুরবার রাত।

—ও। শুভময় সন্তর্পণে বলল, —আর কে কে যাচ্ছে?

—অনেকে। একটা আস্ত ব্যাটেলিয়ান বলতে পারো। ...তোমার রতন চলে গেছে?

—হ্যাঁ। পরশু তো ওর বিয়ে।

—লোক দিয়ে গেছে?

—পাকেচক্রে একটা মেয়েকে পেয়ে গেছি। বাচ্চা নিয়ে আছে, কাজকর্ম করছে...।

—রান্নাবান্না কেমন?

—ঠিকই আছে। রতনের চেয়ে খারাপ কিছু নয়। নুনের আন্দাজটা রতনের চেয়ে ভাল।

—বিশ্বাসী তো?

—মনে তো হয়।

—যাক গে, সাবধানে থেকো। টাকাপয়সা যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে রেখো না...।

শুভময়ের ফের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কবির দঙ্গলে কে কে আছে? মুখ ফুটে করতে পারল না প্রশ্নটা।

—অ্যাই শোনো, আর একটা কথা। আবার ঋতির গলা, —মার্চে একবার আসতে পারবে? শেষের দিকে?

—কেন?

—ও সময়ে মা'র চোখের অপারেশানটা হবে। মাইনর সার্জারি... মা এখানে থাকবেও না, দাদার ওখানে উঠবে... তবু তুমি একবার দেখা করে গেলে মা'র ভাল লাগবে।

—চেষ্টা করব।

—পারলে দু'-তিন দিন ছুটি নিয়ে এসো। কাজ যদি শেষ হয়ে যায়, নতুন মায়াবিনী ওপেন করে দেব। চৈত্র সেল্ তো পুরোদমে চলবে তখন, গড়িয়াহাটে খুব ভিড় থাকবে। ওই সময়ে স্টার্ট করলে গোড়াতেই কিছু বিজনেস পেয়ে যেতে পারি। খারাপ আইডিয়া, বলো?

—খুবই ভাল।

—প্লাস, মা তখন থাকবে না... বাড়িতে পার্টিটাও দিয়ে দেওয়া যাবে। দেবাশিস তো পার্টি পার্টি করে কানের পোকা বার করে দিচ্ছে।

—বেশ। তখনই দিও।

—তা হলে এখন ছাড়ি? ...টাইম টু টাইম আমি তোমায় জানাব দোকানের কাজ কেমন এগোচ্ছে।

—হুম্।

ঘরে এসে শুয়ে পড়ল শুভময়। সকালের প্রফুল্ল মেজাজ পর পর দুটো ফোনের অভিঘাতে কোথায় উধাও। আবার ফিরে আসছে অবসাদ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে কড়িবরগাঅলা উঁচু সিলিঙের দিকে। কিছুই দেখছে না সেভাবে, তবু অপলক হয়ে আছে চোখ। তবে না চাইতেও নজর তো মাঝে মাঝে কোথাও না কোথাও আটকিয়েই যায়। যেমন, এই মুহূর্তে শুভময় সিলিঙে একটা কালচে ছাপ দেখতে পাচ্ছিল। নোনা লেগেছে। গত বছর মোটামুটি এই সময়েই বাংলোয় এসেছিল, তখন থেকেই লক্ষ করছে ছোপটাকে। ছোট ছিল, বড় হচ্ছে দিন দিন। সিমেন্টের বুকে জমে থাকা জল কী ভাবে যে ছড়ায়? একদিন কি গোটা সিলিংটাই চলে যাবে বাষ্পের অধিকারে?

শুভময়ের চোখ জড়িয়ে এল তন্দ্রায়। পাতলা পাতলা ঘুমে ছেঁড়াখোঁড়া কিছু

স্বপ্ন দেখছিল শুভময়। ধু ধু মরুভূমি। মাঝে মাঝে চোরাবালি, সেখান থেকে ঠেলে উঠছে কাঁটাগাছ। পাতাও আছে গাছে। সবুজ পাতা নয়, লাল লাল পাতা। রক্তের মতো। একরাশ বুনো জন্তু চরে বেড়াচ্ছে বালিতে। ধীরেন দাস চেঁচিয়ে তাড়াচ্ছে তাদের, যাহ্ যাহ্। একটা বাঘ অবিকল মানুষের গলায় গর্জন করে উঠল, শুভময়, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? শুভময় দেখল একটা ময়াল সাপ এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে, যাচ্ছে...

সওয়া একটা নাগাদ চোখ খুলল শুভময়। তাপসীর কুণ্ঠিত ডাকে, — স্যার? স্যার, উঠবেন না?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুভময়ের চক্ষুস্থির, এত বেলা হয়ে গেছে? ডাকোনি কেন?

—খুব ঘুমোচ্ছিলেন স্যার।

হ্যাঁ, ঘুম ভালই হয়েছে বটে। অবসন্ন ভাবটা আর নেই, বরং তাজা লাগছে বেশ। চটপট স্নান সেরে খেতে বসে গেল শুভময়। ভাত মাখার আগে জিজ্ঞেস করল, —তোমার মেয়ে খেয়েছে তো?

পাতে সর্ষে পটল দিতে দিতে তাপসী বলল, —এবার ওকে দেব।

—সে কী? অতটুকু শিশুকে এখনও না খাইয়ে রেখেছ?

—বসন্তদার কাছে দুটো সন্দেশ খেয়েছিল...

—সন্দেশ খেয়েছে বলে ভাত দাওনি? এরকম যেন আর কক্ষনও না শুনি। আমার এখানে থাকার সময়ে বাচ্চার যেন কোনও অযত্ন না হয়। নিজের বাড়িতে গিয়ে যা খুশি করো।

তাপসী অধোবদন। শুভময় আড়চোখে দেখল তাকে। একটু বেশি কড়া সুরে বলা হল কি? পটলের গা থেকে সর্ষে চেঁছে ঠেকাল জিভে। গলাটাকে সামান্য নরম করে বলল, —ভাল রান্না হয়েছে।

—কাল একটু মাংস নিয়ে আসব স্যার? রতনভাই বলছিল আপনি ভালবাসেন...

—এনো। বিকেলে মনে করে টাকা নিয়ে নিও। ...তোমার মেয়ের জামাটাও তো ছিঁড়ে গেছে, ওর জন্য গোটা দুয়েক জামাকাপড় কিনে এনো।

—মানুর কিন্তু জামা আছে স্যার। ঘরের মধ্যে ঘুরছে বলে পরাইনি।

—এ আবার কী কথা? বাড়িতে ভিখিরির মতো থাকবে? না না, আমি এসব পছন্দ করি না। আবার রূঢ় হতে গিয়েও শুভময় সংযত, —তোমার নিজের জামাকাপড় আছে তো?

—হ্যাঁ স্যার। মঙ্গলবার রতনভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি।

—গুড। কাচা জামা পরবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে, এটাই আমার বাড়ির নিয়ম। ...দাও, আর কী দেবে দাও।

খাওয়া শেষ করে শুভময় আরও একটুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর গিয়ে বসেছে স্টাডিতে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি ভালই গরম পড়ে গেছে। মাথার ওপর ফ্যানটা টিকিয়ে টিকিয়ে ঘুরছে, ঘরে তেমন হাওয়া হচ্ছে না। হতাশ চোখে পাখাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুভময় ঢাউস বই খুলল আইনের। পুরনো আকর্ষণীয় কেস ঘেঁটে ঘেঁটে পড়া তার শখ। সেরকমই একটা মামলা বেছে ডুবে গেল অক্ষরের জগতে। এ তার অধ্যয়নও বটে। কোনও বিশেষ মামলায় বিখ্যাত বিচারপতি বা আইনজ্ঞ কী ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন জানলে অনেক কিছু শেখা যায়।

পড়ায় ব্যাঘাত ঘটল। আবার বাইরে ডাকছে কোকিলটা। এবার কুহু কুহু তত প্রকট নয়, ফাল্গুনের দুপুরের মতোই নরম। ঝিম ধরানো। আনমনে ডাকটা একটু শুনল শুভময়, ফের মন দিয়েছে পাঠে।

পড়তে পড়তেই শুভময় এবার টুকরো টুকরো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। বাসনকোসনের শব্দ। বাচ্চার কান্না। বাচ্চার খিলখিল হাসি। অস্পষ্ট বামাকণ্ঠ কথা বলছে বাচ্চার সঙ্গে। মিহি গান ভেসে এল। মেয়েলি সুর দুলে দুলে ঘুম পাড়াচ্ছে বাচ্চাকে।

আস্তে আস্ত অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। কেমন যেন ঘোর ঘোর লাগছিল শুভময়ের। ক্ষণিকের জন্য মনে হল সে বুঝি এখন মাথাভাঙায়!

বিভ্রমটা ক্ষণিকেরই। সুর থামতেই কেটে গেল বিভ্রম।

তেরো

নৈশাহার সেরে ফিরছিল ঋতিরা। কবিতার আসর বসেছিল সিংহসদনে, ভাঙতে ভাঙতে আটটা বাজল, তারপর সুধন্যার মারুতিভ্যানে বেরিয়ে পড়েছিল দল বেঁধে। খাওয়াদাওয়া হল বোলপুর ছেড়ে খানিকটা দূরে, একটা গ্রাম গ্রাম পরিবেশের হোটেলে। ইদানীং হোটেলটার খুব নামডাক, শান্তিনিকেতন এলে অনেকেই সেখানে যায়। যেমন তাজা শাকসবজি, তেমনই

টাটকা মাছ-মাংস, রান্নাও অতি উত্তম। স্বাদের গুণে একটু বেশিই ভোজন হয়ে গেছে সকলের, সাতটা পেটই টইটুম্বর।

জম্পেশ একখানা চাঁদ শো দিচ্ছে আকাশে। পূর্ণিমার চাঁদ নয়, একটু খাঁদাবোঁচা। তবে তারও কী মহিমা, নীলচে কিরণে দু'পাশের ধু ধু মাঠ ভিজে জাব। জ্যোৎস্না গিলে বাতাস যেন খেপা বাউল, ঝুমুর ঝুম নেচে বেড়াচ্ছে এলোপাথাড়ি। মাঝে মাঝে ছোট গ্রাম, চাঁদের আলো মস্তানি মারছে সেখানেও। কালো কালো গাছপালাগুলোর মাথায় চড়ে বসেছে।

হ্যাঁ, চাঁদের আলোর বাড়াবাড়ি দেখে ঋতির এরকমটাই মনে হচ্ছিল। তবু তাকিয়ে আছে বাইরে, সম্মোহিত চোখে।

ধারার প্রাণে ভাব এসে গেছে হঠাৎ। গুনগুন গেয়ে উঠল, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে... বসন্তের এই মাতাল সমীরণে...

ব্যস, ছোঁয়াচ লেগে গেল গাড়িময়। ধারার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে বাকিরাও। বিজন অনিমেষ রেণু সোমদত্ত ঋতি। সুধন্যও চুপ থাকতে পারল না, স্টিয়ারিং ধরে গলা ছেড়েছে সেও।

গান শেষ হতেই সমবেত করতালি। মুখ্য গায়ক হিসেবে ধারাই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করছে।

গাড়ির একদম পিছনটায় স্পেশাল বেবিসিটে সোমদত্ত আর ঋতি মুখোমুখি। সোমদত্ত ঋতিকে বলল,—এই গানটা রবীন্দ্রনাথ কখন লিখেছিলেন জানো তো?

সুধন্য সামনে থেকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল,—কখন? বর্ষার দুপুরে?

গাড়ি জুড়ে হ্যা হ্যা হাসি। শুধু সোমদত্তই হাসল না, ভারিক্কি গলায় বলল, —না, চৈত্র মাসে। সালটা সম্ভবত তেরোশো কুড়ি। যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ গানটা লিখেছিলেন তাঁর ছেলে শমী মারা যাওয়ার পর। এটাকে পুত্রশোকের গান বলতে পারো।

রেণু ধারা বিজন বসেছে মাঝের সিটে। রেণু ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,—যেমন নজরুল লিখেছিলেন, শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়!

—হ্যাঁ। তবে দু'জনের প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য আছে। একজন ব্যক্তিগত শোকের উত্তরণ ঘটিয়েছেন সৌন্দর্যচেতনায়, অন্যজনের গানে শুধুই হাহাকার। অর্থাৎ ঘটনা এক হলেই প্রতিক্রিয়াও অভিন্ন হবে তার কোনও স্থিরতা নেই।

ঋতির বুকে টুং করে বাজল কথাটা। সোমদত্ত ভুল বলেনি। একই আঘাত দু'জনের হৃদয়ের তন্ত্রীতে এক সুর তোলে কি? মুনিয়ার মৃত্যু তো একই রকম

ধাক্কা দিয়েছিল ঋতিকে আর শুভময়কে, কিন্তু তার অভিঘাত কি দু'জনের ক্ষেত্রে আলাদা হয়নি?

অনিমেষের হঠাৎ প্রতিবাদে ভাবনাটা ছিঁড়ে গেল ঋতির। ঘাড় নেড়ে নেড়ে অনিমেষ বলছে,

— নজরুলের ব্যাপারে তোমাদের ফান্ডাটায় গড়বড় আছে ভাই।

ধারা বলল,— কী রকম?

— অ্যাজ ফার মাই নলেজ গোজ, নজরুলের ওই গানটা মোটেই পুত্রশোকের নয়। নজরুল গানটি লিখেছিলেন জ্ঞান গোস্বামীর অনুরোধে। গানটার সঙ্গে একটা রবীন্দ্রসংগীতের সুরে খুব মিল আছে।... অল্প লইয়া থাকি তাই...

উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসা একটা লরিকে পাশ কাটাচ্ছে সুধন্য। পার হয়ে গতি আরও কমিয়ে দিল। তারপর মাথা দোলাচ্ছে,—যাক বহুৎ ইনফরমেশান মিলল। জ্ঞানবৃদ্ধির অনারে আমরা কি এখন একটু পান করতে পারি না?

রেণু বলল,—তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। সব সময়ে ছোঁকছোঁক। ওইসব ছাইপাঁশ গিলে কী যে আনন্দ পাস!

—ঠানদি টাইপ কথা বলিস না তো। জীবনে কোনওদিন তো জিভ ছোঁয়ালি না, তুই এর মর্ম বুঝবি কী?

অনিমেষ বলল,—এখন বাদই দে। রুমে ফিরে দেখা যাবে। ভরা পেট, প্লাস গাড়ির দুলুনি, বমি হয়ে যেতে পারে।

—অল্প খাব। এইটুকু। সুধন্য আঙুলে মুদ্রা ফোটাল,—পেট জানতেও পারবে না।

ধারা বলল, —হ্যাঁ হ্যাঁ বের কর। এক সিপে কিছু হবে না।

সুধন্যর গাড়িতেও সুচারু বন্দোবস্ত। হুইস্কি, মিনারেল ওয়াটারের বোতল, ছোট ছোট প্লাস্টিক গ্লাস সবই ঝোলায় মজুত। সুধন্যর হয়ে অনিমেষই ঢালছে এখন, দিচ্ছে হাতে হাতে। ঋতি নেব না নেব না করেও নিল। একটু আগে যাওয়ার পথে অনেকটাই গেলা হয়ে গেছে, খুব দ্রুত, জল ছাড়াই। নিয়মিত পানের অভ্যেস নেই তার, মাথা ভালই ঝিমঝিম করছে। ভেবে পাচ্ছে না আবার খাওয়া উচিত হবে কিনা। ঢক করে ঢেলেই দিল গলায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে সুধন্য। ফুরফুরে মেজাজে বলে উঠল,—আজ কিন্তু বেশ থই থই গ্যাদারিং হয়েছিল।

বিজন বলল,—ইন্দ্রনীল আর গৌতমকে লক্ষ করেছিলি? আর আমাদের নবীন কবি মাধবীলতাকে? তিনজনই কেমন চোখ লাল করে ঘুরছিল।

মাধবীলতার নাকি পাঞ্জাবির পকেটে কলকে থাকে।

সুধন্য ফুট কাটল,—কোন পকেটে বস? সাইড পকেটে, নাকি...?

—অ্যাই, নো ফাউল ইঙ্গিত।

অনিমেষ বলল,—ওদের বয়সে আমরাও কি কম গাঁজা টেনেছি? শালা দেবাশিসটা তো শ্মশানে যাওয়াও শুরু করেছিল। সাধুদের হাতে নোট গুঁজে দিয়ে কলকে কেড়ে নিত।

—ইশ, দেবাশিসকে এবার খুব মিস করছি। কেন এল না রে?

—কালও তো ফোন করেছিলাম। বলল, বউয়ের শরীর খারাপ।

—কোন বউ? সুধন্য খ্যাকখ্যাক হাসল,—তমালিকা অসুস্থ হলে তো দেবাশিসের না আসার কোনও কারণ নেই!

ধারা বলল,—আমি অ্যাকচুয়াল রিজনটা জানি। সম্পূর্ণাকে এখানকার কবির লিস্টে ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল। পারেনি। তাই বাবুর গোঁসা হয়েছে।

—ওই সম্পূর্ণাই ওকে ছিবড়ে করে ছাড়বে।

—এই সম্পূর্ণাকে একা দোষ দিস না তো। রেণু খরখর করে উঠল,—কে কাকে ছিবড়ে করে? দেবাশিস বিয়ের আগেও ইন্টু মিন্টু করেনি? সেই যে একটা ফতুয়া পরা শাঁকচুন্নিকে নিয়ে ঘুরত! শতভিষা, না বিবমিষা কী যেন নাম?

দেবাশিসের ঢুকঢাক প্রেমে পড়া নিয়ে চর্চা চলছে জোর। ঋতি কোনও মন্তব্য করছিল না। সোমদত্তও চুপ। একটা রহস্যময় খেলা চলছে নিঃশব্দে। ঋতি আর সোমদত্তর মধ্যিখানে জায়গা বেশ কম, অনবরত ঠোকাঠুকি লাগছে হাঁটুতে। সোমদত্তর হাঁটু যেন একটু বেশি সময় ধরে ছুঁয়ে থাকছে তাকে, ঋতি টের পাচ্ছিল। স্পর্শটা কি বিরক্তিকর? নাকি উত্তেজক? ঋতি বুঝতে পারছিল না। গাড়ি একটা গর্তে পড়ল, ঋতির হাত আপনা-আপনি খামচে ধরল সোমদত্তর হাঁটু। একটু বুঝি বা উরুর গভীরে পিছলে গেল হাতটা। সোমদত্ত যেন কেঁপে উঠল, চেপে ধরেছে ঋতির কব্জি। ধরেই আছে। সোমদত্তর হাত বড় বেশি তপ্ত। ঋতি সরিয়ে নিল হাত। অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে চোখ ফিরিয়েছে জ্যোৎস্নায়, কিন্তু ঋতির ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে সোমদত্ত তার দিকেই নিষ্পলক তাকিয়ে। ঋতির হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাচ্ছিল। শব্দ বাজছে, ডুবডুব ডুবডুব।

ব্যাগ খুলে সিগারেট বার করল ঋতি। পিছনে হাওয়ার তেমন উৎপাত নেই, লাইটার জ্বালিয়ে ধরাল সিগারেট। কাঁপা কাঁপা হাতে টান দিচ্ছে। মাথায় মৃদু দুলুনি। দুর, হুইস্কিটুকু এখন না খেলেই হত।

ঋতির দেখাদেখি অনেকগুলো সিগারেট জ্বলে উঠেছে একসঙ্গে। অনিমেষ

ধরাল এক জোড়া, একটা ঠুসে দিল সুধন্যর ঠোঁটে। রেণু আর সোমদত্ত অধূমপায়ী, তবে রেণু জানলার ধারে, ধোঁয়ায় তার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না, একা সোমদত্তই যা অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। নাক কুঁচকোচ্ছে বার বার, দু'হাত নেড়ে নেড়ে তাড়াচ্ছে ধোঁয়া। ঋতি এতক্ষণে বেশ মজা পেল। জোর জব্দ হয়েছে ছোকরা, ইচ্ছে করে মুখ এগিয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া ছড়াচ্ছে ঋতি। জোরে জোরে ফুঁ দিচ্ছে সোমদত্ত। শহর এসে গেল।

বোলপুর মোড়ে এসে সুধন্য গাড়ি বাঁয়ে ঘোরাল। জিজ্ঞেস করল,—কী রে, একবার রতনকুঠিতে ঢুঁ মেরে আসবি নাকি?

—এত রাতে? পৌনে এগারোটা বাজে!

—কীই বা রাত! হেমন্তদারা নিশ্চয়ই এখনও ঘুমোননি। একবার মোলাকাত করে আসি চল।

সিংহসদনে দু'-চারজন প্রথিতযশা কবিও এসেছিলেন আজ। তাঁদের মধ্যে হেমন্ত ঘোষাল আর সুধাবিন্দু শীল রতনকুঠিতে উঠেছেন। তখন কবিতাপাঠের আসরে তাঁদের সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা হয়নি, সুধন্যর মতো ধারা রেণু বিজনদেরও ইচ্ছে একবার সেখান থেকে ঘুরে আসার।

ঋতিই বাদ সাধল,—কলকাতায় তো যথেষ্ট দেখা হয়। এখন গিয়ে উপদ্রব করার কোনও দরকার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সোমদত্তও সায় দিয়েছে,—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাঁরা এখন কোন দুনিয়ায় আছেন তার ঠিক কী!

রেণু বলল,—মুক্তিদিও তো আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আসি।

—আহা, সে বেচারার শরীর খারাপ। গিয়ে দেখবি বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে ফস ফস স্প্রে নিচ্ছেন। ভাল লাগবে?

অগত্যা ফেরো আপন ডেরায়। পূর্বপল্লির গেস্ট হাউসে।

ঋতিরা উঠেছে অতিথিশালার দোতলায়। কলকাতা থেকে আগত অধিকাংশ কবির জন্য এখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছে উদ্যোক্তারা। সাত মহিলা কবির জন্য বরাদ্দ দুটো ঘর, বাকিগুলো পুরুষদের।

ওপরে এসে সুধন্য গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল,—তবে কাল সকালে দেখা হচ্ছে?

ধারা বলল,—আমার সঙ্গে হবে না। আমি ভোরেই রওনা দেব। পরশু জার্মানি থেকে তিন সাহেব আসছে আমাদের প্রোজেক্ট দেখতে। এখনও গুচ্ছের পেপারওয়ার্ক বাকি, কাল গিয়ে সারব।

অনিমেষ বলল,—আমিও কাল অফিস ডুব মারতে পারব না রে।

বিজন হাত তুলল,—আমিও লাইনে আছি। সকালে ফাস্ট প্যাসেঞ্জারটা ধরব। এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে বিকাশভবনে পৌঁছতেই হবে।

সুধন্য বলল,—তা হলে গল্পটা কী দাঁড়াল? আমরা যতজন গাড়িতে এসেছিলাম, ততজনই গাড়িতে ফিরছি। নো এক্সট্রা লোড। ফাইন।

—গাড়ি বাঁচাচ্ছিস বলে কি হুইস্কিও বাঁচাবি? অনিমেষ আলগা থাপ্পড় মারল সুধন্যর পিঠে, —চল চল, বোতলটা শেষ করি।

—আর ওসব কেন? সোমদত্ত ক্ষীণ আপত্তি জুড়ল,—আমরা এখন ঋতিদের ঘরে বসে একটু আড্ডা মারতে পারি না?

ধারা ব্যাগ খুলে রুম-কি বার করছিল। কটমট চোখে বলল,—বহুৎ মস্তি হয়েছে, আর নয়। শিং লাগিয়ে গোরুদের দলে ঢুকেছ বলে তুমি এমন কিছু বড় হয়ে যাওনি। যাও বাচ্চা ছেলে, ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

সোমদত্তর মুখ চুন। দাঁড়িয়ে আছে করিডোরে। ঋতি হালকা ধমক দিল,—কী রে, যা। সুধন্যরা তো চলে গেল!

ঋতির দিকে একটা করুণ দৃষ্টি হেনে হাঁটা লাগিয়েছে সোমদত্ত। ঠোঁটে হাসি টেনে ঋতি বলল, —ছেলেটা একটু পাগলা আছে।

ধারা ফস করে বলে উঠল,—যারা পাগল নয় তাদের তো এটা খেয়াল রাখা উচিত।

ইঙ্গিত অতি প্রাঞ্জল। সোমদত্তর দুর্বলতার খবর যে মোটামুটি চাউর হয়ে গেছে, ঋতি বুঝতে পারে। কিন্তু ঋতি কী করবে? সোমদত্ত এখনও তেমন কোনও আচরণ করেনি যাতে সে সোমদত্তর সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারে। কারুর স্তুতি, কারুর মুগ্ধতা গ্রহণে কি অপরাধ আছে কোনও? তা ছাড়া সোমদত্ত তার উপকারী বন্ধু, তাকে সে অনেকটাই অনুভব করতে পারে, এও তো ঋতিকে মাথায় রাখতে হবে।

তবে ধারাকে এত ব্যাখ্যান ঋতি দিতে যাবে কেন? মানুষ মনে মনে যদি কিছু ধারণা খাড়া করে নেয়, যুক্তি দিয়ে সব সময়ে কি তা খণ্ডানো দরকার?

ঘরে এসে ঋতি পোশাক বদলে নিল। ধারা আর রেণুও গলিয়ে নিয়েছে নাইটি। বসেছে যে যার শয্যায়। ব্যাগ গোছাচ্ছে। মাত্র এক দিনের জন্য আসা, তবু গোটা দুয়েক করে শাড়ি সালোয়ার স্যুট তো আছেই। প্রসাধনীও আছে অল্পস্বল্প। ঋতি নিজের কবিতার বই দুটো কিটব্যাগের তলায় চালান করে সালোয়ার কামিজ বার করে রাখল। গাড়িতে কাল এটাই পরবে। নাইট

ক্রিমটাও হাতে নিয়েছে। মাখবে শোওয়ার আগে।

ধারা সুইচবোর্ডে মশকনিবারণী যন্ত্র লাগিয়ে ফেলেছে। ঝামর ঝামর চুল দুলিয়ে বলল,—আমি বাবা মশারি টাঙিয়ে শুতে পারব না। আমার দম আটকে আসে।

রেণু ক্লেনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছিল। বলল,—আমার কাছে কয়েলও আছে। জ্বালিয়ে দেব?

—প্রয়োজন নেই। জানলা বন্ধ রাখছি, ফুলস্পিডে ফ্যান চলবে... কী রে ঋতি, ঠিক আছে তো?

ঋতির সংক্ষিপ্ত উত্তর,—হ্যাঁ।

চার শয্যার কামরা। ধারা চতুর্থ বিছানায় চলে গেল। মোবাইল বার করে ফোন করছে।

ঋতির মাথা ঝিমঝিম বাড়ছিল। বাথরুমে গিয়ে মুখে ঘাড়ে জল ছেটাল ভাল করে। বেরিয়ে তোয়ালেতে চেপে চেপে মুছছে মুখ।

ধারা ফিরল নিজের শয্যায়। কপট রাগ দেখিয়ে বলল,—কী লোক রে! এখনও অফিসে বসে আছে!

রেণু জিজ্ঞেস করল,—কে? তোর বর?

—আর কে। মার্চ মাস পড়েছে, এই ওর খেল শুরু হল। এখন গোটা ইয়ার এন্ডিং-এর মাসটাই মাঝরাত করে ফিরবে। কেন যে মরতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিয়ে করেছিলাম!

—হল্লা করিস না কেন? সাফ বলে দিবি, এত অফিসবাজি চলবে না।

—কী করবে বল? ওর উপায়ও তো নেই। কোম্পানি তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছে, রক্ত চুষে নেবে না? সারা বছরই তো হিল্লি দিল্লি চরকি খাইয়ে মারে। তাও এই একটা মাস ঘরের ভাত যা একটু খেতে পায়।

বরের দুঃখে ধারার এত চোখ ছলছল? ঋতি তো একটু অন্যরকম শুনেছিল! ধারার ডোন্টকেয়ার লাইফ নিয়ে বর নাকি চটে থাকে, দু'জনের মাঝে মাঝেই চুলোচুলি হয়!

ধারা বলে চলেছে,—আজ অবশ্য ওর সোনায় সোহাগা। আমিও নেই, মেয়েও বাড়িতে নেই...

—কোথায় গেছে টায়রা?

—মাসির বাড়ি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ, তার তো এখন প্রজাপতির মতো ওড়ার সময়। বললাম, ছোট্ট একটা কম্পিউটার কোর্স করে নে, শুনলই না।

বাবাকে ধরেছে আগে পিসি এনে দেওয়ার জন্য। নিজে নিজেই নাকি পিটিয়ে শিখবে।

—আমার তো কম্পিউটার কিনে জ্বালা হয়েছে। সারাক্ষণ গেমস খেলে যাচ্ছে বাবাম। রেণু ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—তিনি যে আজ এগজামে কী করলেন!

—সে কী? বাবামদের অ্যানুয়াল এখনও শেষ হয়নি?

—আজই লাস্ট। তাই না আসতে পারলাম। আজ অঙ্ক ছিল।

—তা হলে টেনশন করছিস কেন? বাড়িতে তোর অঙ্কের পিএইচ-ডি...

—সে থোড়াই ছেলের অঙ্ক দেখে! বসে বসে পেপার তৈরি করবে, ইউরোপ আমেরিকার জার্নালে পাঠাবে... ছেলের অঙ্কর দিকে ফিরেও তাকায় না। সে দায়িত্ব নিলে ছেলের পেছনে আমায় অঙ্কের টিউটর লাগাতে হয়? আমি ইংরিজির লোক, কই ইংরিজির মাস্টার তো রাখিনি। নিজেই পড়াই। কলেজে ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রাণপাত করব, কিন্তু বাড়িতে নিজের বাচ্চার পড়া দেখব না, ইটস বিয়ন্ড মাই প্রিন্সিপল।

—বাবামের ক্লাস নাইন হচ্ছে, না রে?

—সেই জন্যই তো চিন্তা। অঙ্কের ভিত কাঁচা রয়ে গেলে গোটা ফিউচারই তো ঝরঝরে। জয়েন্টে ভাল র‍্যাংক করতে পারবে?

সুখী সংলাপ চলছে একটানা। নাকি নিজেদের সুখী প্রতিপন্ন করার সংলাপ? যাই হোক না কেন, ঋতির তো ওই জগতে প্রবেশাধিকার নেই। ঋতি শুয়ে পড়ল, আড়াআড়ি হাতে চোখ ঢেকে। আজ রাজমিস্ত্রি কত দূর কী করল কে জানে! দু' দিনের মধ্যে পলেস্তারা খসানোর কাজটা হয়ে যাবে কি? সোমবার থেকে প্লাস্টারিং শুরু করতেই হবে। ওহো, সোমবার তো হবে না, সেদিন তো আবার দোল। আচ্ছা, দেওয়ালের কালারটা কী করবে? মিল্ক হোয়াইট? নাকি লেমন ইয়েলো? করবীদি বলছিল মাখন রংটা খুব সুদিং হবে। উডওয়ার্কে যা এস্টিমেট দিল, সে তো মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। প্রায় ষাট হাজার! নাহ্, গয়না কিছু বেচতেই হবে। খুব ইচ্ছে ছিল এসি বসিয়ে নেওয়ার, এখন আর হল না। দেখা যাক, নেক্সট সামারে যদি...। টাকাও তো শুধতে হবে।

রেণু ঠেলছে ঋতিকে,—এই মায়াবিনী, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

ঋতি চোখ থেকে হাত সরাল, —নাহ্।

—ভাবছিসটা কী? বরের কথা?

ঋতির ঠোঁটে শ্লেষ—হ্যাঁ, আমি তো সারাদিন বরের কথাই ভাবি।

—ও কথা বললে হবে? তোমাদের দু'জনে খুব প্রেম, আমি সব খবর পাই।

—কী গুপ্ত সমাচার পেলি?

—তোমার বর নতুন মায়াবিনীর জন্য টাকা দিয়ে গেছে। কড়কড়ে তিন লাখ।

—সে না দিলে পাব কোত্থেকে? আমার কি টাকার গাছ আছে? আমার তো তোদের মতো চাকরিও জোটেনি।

—অতশত বুঝি না। তবে আমি তিন লাখ চাইলে, আমার বর ঘেঁটি ধরে সদর দরজা দেখিয়ে দিত।

ঋতি হাসল একটু। বলল না, শুভময়ের সঙ্গে তার সে সম্পর্কও নেই। মুখের ওপর না বলতেও তো একটু নৈকট্যের প্রয়োজন, না কি?

রেণু ফের খোঁচাচ্ছে, অ্যাই, তোর বুটিকের ভাবনা ছাড়। আমাদের কো-অপারেটিভের কী হবে?

—কী আবার হবে। ঋতি উঠে বসল,—জমি পেলে বাড়ি হবে।

—কী জানি, আমার তো মনে হচ্ছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এখনই ঝড় উঠবে... অথচ আমরা এখনও একটাও নদী পার হতে পারিনি।

—তুই কি দেবাশিসের কথা বলছিস?

ধারা মন দিয়ে মুখে লোশান ঘষছিল। ঝট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,—দেবাশিস তোদের ঋদ্ধিতেও ক্যাচাল বাধিয়েছে?

—আর বলিস না। জটিল ত্রিভুজ। দেবাশিস-অলকানন্দা-সম্পূর্ণা।

—দেবাশিসের কি অলকানন্দার সঙ্গেও কিছু চলছে?

ঋতি মনে মনে বলল, চলছে তো বটেই। তবে লটঘট নয়, বক্সিং।

রেণুই কৌতূহল মেটাচ্ছিল ধারার। সেই সংক্ষেপে শোনাল ঘটনাটা। শুনেই ধারার চটজলদি টিপ্পনী,—দেবাশিসটা একটা স্ট্যান্ডিং নুইসেন্স। এখন দ্যাখ তিনজনকেই কী করে অ্যাকোমোডেট করা যায়।

ঋতি বলল,—আমিই ভাবছি কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেব।

—কেন ওওও? রেণু হাঁ হাঁ করে উঠল,—তোর এত উৎসাহ, তুই না থাকলে...!

—এক্ষুনি এক্ষুনি টাকার প্রেশার নিতে পারব না রে। একে তো লোন টোন করতে হয়েছে, তার ওপর আবার যদি...। বাড়িঘর পরে হবে, দোকানটা তো আগে করি।

—আরে বাবা, কো-অপারেটিভে টাকা দেওয়ার তো কোনও তাড়াহুড়ো নেই, সময় সুযোগ মতো দিবি।

—সে বললে কি হয়? দৃষ্টিকটু বলে তো একটা কথা আছে। কখনও যদি টাকার জন্য কাজ আটকে যায়, তোরাই হয়তো আমার দিকে আঙুল দেখাবি।

ঋতি মুখে এই রকম একটা যুক্তি খাড়া করছিল বটে, তবে মনে মনে অন্য একটা ভাবনাও ক্রিয়া করছিল তার। দেবাশিসের চারিত্রিক দুর্বলতা থাক আর যাই থাক, সে ঋতির একটা বড় উপকার করেছে তো। একটা প্রতিদান দেওয়া তো ঋতির কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। সে একতরফা ঋণী হয়ে থাকতে চায় না কোথাও। কারুর কাছেই।

ধারা সিগারেট ধরিয়েছে। ঋতিকেও দিল। টুকটাক গল্প চলছে। আজ কবিতা পাঠের আসরে ভাল মতন জনসমাগম হওয়ার আগেই পর পর তিনটে মেয়েকে কবিতা পড়তে হল, ধারা তাতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এ কি এক ধরনের লিঙ্গবৈষম্য নয়? বিজনের কবিতার ধার কেমন মরে আসছে, তাই নিয়েও আলোচনা হল একপ্রস্থ। মাধবীলতা কী সেয়ানা, প্রেস ছবি তোলার সময়ে ঠিক কেমন হেমন্তদা সুধাদার মধ্যিখানটিতে গিয়ে দাঁড়াল...

রেণু হাই তুলছিল ঘন ঘন। বালিশে মাথা রেখে হঠাৎই করুণ গলায় বলে উঠেছে,—অ্যাই, তোরা আমায় সারা রাত্তির র‍্যাগ করবি নাকি রে?

ধারা চোখ ঘোরাল,—মানে?

—তোরা যদি এরকম বন্ধ ঘরে সিগারেট খাস, আমি ঘুমোতেই পারব না। রাত্রে আমি সুব্রতকেও ঘরে সিগারেট ধরাতে দিই না।

—একটা জানলা খুলে দেব?

—থাক।... আর খাস না, প্লিজ।

রেণুর মিনতির ভঙ্গিতে ধারা আর ঋতি হেসে ফেলেছে। জোরে জোরে গোটা কয়েক টান মেরে নিবিয়ে দিল সিগারেট। ঢকঢক জল খেয়ে যে যার বিছানায়। ধারা সুইচ অফ করে দিয়েছে, ঘরে নিকষ অন্ধকার।

ঋতি ঘুমিয়েছিল অন্ধকারে, ঋতির ঘুমও ভাঙল অন্ধকারে। অনভ্যস্ত পরিবেশে নিদ্রা গাঢ় হয়নি, তাই বুঝি ছিঁড়েও গেল তাড়াতাড়ি।

বালিশের পাশ থেকে রিস্টওয়াচটা টানল ঋতি। জ্বলজ্বল করছে তরল স্ফটিক। চারটে বত্রিশ। ফাল্গুনের এ সময়ে আলো তো ফুটে যাওয়ার কথা!

পেনসিল টর্চ জ্বেলে ঋতি বাথরুমে এল। হ্যাঁ, আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে বটে। ঘরে ফিরে শুল না আর, পায়ে পায়ে জানলায় এসেছে। পশ্চিমের বাতায়ন, খুলতেই আঁজলাভরা নরম বাতাস। ভুবনডাঙার মাঠ মিহি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে অলস। অদূরে সবুজ গাছগাছালি। উঁহু, এখনও যেন তত

সবুজ নয়, পলাশ কৃষ্ণচূড়ার লালও ফিকে ফিকে লাগে। পাখি ডাকছে একটা দুটো। ডানা ঝাপটে জানলা ছুঁয়ে কোন পাখি উড়ে গেল? পাপিয়া? একটা অচেনা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে না? কী ফুল? নাকি এ ভোরেরই সৌরভ?

সহসা ঋতির বুক শিরশির। এমন মায়াবী ভোর কতকাল দেখেনি সে! বেরিয়ে পড়বে? ছুঁয়েছেনে গায়ে মেখে আসবে ভোরটাকে?

নাইটি ছেড়ে ঋতি সালোয়ার কামিজ পরে নিল। ধারা আর রেণু গভীর ঘুমে। কাঁধে দোপাট্টা ফেলে পা টিপে টিপে বেরোতে গিয়েও ঋতি ঘুরে এসেছে। ঝাঁকাচ্ছে ধারাকে,—অ্যাই? অ্যাই? উঠবি না?

ধারার স্বর জড়ানো, —কটা বাজে?

—তা ধর, পৌনে পাঁচটা। তুই বেরোবি তো?

—আহ্, দেরি আছে। ছটা চল্লিশে ট্রেন। আরও আধঘণ্টা পরে...

—আমি একটু হাঁটতে যাচ্ছি।

—উমমম্। ঠিক আছে। আমি উঠে পড়ব।

দরজা আলতো ভেজিয়ে ঋতি সোজা রাস্তায়। আর একটু ফুটেছে দিন, পাখিরা জেগেছে পুরোপুরি। প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটার আড়াল থেকে সেই পাপিয়াটাই বুঝি ডেকে উঠল, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা!

ফুসফুসে সতেজ বাতাস ভরে নিয়ে হাঁটছিল ঋতি। মাঠ পার হয়েই থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে সোমদত্ত! উদাস তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঋতি কাছে এগোল, —কী রে, কী দেখছিস?

সোমদত্ত ভীষণ চমকেছে। বুঝি বা অত্যাশ্চর্য কিছু চোখে পড়েছে, এভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক পল। তারপর অস্ফুটে বলল, —তুমি?

—তুই কী করছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

—আকাশটার কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। গিরগিটির মতো রং বদলাচ্ছে।

—কী উপমার ছিরি! ঋতি মুখ বেঁকাল। হাঁটতে হাঁটতে বলল,—তুই কি মর্নিংওয়াক করিস রেগুলার? এত ভোরে উঠেছিস যে?

—আমি ভোরেই উঠি। পাশে পাশে চলছে সোমদত্ত,—ভোরবেলাটাই আমার লেখার টাইম। মাথা খুব ফ্রেশ থাকে।

—তুই তো দেখি খাঁটি পোয়েট! আমাদের মতো ভেজাল নও!

—তুমি তো ভেজাল নও ঋতি। তুমি ভোরের চেয়েও শুদ্ধ।

ঋতি হেসে ফেলতে গিয়েও গম্ভীর হল,—কথায় কথায় এত কাব্য করিস কেন রে?

সোমদত্ত জবাব দিল না। উল্টে প্রশ্ন করল,—তোমরা কাল কখন ঘুমোলে?

—ঘড়ি দেখিনি। হবে বারোটা, সাড়ে বারোটা।

—আমি কাল রাত দুটো অব্দি জাগা। ঘুমই আসছিল না।

—কেন?

—এরকম হয় মাঝে মাঝে। চোখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকলেও...। হয়তো কোনও মুখ... অথবা কোনও মুহূর্ত...। তোমার এমন হয় না?

এক সময়ে যে কত রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে ঋতি। চোখের পাতা বন্ধ করলেই দেখতে পেত সেই ছবিটা। মুনিয়াকে নিয়ে দীর্ঘ পায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে শুভময়...!

এমন পেলব ভোরে দৃশ্যটাকে অবশ্য মনে প্রবিষ্ট হতে দিল না ঋতি। তরল গলায় বলল, —আমি তো বিছানায় ধপাস, তারপর দু'মিনিট এপাশ ওপাশ, দেন খালাস।

—জানতাম।

—কী জানতিস?

—তুমি এই উত্তরটাই দেবে।

ঋতি চোখের কোণে দেখল সোমদত্তকে। মাথা নিচু করে হাঁটছে ছেলেটা। উত্তরায়ণ বাঁয়ে ফেলে পৌঁছেছে শ্যামবাটি, এটুকু পথ কথাই বলল না কোনও। দু'পাশের দোকানপাট বন্ধ এখন, লোকজনও চোখে পড়ে না তেমন। কাল বিকেলেও জায়গাটা গমগম করছিল, এখন নিঝুম। নিঃসাড়।

ঋতি জিজ্ঞেস করল,—এই, আমরা কোথায় যাচ্ছি রে?

সোমদত্ত আনমনা ভাবে বলল, সামনে। টুওয়ার্ডস ফিউচার।

—ফাজলামি রাখ। এটাই কি খোয়াই যাওয়ার রাস্তা?

—কোথায় যাচ্ছ না জেনে তুমি বুঝি হাঁটো না? আমি তো অন্যরকমই ভেবেছিলাম।

—কী ভেবেছিলি শুনি? আমি পাগলির মতো যেদিকে সেদিকে ছুটে বেড়াই?

—তা নয়...। তবে...।

সোমদত্ত থেমে গেল। থেমেই রইল। লোকালয় পেরিয়ে আত্মমগ্ন ভাবে চলছে নিঃশব্দে। দু'পাশে এখন আছে ঘরবাড়ি, তবে খানিক তফাতে তফাতে। শুরু হয়ে গেছে সোনাঝুরির মিছিল। মাঝে মাঝে আমলকী, কাঠবাদাম। হঠাৎ হঠাৎ শালগাছও এসে যায় পাশে। আলোর স্পর্শে পাতার রং উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ, বাড়ছে সবুজের ঘনত্ব।

ঋতির এত নৈঃশব্দ্য সহ্য হচ্ছিল না। বলে উঠল,—ভোরবেলার একটা পিকিউলারিটি লক্ষ করেছিস?

সোমদত্ত বলল,—উঁ?

—ভোরবেলার কথা বলছি। ভোরের বিশেষত্বটা কী বল তো? গাছ, পাতা, এই থোকা থোকা সোনাঝুরি ফুল, সব কিছুর কালার কেমন ফেড লাগে না?

সোমদত্ত শান্ত স্বরে বলল,—কারণ, ভোর মানে যে স্রেফ একটা সম্ভাবনা ঋতি। রংগুলো আস্তে আস্তে কতটা উজ্জ্বল হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত। কিন্তু আদৌ রং উজ্জ্বল হবে, না মলিন, তা কিন্তু নির্ভর করে বাকি দিনটার ওপরে। অর্থাৎ একই ধরনের সম্ভাবনা থাকলেও আলটিমেটলি কালারটা যে ঠিকঠাক উদ্ভাসিত হবে, তার কিন্তু কোনও নিশ্চয়তা নেই। হয়তো দিনটা পরে মেঘলা হয়ে গেল, কিংবা ধরো...

—ওফ্, এত প্যাঁচ করে উত্তর দিচ্ছিস কেন? একটা সিম্পল কোশ্চেন...

—তুমি সহজ প্রশ্নের সরল উত্তর দাও? দেবে?

—কী, ঋতি ঈষৎ কেঁপে গেল,—কী তোর প্রশ্ন?

—তোমার আর শুভময়বাবুর সম্পর্ক তো মরে গেছে। এখনও কঙ্কালটা বইছ কেন?

—মরেই গেছে তুই বুঝলি কী করে?

—তা হলে একটা গল্প বলি। মন দিয়ে শোনো। চিড়িয়াখানায় একটা বনমানুষের বাচ্চা মা'র কোলে মরে গেছিল। মা'টা টের পায়নি, মরা বাচ্চা কোলে করে বসে থাকত। কেউ বাচ্চাটাকে কাড়তে গেলে হঁ হঁ করে তেড়ে যেত। বেশ কয়েক দিন পর যখন বাচ্চাটাকে জোর করে ছাড়িয়ে নেওয়া হল, কী দেখা গেল জানো? বুকের যে জায়গাটায় বাচ্চাটাকে চেপে রাখত, সে জায়গাটা টোটাল পচে গেছে। সোমদত্ত বড় করে একটা শ্বাস ফেলল,—শেষ পর্যন্ত মা'টাকেও বাঁচানো যায়নি।

ঋতি দাঁড়িয়ে পড়ল,—তুই কী বলতে চাইছিস?

জবাব না দিয়ে সোমদত্ত নেমে গেল মোরাম বেছানো রাস্তা ছেড়ে। সামনে ছোট্ট একটা সেতু, নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ময়ূরাক্ষীর খাল। শীর্ণ স্রোত। খানিক দূরে খোয়াই। পাথুরে মাটির বিচিত্র ভাঙচুর। ভয়ংকর, কিন্তু সুন্দর।

অনেকটা চলে গিয়ে খোয়াই দেখছিল সোমদত্ত। ঋতিও বেভুল পায়ে এসেছে পিছন পিছন। নিথর শালবন ভেদ করে। না, খোয়াই দেখছিল না ঋতি। সোমদত্তর কথাগুলো হাতুড়ি পিটছে বুকে। কী ইশারা করে সোমদত্ত?

নির্জন ভোরকে চমকে দিয়ে ঋতি চেঁচিয়ে উঠল—অ্যাই, উত্তর দিলি না যে?

সোমদত্ত ঘাড় ঘোরাল। এক পা এক পা করে কাছে এসেছে। আরও কাছে। ঋতির চোখে চোখ রেখে কেটে কেটে বলল,—মরা বাচ্চাটাকে বয়ে বেড়ালে তুমি পচে যাবে ঋতি।

ঋতি হিসহিসিয়ে উঠল,—চুপ কর। তুই একটা বাচাল।

খপ করে ঋতির দু' কাঁধ চেপে ধরল সোমদত্ত। মুখ নেমে এল ঋতির মুখে। চুমু খেল, অনেকক্ষণ ধরে।

ঋতি সাড়াও দিল না। ছাড়ালও না নিজেকে। কাঁপছে অল্প অল্প। কে কাঁপে? ঋতি? না মাটি?

সোমদত্ত গাঢ় স্বরে বলল,—আমি তোমায় বাঁচাতে চাই ঋতি। তোমায় আমি ভালবাসি।

বুঝি বা কয়েক লহমা বিমূঢ় দাঁড়িয়ে ছিল ঋতি। তারপর নিজেই আচমকা টেনে নিয়েছে সোমদত্তকে। নিজে থেকেই চুমু খাচ্ছে এবার। তীব্র ভাবে শুষে নিচ্ছে সোমদত্তর ঠোঁট। টের পাচ্ছে, সোমদত্তর হাত ঘুরছে তার শরীরে। পীড়ন করছে তার স্তন, অস্থির হাত নেমে এল নাভিমূলে...

ঋতি বাধা দিচ্ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনও সুখানুভূতি হয় না কেন? উত্তেজনাও কেন জাগে না শরীরে? এত খিদে, তবু কেন স্বাদ পায় না?

আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করল ঋতি। নাহ্, তার দেহতন্ত্রী অন্য কথা বলছে। সোমদত্ত নয়, সোমদত্ত নয়।

চোদ্দো

ভবানী ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল,—এখন কি সুস্থ বোধ করছেন স্যার?

নিমীলিত চোখে শুভময় বলল,—উঁ?

—আর মাথা ঘুরছে না তো?

—নাহ্।

—ডাক্তারবাবুকে একটা কল দিই স্যার? মিত্তির ডাক্তার... ধন্বন্তরি...। নাড়ি টিপেই রোগ ধরে ফেলেন।

—দরকার নেই। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

—আপনার মুখচোখ কিন্তু এখনও ভাল নয় স্যার। প্রেশারটা একবার

পরীক্ষা করিয়ে নিন। অনেক সময়ে রক্তচাপের ওঠানামাতে এমনটা হয়।

—আহ্ ভবানী, বলছি তো কিছু হয়নি। আমার প্রেশার নরমালই থাকে।

—তবু সাবধানের মার নেই। একা একা থাকেন...কখন কী হয়ে যায়...। দুপুরে তো আজ কিছু খেলেন না। তাতেই হয়তো পেটে গ্যাস হয়েছিল। কুপিত বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে ধাক্কা মেরেছে মাথায়। ডাক্তারবাবু একবার দেখে গেলে...।

—তুমি থামবে? শুভময় খিঁচিয়ে উঠল,—বলছি তো ডাক্তার ফাক্তার আমার লাগবে না। তুমি যাও, বাড়ি যাও।

ভবানী তবু অনড়। সে বুঝি সত্যিই ঘাবড়েছে। তার সাহেবের আজ হলটা কী? সকাল থেকেই মেজাজ টং-এ চড়ে ছিল সাহেবের। ভবানীর আসতে দশ মিনিট দেরি হয়েছিল বলে চটে আগুন। চা-দোকানের বাচ্চাটা চায়ে সামান্য চিনি বেশি হওয়ার অপরাধে কড়া ধমক খেল দুপুরে। এজলাসে বসে থাকাকালীনও সাহেবের স্বর উচ্চগ্রামে উঠে যাচ্ছিল বার বার। নিলয় পরেশ কে না আজ ধাতানি খেয়েছে। ছুটির পর পরেশকে তো চেম্বারে ডেকে যাচ্ছেতাই বকাবকি। হটুগঞ্জের এক মাস্টারমশাই স্কুল কর্তৃপক্ষের গা-জোয়ারিতে কাজে যোগ দিতে পারছে না, সেই মামলার পরবর্তী তারিখ পরেশ নাকি দেড় মাস বাদে ফেলেছে, তাতেই সাহেব চটে লাল। যা নয় তাই শুনতে হল পরেশকে। —অনেকদিন ধরে আপনার খেলা দেখছি, আর কিন্তু আমি সহ্য করব না! কোথায় কখন কী ভাবে ফেঁসে যাবেন জানতেও পারবেন না আপনি! তখনই ভবানীর কেমন খটকা লেগেছিল। তার সাহেব যতই রাগী হোন, কথায় কথায় খ্যাঁকখ্যাঁক করার মানুষ তো তিনি নন। নির্ঘাত সাহেবের শরীর আজ জুতে নেই। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাইই। কোর্ট থেকে বেরোতে না বেরোতেই একগাদা লোকের সামনে মাথা টলে গিয়ে...! ভাগ্যিস ভবানী আর রামপ্রসাদ তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছিল, নইলে মাথা ফাথা কেটে কী যে কেলেঙ্কারি হত! এত কিছুর পরও তার সাহেব ঠিক আছে বললে ভবানী মেনে নেবে?

শুভময় রুষ্ট চোখে তাকাচ্ছে এবার—কী হল? গেলে না?

—যাচ্ছি স্যার।

বলেও সুডুত করে অন্দরে সেঁধিয়ে গেছে ভবানী। তাপসীর সঙ্গে কথা বলছে। অনুচ্চ স্বরে। শুভময়ের ইন্দ্রিয় আজ অস্বাভাবিক রকমের টানটান, খর কানে শুনতে পাচ্ছিল প্রতিটি শব্দ।

ভবানী বলছে,—সাহেবের বাড়ি থেকে কোনও খারাপ খবর এসেছে নাকি রে?

তাপসী বলল,—জানি না তো। তেমন কোনও ফোন টোন তো কাল...!

—কাল শরীর টরির ঠিক ছিল?

—ঠিকই তো ছিল। খাওয়াদাওয়া করলেন...। না না, রুটি কাল কম খেয়েছেন। মাত্র দুটো। তবে অনেক রাত্তির অব্দি জেগে ছিলেন। লেখাপড়া করতে বসলেন... তারপর উঠে একবার এ ঘর, একবার ও ঘর... আবার বসছেন কাগজ কলম নিয়ে... একবার তো বাইরের বারান্দাতেও চলে গেলেন।

—অ। তার মানে না ঘুমোনো থেকেই...। আজ বেশি রাত জাগতে দিবি না। বলবি, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—ও বাবা, আমি কী বলব? উনি যদি রাগ করেন?

—তা হলে চোখে চোখে রাখবি। তেমন বুঝলে বসন্তকে ডাকবি।... ওফ্, রতনটাও আর বিয়ে করতে যাওয়ার সময় পেল না!

শুভময়ের বরদাস্ত হচ্ছিল না। ওই উৎকণ্ঠা ভেতরের দংশনটাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। চিৎকার করে ডাকল,—ভবানী?

দৌড়ে এসেছে ভবানী,—হ্যাঁ স্যার।

—কী গুজুর গুজুর হচ্ছে ওখানে? বললাম না তোমায় বাড়ি যেতে?

ভবানী আবার বলল, —যাচ্ছি স্যার।

—যাও।

এবার যেন আর দাঁড়ানোর সাহস পেল না ভবানী। ভেতর বারান্দার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রওনা দিয়েছে।

জুতোটা বাইরে খোলা হয়নি। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছিল শুভময়। মাথা না-তুলেই বুঝতে পারল তাপসী এসেছে ঘরে, হাতে জলের গ্লাস। তাপসীকে কিছুই বলতে হয় না, শুভময় কোর্ট থেকে ফিরলেই একের পর এক কাজ করে যায় তাপসী। নিষ্ঠাবতী সেবিকার মতো। প্রথমেই জল এনে রাখবে টেবিলে, জুতো সরিয়ে হাওয়াই চপ্পল সামনে দেবে, ব্রিফকেসও তুলে রাখবে যথাস্থানে। এর পর শুভময় ঘরে গিয়ে দেখবে খাটের বাজুতে রয়েছে ইস্ত্রি করা পাজামা পাঞ্জাবি। বাথরুমের রডেও ঝোলানো থাকবে শুকনো টাওয়েল। এমনকী আয়নার লাগোয়া র‍্যাকে শুভময়ের চিরুনিটাও সাজিয়ে রাখে তাপসী। মাত্র দশ বারো দিন হল এসেছে মেয়েটা, এর মধ্যেই এমন নিখুঁত ভাবে সংসারটাকে গুছিয়ে ফেলল! শুভময়ের ঘরদোর এত সুশৃঙ্খল আগে থাকত কি?

এই মুহূর্তে শুভময়ের অবশ্য অতশত মনে এল না। সোজা হয়ে গ্লাসটা নিল। জল খেল খানিকটা।

তাপসী মৃদু ভাবে বলল,—একটু লেবু চিনির শরবত করে দেব?

—কেন?

—না মানে... ভবানীদা বলছিল আপনার... আপনি...।

—তাতে শরবতে কী হবে?

—না... গরমটা পড়ছে তো, হয়তো তাত লেগে...।

—আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দাও। তোমাদের উতলা হতে হবে না।

শুভময়ের চাপা কাঠিন্যে যেন গুটিয়ে গেল তাপসী। একটুক্ষণ মাথা নামিয়ে রেখে বলল, —এখন কিছু খাবেন তো?

শুভময় উঠে শোওয়ার ঘরে যাচ্ছিল। বলল,—হুঁ।

—দুটো আলু-পরোটা ভেজে দিই?

নাক কুঁচকোল শুভময়, তবে আপত্তি জানাল না। বলল,—ভাজো।

ফাল্গুন ফুরোতে এখনও সাত-আট দিন বাকি। গরম পড়েছে কিছুটা, তবে অসহ নয়। বিকেল সন্ধেয় চমৎকার একটা মিঠে বাতাস ওঠে, দিনমানের উত্তাপ কোথায় পালিয়ে যায়। তবু বাথরুমে ঢুকে শুভময়ের মনে হল কান মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। স্নান করে নেবে? প্রখর গ্রীষ্ম ছাড়া তার দু'বেলা স্নানের অভ্যেস নেই, আজ নিয়ম ভেঙে দাঁড়িয়ে পড়ল শাওয়ারের নীচে। ওফ্, শরীর জুড়োয় না কেন? এখনও হল্কা ছড়াচ্ছে আজকের আদালতকক্ষ। বিচারের রায় শুনে ঝরঝর কেঁদে ফেলল দুর্জয় সামন্তর মেয়ে! দু'হাতে কপাল চেপে দুর্জয় বসে পড়ল ধপ করে! দুর্জয় সামন্তর কাঁধ বেড় দিয়ে তাকে কোর্টরুমের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে আশিসতরু! যেতে যেতে লোকটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল, চোখে তীব্র অবিশ্বাস! কী করবে শুভময়? তার তো হাত-পা বাঁধা। সে তো সাক্ষ্যপ্রমাণের বাইরে যেতে পারে না। অধীর মাইতি জড়িয়ে ধরল চন্দ্রচূড়কে! কৃতজ্ঞ মুখে শুভময়ের দিকে তাকিয়ে আছে চন্দ্রচূড়! ওই দৃষ্টিও তো শুভময়কে গিলতে হল!

শাওয়ারে আর তেজ নেই। জল পড়ছে ছিরছির। নির্ঘাত ঝাঁঝরিতে ময়লা এসেছে। শুভময় বিরক্ত মুখে ধারাস্নানের যন্ত্রটাকে দেখল ঝলক। হাত বাড়িয়ে ঝাঁকাল একটু। নাহ্, এ ক্লেদ যাওয়ার নয়। কোণের বেঁটে চৌবাচ্চাটা ভরা আছে, সেই জলই মগে তুলে গায়ে ঢালছে হড়াস হড়াস। সাবান মাখল। ঘসে ঘসে গা মাথা মুছে বেরনোর পর একটু বুঝি শীতল হয়েছে দেহ।

চুল আঁচড়ে বাইরের ঘরে বসতেই আলু-পরোটা হাজির। সঙ্গে কাচের বাটিতে টক-ঝাল আচার। শুভময় পছন্দ করে বলে টোম্যাটো সসের বোতলটাও। দুপুরে খিদের অনুভূতিটা যেন একদম উবে গেছিল, এখন পাকস্থলী যেন চাইছে কিছু। প্লেটে টোম্যাটো সস ঢালল শুভময়, পরোটায় মাখিয়ে মাখিয়ে খাচ্ছে। দু'-এক কুচি আচারও চুষল।

চোরা একটা বৈক্লব্য রয়েই গেছে ভেতরে। খেতে খেতেও টুকরো টুকরো ভাবনা পাক খাচ্ছিল। হঠাৎই শুভময়ের নজর আটকেছে অন্দরের দরজায়। তাপসীর মেয়েটা দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়তেই সাঁৎ করে সরে গেল। আবার উঁকি মারল, আবার পালাল। শুভময়ের সঙ্গে দিন কয়েক হল বেশ ভাব হয়েছে মানুর। সে কোর্ট থেকে ফিরলে মেয়েটা গুটিগুটি আসে কাছে। আধো আধো স্বরে কলকল করে যায়। বেশির ভাগ কথাই তার বুঝতে পারে না শুভময়, তবে শুনতে বেশ লাগে। শুভময়কে স্যার বলে ডাকতে শিখিয়েছে তাপসী, শব্দটা বেরোয় না ঠিকঠাক, থ্যাল থ্যাল করে। আজ মেয়েটা কাছে ঘেঁসছে না যে বড়? শুভময়ের শরীর খারাপ ভেবে তাপসী নিষেধ করেছে?

ছি ছি, কী বিশ্রী একটা সিন ক্রিয়েট করল সে আজ! তাও আবার প্রকাশ্যে! এত কীসের চিত্তবিক্ষেপ, যে চোখে আঁধার নামল? ঘুরে গেল মাথা? কী অনুচিত কাজটা করেছে সে? নিরপেক্ষ থাকারই তো চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সে কি দেখেনি মামলাটাকে? যাচাই করেনি আইনের ধারা, উপধারা? আর তার হাজারও রকমের বিশ্লেষণ? অতীতের কেস থেকে উদাহরণ ঘাঁটাঘাঁটিরও তো ত্রুটি রাখেনি সে। তারপরেও কেন বিবেক তাকে হুমকি দেবে?

না না, বিকেলের ওই সাময়িক অসুস্থতার সঙ্গে মামলাটার মোটেই কোনও সম্পর্ক নেই। মিছিমিছি মাথা খারাপ করছে শুভময়।

রিমোট টিপে শুভময় টিভি চালিয়ে দিল। খবর হচ্ছে। গত সপ্তাহে বাজেট পেশ হয়েছিল লোকসভায়, তারই কোনও বিষয় নিয়ে আজ জোর তর্কাতর্কি করেছে সাংসদরা, বিরোধীপক্ষ বেরিয়ে গেছে অধিবেশন ছেড়ে...। থাইল্যান্ডে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে মারা গেছে প্রায় দেড়শো মানুষ...। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন ভারত সফরে, বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে বিদেশমন্ত্রী উপস্থিত...। কলকাতায় আরও একটা নতুন উড়ালপুলের শিলান্যাস হল...

বাইরের গেটে আওয়াজ। কে? বসন্ত কি...?

—শুভময়দা? শুভময়দা?

সরোজের গলা। টিভি বন্ধ করে দরজা খুলল শুভময়,—আরে, এসো এসো।

শুভময়কে আপাদমস্তক দেখছে সরোজ,—বাহ্, এখন তো দেখি দিব্যি ফিট! তখন কী হয়েছিল হঠাৎ?

দ্যাখো কাণ্ড, গোটা টাউনেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে নাকি? এরপর কি বিপ্লব কিশলয়রাও চলে আসবে? ছোট শহরের এই জ্বালা, কিছুই বুঝি গোপন থাকে না।

শুকনো হাসল শুভময়,—আর বলো না। কোনও আর্লি সিম্পটম নেই, আনইজিনেস নেই, কোত্থেকে আচমকা ব্ল্যাকআউট। অবশ্য দু'-চার সেকেন্ড।

সরোজ বসেছে। কপালে ভাঁজ ফেলে বলল,—ডাক্তার দেখালেন?

—তুৎ, ও কিছু না। জাস্ট গ্যাস থেকে... এখন অ্যাবসোলিউটলি নরম্যাল।

—স্টিল... ব্যাপারটা ভাল নয় দাদা। একটা থরো চেকআপ করিয়ে নিন। অনেক সময়ে হার্টে ছোটখাটো ব্লকেজ ডেভেলাপ করলেও... ঘাবড়ানোর কিছু নেই, জাস্ট একবার দেখে নেওয়া।

হৃদয় যেদিকে চলতে বলেছিল, শুভময় তার বিপরীত পথেই হেঁটেছে। কিন্তু তাতেই কি হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতিতে প্রতিবন্ধকতা এসে যায়?

মাথা ঝাঁকিয়ে শুভময় বলল,—আরে না। হার্টফাটের কোনও ব্যাপার নয়।

—হতেই পারে। সিম্পল স্পন্ডিলোসিস হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে তার জন্যও তো দাদা ডাক্তারটা দেখানো দরকার।

—আচ্ছা সে দেখা যাবেখন। ছাড়ো। তোমার কথা বলো। বউ কেমন আছে?

—এমনি ভালই। তবে একটা পিকিউলিয়ার উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এখান থেকে যাওয়ার আগেও মাছ মাছ করে পাগল ছিল, বাপের বাড়ি গিয়ে মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারছে না। শুধু মাছ কেন, যে-কোনও আমিষেই অনীহা। মুরগি পাঁঠা যা দেখছে, ওর নাকি গা গুলোচ্ছে। ডিমটা তাও খাচ্ছে, তবে নাকি নাক টিপে।

শুভময় সামান্য রসিকতা করার চেষ্টা করল,—যাক, তোমার শ্বশুর শাশুড়ির খরচ কমছে।

—অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছে। মিষ্টি খাচ্ছে গাদা গাদা।

—বাহ্!

কথার মাঝেই তাপসী। নির্দেশ দিতে হয়নি, নিজে থেকেই কফি করে এনেছে দু'কাপ। সঙ্গে নোনতা বিস্কুট। সরোজ টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল তাপসীকে। সে চলে যেতেই বলল,—ও, মণিবউদি তা হলে এর কথাই বলছিলেন? ইউ আর ভেরি লাকি শুভময়দা, ঠিক ভাল ভাল লোক পেয়ে যান।

—এ ঠিক কাজের লোক নয়। চান্সে জুটে গেছে।

—জানি। মণিবউদির মুখে শুনেছি।...ইশ, এই মেনটেনেন্সের কেসটা যদি আমার কোর্টে আসত!

—তাতে তোমার কী লাভ হত? তোমার তো লোক রয়েছে।

—আহা, পল্লবী এলে বাচ্চার জন্য আর একটা তো রাখতেই হবে। জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো, যদি রাজি থাকে...। আপনার তো রতন ফিরে এলে আর লাগছে না।

—বলব। তবে মনে হয় না ও কোথাও পার্মানেন্টলি কাজ করবে। নিজের ব্যবসা আছে, বড়ি আচার টাচার বানায়...

—যাহ্, আমাদেরই পোড়া কপাল। সরোজ হা হা হাসল। বিস্কুটে কামড় দিয়ে বলল,—আপনার সেই জটিল ফোর নাইনটিএইট কেসের তো জাজমেন্ট হয়ে গেল আজ!

শুভময়ের রক্তস্রোত পলকের জন্য স্তব্ধ। প্রসঙ্গটা এসেই গেল? আলগোছে বলল,—হুঁ। প্রায় দেড় বছরের ওপর তো টানল।

—চন্দ্রচূড় চৌধুরীকে তো দেখলাম মহা খুশি। যাকে বলে বিমিং উইথ জয়। মনে হচ্ছিল যেন হারা কেস জিতে গেছে।

শুভময় আড়ষ্ট হয়ে গেল। হারা কেস জেতার কথা কেন বলল সরোজ? মনে মনে সরোজও কি ভাবছে, ভুল লোককে জিতিয়ে দিয়েছে শুভময়?

—যাক গে। সরোজ চুমুক দিল কফিতে,—এবারের বাজেটটা দেখলেন? আমাদের কেমন মেরে দিল! সেভিংসের ছাড়টা ঝাট করে কমে গেল ফাইভ পারসেন্ট! তার মানে সেকশান এইট্টিএইটেই আমরা তিন হাজার টাকা ঝাড় খেয়ে গেলাম। প্লাস, সারচার্জটাও তুলল না... কী অন্যায় বলুন, আমরা স্যালারিড পিপলরাই শুধু মুরগি হব?

সরোজের গজগজানি সেভাবে কানে যাচ্ছিল না শুভময়ের। একটাই চিন্তা পাক খাচ্ছে মস্তিষ্কে। সরোজ কেন বলল কথাটা? বলেই দুম করে অন্য প্রসঙ্গেই বা ঘুরে গেল কেন? কথাটায় সত্যিই কোনও ইঙ্গিত আছে কি? নাকি শুভময়ই অহেতুক পেঁচিয়ে ফেলছে?

আরও খানিকক্ষণ একাই বকে গেল সরোজ। ইনকাম ট্যাক্স, রেলের ভাড়াবৃদ্ধি, ফ্রিজ-টিভি-কম্পিউটারের মূল্যহ্রাস... বিষয় বদলে যাচ্ছে ঘন ঘন। ঘরে এখন তার বউবাচ্চা নেই, সুতরাং ফেরারও তাড়া নেই, উঠল প্রায় নটা নাগাদ। আর এক দফা কফি খেয়ে। যাওয়ার আগে ফের বলল,—সাবধানে থাকবেন শুভময়দা। রিলিং ব্ল্যাকআউট, এসব মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। অবশ্যই ডাক্তার কনসাল্ট করুন। লোকাল প্র্যাকটিশনারে যদি ভরসা না থাকে, তো কলকাতায় গিয়ে দেখিয়ে আসুন। বাট ডু ইট। আপনি মুখে যাই বলুন, আপনাকে কিন্তু একটু সিক সিকই লাগছে।

সরোজকে গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে এল শুভময়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরল না। পায়চারি করছে লনে। এলোমেলো। পরশু দোলপূর্ণিমা ছিল, আকাশে চাঁদ এখনও প্রায় বৃত্তাকার। হঠাৎই ঋতির উপমাটা মনে পড়ল শুভময়ের। মেডুসা! ওই দানবীর মতোই চাঁদ যেন তাকিয়ে আছে তার পানে। চন্দ্রকিরণ যেন খুঁজছে তার আঁতিপাতি। শুভময় দৃষ্টি সরিয়ে নিল। সরোজ ফরোজ যদি কিছু ভেবেও থাকে, শুভময়ের বয়েই গেল। শুভময় সব দেখে বুঝে তবেই তো রায় দিয়েছে, সেখান কেউ কোনও গলতি খুঁজে পাবে না। দুর্জয় সামন্তর মেয়ে মাঝরাতে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় ডায়েরি করেছিল, মেডিকেল রিপোর্টেও মেয়েটির ওপর নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে—বধূনিগ্রহের সপক্ষে এটাই ছিল সরকারপক্ষের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু আশিসতরু বা সরকারি উকিল সংশয়াতীত ভাবে দেখাতে পারল কি মেয়েটির শ্বশুরবাড়ির লোকজনই ওই নিপীড়নের মূল হোতা? তা ছাড়া অধীরদের বিরুদ্ধে আনা বাকি সব কটা সেকশানকেই তো চন্দ্রচূড় কচুকাটা করেছে। একমাত্র চন্দ্রচূড়দের সাজানো প্রেমিকটির সাক্ষ্য হয়তো টেকেনি, কিন্তু তাতে তো দুর্জয় সামন্তর মেয়ের অভিযোগ সবল হয় না। অধীর মাইতি আর তার বউ-ছেলে সম্ভবত দোষ করেও জেল খাটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে শুভময়দের তো দেখতেই হয়, হাজারটা সম্ভাব্য দোষী রেহাই পেলেও একজন নিরাপরাধ ব্যক্তি যেন সাজা না পায়। নথি আর সাক্ষ্যর চুলচেরা বিচারের পরও শুভময় যদি শতকরা একশো ভাগ নিঃসন্দেহ না হয়, তা হলে সে অধীরদের দণ্ড দেয় কোন যুক্তিতে? চন্দ্রচূড়ের কাছ থেকে সে টাকা ধার নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে ওই কেসের কী সম্পর্ক? ধারই তো নিয়েছে সে, অনুগ্রহ তো নেয়নি, বিনিময়ে চন্দ্রচূড়কে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার প্রশ্নই বা আসে কোত্থেকে? চন্দ্রচূড় হারা কেস জিতেছে এমন কল্পনাও তো অর্থহীন।

শুভময়ের সিদ্ধান্তে দুর্জয় সামন্ত যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে সে যাক উচ্চ আদালতে, আপিল করার দরজা তো তার খোলাই রইল। দেখুক না, শুভময় মৈত্র ভুল রায় দিয়েছে কি না!

বারান্দায় ছায়ামূর্তি। মিহি জ্যোৎস্নায় শুভময় দেখতে পেল তাপসী দাঁড়িয়ে। মেয়েটা কি ভবানীর নির্দেশ মতো তাকে চোখে চোখে রাখছে? শুভময় গলা খাঁকারি দিল,—মানুর খাওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্যার। ঘুমিয়ে পড়েছে।... আপনাকে এবার দিয়ে দিই?

—কটা বাজে?

—প্রায় দশটা।

এতক্ষণ ধরে শুভময় লনে রয়েছে? চিন্তা এত দ্রুত সময়কে গিলে নেয়?

শুভময় ভারী গলায় বলল,—তা হলে টেবিল রেডি করো। আমি আসছি।

সন্ধেবেলার আলু-পরোটা এখনও হজম হয়নি। অম্বল হয়ে আছে। গলায় টক ভাব। একটার বেশি রুটি খেতে পারল না শুভময়। ঘরে এসে গলায় অ্যান্টাসিড ঢালল একটু। দু'-চারটে ঢেকুর তুলে অল্প আরাম হল বটে, কিন্তু মনের অম্বল কাটে কই!

চোখ বুজে শুভময় শুয়ে রইল একটুক্ষণ। অস্থিরতা ফিরে আসছে আবার। নাহ্, চন্দ্রচূড় বোধহয় হারা কেসই জিতে গেল। কবে কোথায় বধূনির্যাতনের মামলায় শতকরা একশো ভাগ প্রমাণ পাওয়া যায়? কোন আকাট পাঁচ বাড়ির লোককে সাক্ষী রেখে বউ ঠেঙায়? সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলেও তো একটা কথা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি থেকেও তো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আসামিপক্ষের দাবি, মেয়েটা আছাড় খেয়ে পড়েছিল। ডাক্তারকে দিয়ে চন্দ্রচূড় বলিয়েও নিয়েছে, শুধু মারধর নয়, আকস্মিক পতনজনিত কারণেও ওই ধরনের আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু অধীর মাইতিরা যে দেখেও ডাক্তার ডাকল না, এটা কি তাদের অশুভ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে না? দুর্জয়কেও ফোনটা তার মেয়েই করেছিল, অধীর অমলরা নয়। প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পথ ছুটে এসে মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বাবাকেই গ্রহণ করতে হল? মেয়েটা যে কাঁদতে কাঁদতে ফোন করেছিল, তাই বা দুর্জয়রা প্রমাণ করবে কী করে? সম্ভব? নিশ্চয়ই মেয়ের বিপদের খবর পেয়ে পাড়াপ্রতিবেশীকে ডেকে এনে এনে বাবা আগে ফোনে মেয়ের রোদন শোনাবে না! সে তো পড়িমরি করে প্রথমে মেয়ের কাছেই ছুটবে! দুর্জয় তার সাক্ষ্যে বলেছে, যখনই সে মেয়েকে আনতে চেয়েছে, ওরা কোনও না কোনও ছুতো

দেখিয়েছে। মেয়েকে যে জোর করে ওরা আটকে রাখতে পারে, এ দুর্জয় স্বপ্নেও ভাবেনি। সত্যি তো, মেয়ের বাপ কী করে বিয়ের পর থেকেই ধরে নেবে তার বেয়াইবাড়ির মতলব ভাল নয়? শ্বশুরবাড়িতে যে সে সুখী নয়, এ-কথাই বা কোন মেয়ে বিয়ের পরদিন থেকেই বাপ মাকে জানাতে চায়? উঁহু, আশিসতরু পয়েন্টগুলো ঠিকঠাকই তুলেছিল, কিন্তু শুভময় কি তা যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করল? যুক্তিজাল বিছিয়ে জিতে যাওয়াই কি সব? আর কিছু নেই? এর আগেও শুভময় বধূনির্যাতনের মামলায় স্বামী শ্বশুর শাশুড়িকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, এ ক্ষেত্রে সে দ্বিধান্বিত হল কেন? এমন নয় তো, অন্য কোনও ধরনের পরোক্ষ চাপ অনুভব করেছে শুভময়? পাছে চন্দ্রচূড় ধরে নেয় তার দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছে বলেই শুভময় সেই উপকারটুকুকে অবজ্ঞা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে কঠোর হয়ে তার মক্কেলদের জেলে ঢোকাল? যেমনটা সে করেছে দোলপূর্ণিমার দিন? চন্দ্রচূড়ের নিমন্ত্রণ রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে?

ভাবতে ভাবতে চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল শুভময়ের। কখনও নিজের সপক্ষে কৈফিয়ত খাড়া করছে রাশি রাশি, পরক্ষণে সেগুলো বালির প্রাসাদের মতো ভেঙে চুরচুর। ক্রমশ একটা উদ্বেগ এসে গ্রাস করছিল তাকে। তার এই ফাঁকিটুকু ধরা পড়ে যাবে না তো পাঁচজনের চোখে? সে যে পুরোপুরি ন্যায়বিচার করেনি, বাইরের কোনও ঘটনার পরোক্ষ প্রভাব আছে তার পিছনে, এই নিষ্ঠুর সত্যিটা লোকের কাছে ধরা পড়ে গেলে শুভময়ের আর রইল কি? শুভময় মৈত্র কি আর আগের মতো মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে?

হঠাৎই নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল শুভময়ের। ভীষণ একা। স্বেচ্ছানির্বাসন আর একাকিত্বকে মেনে নেওয়া মানুষ যখন একা থাকার যন্ত্রণায় ছটফট করে, সে যে কী দুঃসহ অনুভূতি! শুভময় বিদীর্ণ হচ্ছিল। এই সময়ে একজন কেউও যদি তার পাশে থাকত! যার সঙ্গে কথা বলে একটু হাল্কা হওয়া যায়। শান্ত করা যায় মনটাকে। আছে কি সেরকম কেউ?

দুরুদুরু পায়ে শুভময় বসার ঘরে এল। টেলিফোনে ঋতির মোবাইল নাম্বারটা টিপছে।

সাড়া দিতে ঋতি একটু সময় নিল যেন,—তুমি? এত রাতে?

—শুয়ে পড়েছিলে নাকি?

—না। কাগজকলম নিয়ে বসেছিলাম।

—কবিতা লিখছ?

—মাথায় এখন কবিতা নেই। হিসেব কষছি।...আমার বোধহয় কবিতা এখন আসবেও না।

—কেন ঋতি? টাকার চিন্তা...?

—আমি কি শুধু টাকার কথাই ভাবি?... যাক গে, তুমি কেমন আছো?

শুভময় সোচ্চারে বলতে চাইল—আমি ভাল নেই ঋতি, অনেক অনেক কথা বলার আছে তোমায়। শুনবে?

শুভময়ের মুখ দিয়ে বেরোল,—আছি এক রকম। তোমার শান্তিনিকেতন ট্যুর কেমন হল?

—মোটামুটি। বলার মতো কিছু নয়।

—দেবাশিস গেছিল? সুধন্য?

—সুধন্য গিয়েছিল।

—আর তোমার সেই অ্যাডমায়ারার?

—ছিল।

—তার মানে তোমরা খুব এনজয় করেছ?

ঋতি নীরব। অদৃশ্য তরঙ্গে শুধু নিশ্বাসের ওঠাপড়া। ইন্দ্রিয় আজ প্রখর বলেই কি শব্দটা এত স্পষ্ট শুনছে শুভময়? নাকি এ নিছকই মনের ভুল?

শুভময় অপেক্ষা করে আছে। ঋতির উত্তরের জন্য। ঋতির গলা শোনার জন্য। কিন্তু কথা বলে না কেন ঋতি? অন্য দিন তো সোমদত্তর প্রসঙ্গ এলে ঋতি উছলে পড়ে, আজ কেন এই নৈঃশব্দ্য? ঋতি কি তার প্রশ্নে আহত? নাকি আদৌ তার সঙ্গে আর বাক্যালাপে উৎসাহী নয়? এমন কোনও ধ্যানে ডুবে গেল কি, যেখানে শুভময়ের কণ্ঠ এখন মূর্তিমান উৎপাত?

আস্তে করে ফোন নামিয়ে রাখল শুভময়। উঠে যেতে গিয়েও ফিরে এল। টান মেরে খুলে দিল ফোনের প্লাগ। উফ্, সম্পর্কটাও যদি এভাবে ছিঁড়ে দিতে পারত!

ভেতরে এক তীব্র দাহ নিয়ে শুভময় স্টাডিরুমে যাচ্ছিল, হঠাৎই সামনে তাপসী। প্রায় পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে মিনতির সুরে বলল, —আজ আর পড়াশুনো নিয়ে নাই বা বসলেন।

শুভময় গরগর করে উঠল, —কেন?

—আজ শুয়ে পড়ুন। আপনার খুব ঘুম দরকার।

—আমার ঘুম আসবে না।

—চেষ্টা করুন। চোখ বুজে শুয়ে থাকুন। চলুন, আমি মশারি টাঙিয়ে আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন, ঠিক ঘুম এসে যাবে।

যেন বাচ্চা ভোলানো স্বর। শুভময় ক্রুদ্ধ হতে গিয়েও থমকে গেল। তাপসীর দু'চোখে কী অপাপবিদ্ধ সরলতা! গভীর কালো মণি যেন শান্ত সরোবর। টলটল করছে। ছলছল করছে।

খপ করে তাপসীর হাত চেপে ধরল শুভময়। জ্বোরো রোগীর মতো কাঁপছে সহসা। বিড়বিড় করে বলল, —তুমি আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারবে?

শুভময়ের এই অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য তাপসী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। টলমল করে উঠল সরোবর। পরক্ষণে স্থির। শুধু তিরতির কাঁপছে ঢেউ।

তাপসীর অন্য হাতটাও আঁকড়ে ধরেছে শুভময়। দীর্ঘ দেহ অনেকটা ঝুঁকিয়ে তাপসীর বুকে মুখ গুঁজে দিল। মাথা ঝাঁকাচ্ছে পাগলের মতো, —শান্তি চাই। আমি একটু শান্তি চাই।

তাপসী টুঁ শব্দটি করল না। বুকে টেনে নিল শুভময়কে। চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিয়েছে। হাত বোলাচ্ছে মাথায়।

বুঝি বা এই মায়াবী স্পর্শটুকুর জন্যই এতকাল তৃষিত ছিল শুভময়। কিংবা শুভময়ের শরীর। আরও নিবিড় করে জাপটে ধরেছে তাপসীকে। উষ্ণ ঠোঁট ছুঁয়ে যাচ্ছে তাপসীর ওষ্ঠ গলা ঘাড় কপাল দু'চোখ। কামনার লালায় ভিজে যাচ্ছে তাপসী। মুহূর্তের জন্য তাকে ছাড়ল শুভময়, পরমুহূর্তে পলকা খেলনার মতো তাকে তুলে নিয়েছে কোলে। ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। একটা একটা করে খুলে ফেলছে তাপসীর আবরণ। তিলমাত্র প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই। নগ্ন তাপসী নিথর পড়ে আছে চোখ বুজে। তার ঈষৎ অবনতমুখী দুই স্তন, নিটোল নাভি, কচি কলাগাছের মতো দুই উরু, মসৃণ শ্যামলা দেহ, সবই এখন নিবেদনের প্রতীক্ষায়। তাপসী উৎসর্গ করছে নিজেকে। তার ঈশ্বরের কাছে।

একটা বুনো ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। কতকাল পর যে এই মোহময় গন্ধ পাচ্ছে শুভময়! মত্ত হয়ে উঠছে শুভময়ের ঘুমন্ত পৌরুষ। কী উল্লাস, কী উল্লাস, শুভময় তবে এখনও কামশীতল হয়ে যায়নি! কামার্ত জন্তুর মতো শুভময় নিজেকে প্রোথিত করল তাপসীতে। আলোড়িত হচ্ছে তীব্র রমণসুখে। তার রিরংসার উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে তাপসীর শরীর, মৃদু শীৎকার উঠছে, শুভময় টের পাচ্ছিল।

মৈথুন শেষ। ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল শুভময়। সারাদিনের গ্লানি মুছে যাচ্ছে শরীর থেকে। ঘুম নামছে চোখে। হাজার বছরের ঘুম।

পনেরো

অফিসে একগাদা কাজ জমে গেছে। শনিবার এজলাস থেকে নেমে ধীরেসুস্থে সারল শুভময়। সরকারি বছর ফুরিয়ে এল, এ মাসের মধ্যেই আটকে থাকা বিলপত্র সব ছেড়ে দিতে হবে, সই করল দেখে দেখে। গোটা কয়েক চিঠিও লেখার ছিল, তৈরি করে দিল বয়ান। জনা দশেক স্টাফের মাইনের বিল রেডি, সেটিকেও নিরীক্ষণ করল সময় নিয়ে। চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বিকেল গড়িয়ে গেল।

কোর্ট থেকে বাংলো ফেরার পথটুকু এখন ভারী মনোরম। ফাল্গুনের অপরাহ্ণ সোনার কুচি বিছিয়ে দিয়েছে রাস্তায়, দু'পাশের গাছগাছালি সোনালি আলোয় চিকচিক। ফুল দুলছে রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়ায়। কী রং! কত রং! বাতাস বইছে মন্দ মধুর। ফুলের রেণু মেখে বুঝি বা একটু এতাল-বেতাল।

গত দু'দিন ধরে ঘরে ফেরার জন্য বাড়তি তাগিদ অনুভব করছে শুভময়। বাসনার টান? নাকি বাংলোকে তার গৃহ মনে হচ্ছে এতদিনে? যেখানে কেউ একজন বসে থাকে তার প্রতীক্ষায়? শুভময় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মাত্র দু'দিনেই নিজের কাছে নিজেই কেমন অচেনা হয়ে গেল!

আজও বুঝি চঞ্চল ছিল মন। গেটের সামনে পৌঁছে আচমকাই শুভময় চিত্রার্পিত। বারান্দায় ঋতি!

ইজিচেয়ারে বসে ঋতি হেসে হেসে কী যেন বলছে মানুকে। ছোট্ট মানু তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে।

দৃশ্যটাও কেমন অলীক লাগে না?

ঈষৎ দুর্বল ভাবে শুভময় মোরামটুকু অতিক্রম করল, —কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ?

ঋতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। ঠোঁটে কৌতুকের ঝিলিক, —চলে এলাম।

—তুমি তো ফোন না করে আসো না?

—কী করে করব? সেদিন সেই যে লাইনটা কেটে গেল, তারপর থেকে তোমায় তো আর পাচ্ছিই না। খালি রিং বেজে যাচ্ছে।

মৃদু ধাক্কা খেলে শুভময়। স্মরণে এল, সে রাতের পর প্লাগটা তো আর লাগানোই হয়নি। দুটো দিন এত বেভুল ছিল সে? কোনও ফোনই যে আসছে না, সে খেয়ালও নেই?

মানু লাফাতে লাফাতে ভেতরে গেছে। সম্ভবত শুভময়ের আগমনবার্তা

জানাতে। কথা না বাড়িয়ে শুভময়ও ঘরে এসে সোফায় বসল। জুতো ছাড়তে ছাড়তে শুনতে পাচ্ছে ভবানীর সঙ্গে কথা বলছে ঋতি। পলকের জন্য অসহজ ভাবটা বেড়ে গেল যেন। ভবানীর যা ভ্যাকভ্যাক করা স্বভাব, এক্ষুনি না ঋতিকে মাথা ঘোরার গল্পটা শুনিয়ে দেয়। আবার তা হলে একগাদা প্রশ্ন, একঘেয়ে উত্তর...!

আশ্চর্য, ঋতিকে দেখে এত অস্বস্তিই বা হচ্ছে কেন শুভময়ের? ঋতির যদি নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার থাকে, শুভময়েরও কেন থাকবে না? ঋতি ন্যায়-অন্যায় মেনে চলে? শুভময়েরই বা তবে কীসের সংকোচ?

ঋতি আর ভবানী একসঙ্গেই ঢুকল ঘরে। ভবানী ব্রিফকেস রেখে বিদায় নিল। ঋতি বসেছে পাশে। হাসি হাসি মুখে বলল, —তোমাকে খুব চমকে দিলাম তো?

শুভময় অন্যমনস্ক ভাবে বলল, —কেন?

—এই যে দুম করে হাজির হলাম!

—ও হ্যাঁ। ...তোমার তো এখন আসার কথা নয়।

—নয়ই বা কেন?

—তোমার কাজকর্ম চলছে...। দোকানের কী অবস্থা? সব কমপ্লিট?

—টোটাল রিমডেলিং কি সোজা কাজ? অনেক সময় লাগে। আগুপিছু অনেক চিন্তা করে এগোতে হয়।

—তা তুমি প্রেজেন্ট না থাকলে ওদিকে অসুবিধে হবে না?

—থেকেই বা কী হত, কাল তো রোববার। আজ উডওয়ার্ক স্টার্ট করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ওদের অবশ্য বলিনি আমি থাকব না। জেনে ফেললেই তো ফাঁকি মারবে।

—ফিরছ কবে? পরশু ভোর?

—ভাল করে এখনও পা রাখলাম না, এখনই যাওয়ার কথা? ঋতি ঝরঝর হাসছে, —ভয় নেই, বেশি জ্বালাব না। কাল বিকেলের বাস ধরব।

—ও।

বলেই শুভময় স্থির। ভেতর দরজায় তাপসী! হাতে জলের গ্লাস। আহ্, তাপসীর কি এক্ষুনি দর্শন না দিলে চলছিল না!

টেবিলে গ্লাস নামিয়েছে তাপসী। জুতোজোড়া রেখে এল শু-র‍্যাকে। পায়ের কাছে হাওয়াই চপ্পল এনে দিয়েছে।

ঋতিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে গলা অনাবশ্যক ভারী করল শুভময়, —

আমাদের জন্য ঝটপট দু'কাপ চা বানিয়ে ফ্যালো তো। ম্যাডাম দুধ চিনি খান না, শুধু লিকার দেবে।

তাপসী নত স্বরে বলল, —জানি।

—ম্যাডামকে কিছু খেতে টেতে দিয়েছ?

—উনি বললেন আপনি এলে...

—স্ট্রেঞ্জ! শুভময়ের গলা চড়ে গেল, —আমি যদি সাতটায় ফিরতাম, সাতটা অব্দি তুমি না খাইয়ে রাখতে? জানো, উনি কদ্দূর থেকে এসেছেন?

—আপনি তো খুব একটা দেরি করেন না, তাই ভাবলাম...।

—তোমার ভাবাভাবির দরকারটা কী, অ্যাঁ? মুখের সামনে দাঁড়িয়েই বা রইলে কেন? যাও, চা করে খাবারটা দিয়ে দাও।

মাথা নিচু করে চলে গেল তাপসী। ওফ্, নিশ্চিন্ত। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে শুভময়ের।

ঋতি চোখ কুঁচকে শুভময়কে দেখছিল। একটু যেন তিরস্কারের ভঙ্গিতেই বলে উঠল, —তুমি কিন্তু মেয়েটাকে মিছিমিছি বকাবকি করলে। ও আমায় অনেক বার সেধেছে। ইনফ্যাক্ট, আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো ময়দা টয়দা মেখে... আমিই বারণ করলাম।

অকারণে রুক্ষ হয়ে শুভময়েরও ভাল লাগছিল না মোটেই। নরম মাটি পেয়ে সে কি একটু বেশি আঁচড়াতে শুরু করেছে? নাকি ঋতিকে দেখে তার মধ্যে অপরাধবোধ চাগিয়ে উঠল? কিন্তু এই মুহূর্তে সে অসৎই হোক, কি ব্যভিচারী, তার পিছনে ঋতিরও ভূমিকা নেই? ঋতিই কি একটু একটু করে তাকে ঠেলেনি খাদের কিনারে? ন' বছর ধরে?

ঋতি ফের বলল, —যাই বলো, তোমার তাপসী কিন্তু যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট। রতনের চেয়ে ঢের ঢের ভাল। রতনের কাজের কোনও ছিরিছাঁদ নেই, এ ঘরের সোফা-টেবিলগুলো পর্যন্ত তেড়াবেঁকা থাকে। আর তোমার তাপসীকে দ্যাখো, কী সুন্দর গুছিয়ে রেখেছে ঘরদোর! আমি যেমন প্রথম বার সাজিয়ে দিয়ে গেছিলাম, ঠিক যেন সেই রকম।

ঋতি হঠাৎ 'তোমার তাপসী' 'তোমার তাপসী' করে কেন? তোমার শব্দটা ঠং ঠং করে বাজছিল শুভময়ের কানে। ঋতির পাশে বসে থাকতেও ইচ্ছে হচ্ছে না আর। উঠে পড়ল গোমড়া মুখে, শোওয়ার ঘর থেকে পাজামা পাঞ্জাবি নিয়ে সোজা বাথরুম। এই আড়ালটুকু যে কী ভীষণ জরুরি এখন!

কিন্তু নিরালা খুঁজে নিলেই কি আড়াল মেলে? শুভময় ভেবে পাচ্ছিল না।

ঋতিকে অজুহাত খাড়া করলেও কি তার কৃতকর্মের সমর্থন এসে যায়? সেদিন রাতে শুভময় নয় নিজের বশে ছিল না, ক্ষণিকের উত্তেজনায় ভুল করে ফেলেছিল একটা। কিন্তু তারপর? পরশু? কাল? পরশু সকালেও তো ঘুম থেকে উঠে এক বিশ্রী পাপবোধে আচ্ছন্ন হয়েছিল সে। এ কী করল? তার কাছে আশ্রয় নিতে আসা একটা দুঃখী মেয়ের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভোগ করল তাকে? ছি! তার শিক্ষাদীক্ষা, ন্যায়নীতিবোধ, সামাজিক সংস্কার, সব জলাঞ্জলি দিল অবলীলায়? তখনই তো শুভময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর নয়। অথচ রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার যে কী ভূতে পেল তাকে! ওই পেলব নারীদেহ চুম্বকের মতো টানছে, বিচিত্র এক তৃষ্ণায় শরীর আকুল। ফের সেই উন্মত্ত কামকেলি। ফের সেই প্রগাঢ় তৃপ্তি। শুভময় মৈত্র কেন যে আর লাগামে রাখতে পারছে না স্নায়ুকে?

শুভময়ের বুক কেঁপে উঠল থরথর। এরকমই বুঝি হয়। পাড় একবার ভাঙতে শুরু করলে নদী কি আর বাধা মানে? চন্দ্রচূড়ের কাছে নতজানু হওয়ার দিন থেকেই শুরু হয়েছে তার ক্ষয়। আর বুঝি পরিত্রাণ নেই শুভময়ের।

ঋতি বাথরুমের বাইরে থেকে ডাকছে, —কী গো, তোমার চা যে জুড়িয়ে জল!

শুভময়ের হৃৎপিণ্ডে আবার কাঁপন। হা ঈশ্বর, ঋতিকেও কি এই সময়েই আসতে হল?

নিজেকে শক্ত করে বেরিয়ে এল শুভময়। চা সত্যিই গরম নেই, এক চুমুকে শেষ।

ঋতি এবার বসেছে মুখোমুখি। জিজ্ঞেস করল, —আর এক কাপ করে দিতে বলি?

—থাক।

—সেই ভাল। মেয়েটা লুচি ভাজছে, জলখাবার খেয়েই না হয়...।

—হুম্।

ব্যস্, আর কোনও কথা নেই। দু'জনে বসে আছে চুপচাপ। হলদেটে আলো জ্বলছে ঘরে। নিষ্প্রভ। দ্যুতিহীন। পাখা ঘুরছে মাথার ওপর। শব্দ আছে, বাতাস নেই। রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে মশকনিবারণী যন্ত্র, তবু মশা কামড়াচ্ছে কুটকাট। অন্ধকার ঘন হচ্ছিল।

হঠাৎই নীরবতা ভেঙেছে ঋতি। খানিকটা দূরমনস্ক ভাবে বলে উঠল, —তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কী?

—পরে বলব। খেটেখুটে এসেছ, আগে মুখে কিছু দাও, মনমেজাজ ঠান্ডা হোক...।

—মেজাজ ঠিকই আছে। বলো।

—থাক। পরে শুনো।

—টাকাপয়সা সংক্রান্ত কিছু?

—না না। ঋতি যেন ছটফট করে উঠেছে, —অন্য কথা। অন্য কথা।

শুভময়ের বিস্ময় বাড়ছিল। আর কী কথা থাকতে পারে ঋতির? মুখে চোখে এমন অস্থিরতাই বা কেন? ডিভোর্স চাইবে? সেই কথা বলতেই কি ছুটে এল আজ? হতে পারে। হতেও পারে। চাইলেই কি শুভময় দিয়ে দেবে ডিভোর্স? দেওয়াই তো উচিত, নয় কী?

তাপসী লুচি এনেছে। প্লেট দুটো সযত্নে টেবিলে রেখে ধীর পায়ে ফিরেও গেল। একটু কি অভিমান জমেছে মুখে? জমতেও পারে। শুভময় তাকাল না।

ঋতি প্লেট টেনেছে কোলে। ঝপ করে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, —জানো তো, আজ তাপসীর কাছে সব শুনলাম।

লুচি ছিঁড়তে গিয়ে শুভময়ের হাত থেমে গেল, —কী... কী শুনলে?

—ওর জীবনকাহিনী। ওর বাবা কী করে মারা গেল... হঠাৎ বিয়ে... বরটা কীরকম বদমাশ... ধরে ধরে পেটাত... তারপর এখনকার বউটার সঙ্গে কবে থেকে আশনাই চলছিল... কীভাবে লোকটা ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেল...

শুভময় ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, —জানি।

—কী ট্র্যাজিক লাইফ, তাই না? ওই একফোঁটা বাচ্চা নিয়ে মেয়েটা কী স্ট্রাগল্‌টাই না করছে...।

শুভময় আবার বলল, —জানি।

—তুমি তো জানবেই। তোমার দৌলতেই না শয়তানটা টাইট হল। মেয়েটার তো দেখলাম তোমার ওপর দারুণ আস্থা। খুব শ্রদ্ধা করে তোমাকে, স্যার বলতে অজ্ঞান। সাধে কি তুমি অত মুখ করেও পার পেয়ে যাও! পড়তে আমাদের মঙ্গলার পাল্লায়, তোমার ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে দিত। ঋতি হাসতে গিয়েও যেন উদাস সামান্য, —সত্যি, মেয়েটার কথা শুনে এত কষ্ট হচ্ছিল...! বেশি নরম সরম হলে কপালে শুধু দুর্ভোগই থাকে।

এবারও শুভময় বলতে পারত, জানি। স্বর ফুটল না। তাপসী যে শুভময়ে কতটা নিবেদিতপ্রাণ তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? প্রথম রাতে মেয়েটা

যে কখন বিছানা থেকে উঠে গেছিল শুভময় টেরও পায়নি। ভোরবেলা যথানিয়মে চা করে দিল শুভময়কে, বাজার গেল, রান্না চড়াল...। শুভময়ের খাওয়ার সময়েও দাঁড়িয়ে রইল পাশে। যেমন থাকে। কথাও বলল এক-আধটা। যেমন বলে। একই রকম বিনম্র। একই রকম সম্ভ্রমমিশ্রিত দূরত্ব বজার রাখা ভঙ্গিমা। যেন কিছুই ঘটেনি আগের রাতে, এতটাই স্বাভাবিক। আবার রাত্রিবেলা শুভময় যখন তাকে ঘুমন্ত মেয়ের পাশ থেকে তুলে আনল, তখনও চাঞ্চল্য নেই এতটুকু। যেন জানত, আসবে শুভময়। যেন মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। হয়তো বা মেয়েটারও উপোসী শরীর সুখ পেয়েছে শুভময়ে, কিন্তু তারই বা প্রকাশ কই? দেখে মনে হয় শুভময়ের কাছে শরীর উৎসর্গ করাটাও তার সেবারই অঙ্গ।

নাকি এটাও তাপসীর আর এক দুর্ভোগ? আশ্রয় হারানোর ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে শুভময়কে! নিরুপায় ভাবে! প্রকাশ করতে পারছে না তার সংক্ষোভ!

চিন্তাটা কুৎসিত রকমের অস্বস্তিকর। শুভময় প্লেট নামিয়ে রাখল, —যাক গে, তাপসী ছাড়ো। তুমি যে কী বলবে বলছিলে?

—হুঁ। ঋতি মাথা নাড়ল। আবার যেন বিমনা। এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে, বুঝি খুঁজছে কিছু। হঠাৎ উঠে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। ফিরল অ্যাশট্রে আর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে। ধরিয়েছে সিগারেট। ধোঁয়া গিলে বলল, —মার অপারেশানের ডেট ফিক্স হয়ে গেছে। এ মাসের তিরিশ।

এই সংবাদ পরিবেশনের জন্য অত ভূমিকা? উঁহু, অন্য কিছু আছে ঋতির মনে। আছেই। ঋতি কি দোলাচলে ভুগছে? ভাবছে শুভময়ের না জানি কী প্রতিক্রিয়া হবে? সদ্য তিন লাখ টাকা নিয়েছে বলে কি কুণ্ঠিত ঋতি? শুভময় যে ছেঁড়া তার জোড়ার আশায় টাকাটা দেয়নি, এটুকুও কি ঋতির উপলব্ধিতে নেই?

শুভময় আলগা স্বরে বলল, —ও।

—মা তোমায় জানাতে বলেছিল। তুমি কি তখন আসতে পারবে?

—এ মাসের শেষে কী করে হবে? ইয়ার এন্ডিং। লাস্ট কটা দিন স্টেশন লিভ করা অসম্ভব।

—আমিও মাকে তাই বলেছি। মাইনর অপারেশান, তুমি গিয়ে করবেই বা কী? বরং কদিন পরে একবার ঘুরে এসো। এক ঢিলে দু'পাখি মারা যাবে।

—মানে?

—বা রে, নতুন মায়াবিনীর অনারে একটা পার্টি দিতে হবে না? মা তো অপারেশানের পর দাদার ওখানে উঠছে। অ্যাটলিস্ট মাসখানেক তো থাকবেই। ভাবছি ওর মধ্যেই কোনও একটা রোববার দেখে বাড়িতেই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলব। তুমি বললে অবশ্য শনিবারও করতে পারি। পুট করে মাকে দেখে আসাও হবে, প্লাস...

—কাকে কাকে ডাকবে? শুভময়ের বুকে চোরা কৌতূহল।

—খুব বেশি লোক বলব না। শুধু ক্লোজ বন্ধুবান্ধব...। দেবাশিসকে তো ফুল ফ্যামিলি ডাকতেই হবে। রেণু সুধন্যরাও ছাড়বে না। তারপর ধরো অলকানন্দা, করবীদি, দীপকদা...

—আর তোমার সোমদত্ত? শুভময় 'তোমার' শব্দটা ফিরিয়ে দিতে পেরে একটা বিজাতীয় আনন্দ বোধ করল। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলল, —তাকেও তো নিশ্চয়ই বলতে হবে?

—ওকে আবার নেমন্তন্ন! ও তো এমনিই আসবে।

ঋতির জীবনে সোমদত্ত এত গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছে? কবে থেকে? সুধন্যর বাড়িতে যখন দেখেছিল, তখনই কি...? চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা কি শান্তিনিকেতনে গিয়ে নিল ওরা? তাই হয়তো সেদিন শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ ওঠায় ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলছিল ঋতি!

শুভময়ের গলা শুকিয়ে আসছিল। ঢোক গিলছে বার বার। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, —আমাকে ওই দিন বাদ দাও। তোমরা বন্ধুবান্ধবরা মিলে আনন্দ করবে, সেখানে আমি কী করব?

—না। তোমাকে সেদিন আসতেই হবে।

—কেন আমায় ফোর্স করছ ঋতি? জানোই তো, ভিড়ভাট্টা আমার ভাল লাগে না।

—এই বারটা আমার কথা রাখো প্লিজ। আর কখনও তোমায় জোর করব না, দেখে নিও।

ঋতির স্বরে মিনতি। কিন্তু শুভময়ের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। যেন ধু ধু মাঠ। যেখানে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

টান টান করে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে তাপসী। বিছানাও পেতেছে ভারী পরিপাটি ভাবে। কাচা বেডশিট, কাচা বালিশের ওয়াড়, মাথার তলার পাতলা

তোয়ালে ধোপদুরস্ত। ভোরের দিকে এখনও একটু শীত শীত করে, গায়ে হালকা কিছু চাপালে আরাম হয়, গায়ে দেওয়ার সেই চাদরও বদলে দিয়েছে আজ। শুভময়ের শয্যা আজ বড় বেশি নিভাঁজ, বড্ড বেশি মসৃণ।

চাদর বালিশে সাবানের ঘ্রাণ। গন্ধটা শুভময়ের নাকে লাগছিল। মনে মনে তাপসীর ওপর একটু কৃতজ্ঞ বোধ করল শুভময়। পাছে শুভময়ের অস্বস্তি হয়, বিছানা থেকে তাই সযত্নে নিজের গন্ধ মুছে দিয়েছে তাপসী।

ঋতি বাথরুমে ছিল, এই মাত্র ঢুকল মশারি তুলে। মশারির সাদা প্রান্তটা গদির নীচে চালান করতে করতে বলল, —আজ বইপত্র নিয়ে বসলে না যে বড়?

শুভময় দায়সারা ভাবে বলল, —টায়ার্ড লাগছে।

—তুমি কি আজকাল খুব বেশি স্ট্রেন নিচ্ছ?

—না তো। সেরকম তো...

—বললেই হল? তাপসীর মুখে শুনলাম, তুমি নাকি একদিন কোর্ট থেকে ফেরার সময়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলে?

জানা হয়েই গেল?

শুভময় এড়ানোর ভঙ্গিতে বলল, —ও কিছু না। পেটি ব্যাপার।

—জীবনে কোনটা পেটি, কোনটা লার্জ, তা কি অত সহজে বলে দেওয়া যায়? ঋতি বালিশে মাথা রাখল। নিজের মনে বিড় বিড় করে বলল, —যেটাকে আমরা হেলাফেলা করি, সেটাই হয়তো...

কথাটায় কি কোনও ইঙ্গিত আছে? শুভময় খুব একটা মাথা ঘামাল না। উল্টোদিকে ফিরে শুয়েছে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছে ধ্বনিটা, সামান্য বিরতির পর ফের বেজে উঠছে পূর্ণোদ্যমে। জানলার পাল্লা খোলা আছে আজ, শীতকালটুকু ছাড়া বন্ধ ঘরে ঋতির ঘুম আসে না। ফাগুনের নরম হাওয়া ঢুকছে খোলা জানলা দিয়ে, ফ্যানের বাতাসে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরে। নীলচে রাতবাতি প্রকট করছে আলোছায়া।

হঠাৎই শুভময় টের পেল ঋতি ঠেলছে তাকে। ঘড়ঘড় গলায় বলল, —কী হল?

—ফেরো না এদিকে। ওভাবে দেওয়ালমুখো হয়ে থাকলে কথা বলা যায় নাকি?

শুভময় চিত হল। ওফ্, সিলিংটা কী অন্ধকার এখন! যেন ঘরের গোটা মাথাটাই ভরে গেছে কালো ছোপে!

ঋতি একটু কাছে সরে এল, —তোমাকে একটা কথা বলব বলছিলাম, খেয়াল আছে?

—হুঁ।

—জানতে চাইলে না কী কথা?

শুভময় চুপ করে রইল।

—তোমায় একটা খবর দেওয়ার ছিল।

এবারও সাড়াশব্দ করল না শুভময়।

—ঋদ্ধির জন্য জমি অ্যালটেড হয়ে গেছে। সওয়া পাঁচ কাঠার প্লট।

—ও। বাহ্।

—খবরে একটা পুনশ্চও আছে। আমি ঋদ্ধি ছেড়ে দিয়েছি।

—তাই?

—অবাক হলে না তো? কেন ছেড়েছি জিজ্ঞেস করবে না?

—হয়তো তোমার কোনও অসুবিধে আছে।

—সে তো আছেই। টাকাপয়সা তো একটা ফ্যাক্টর। ...আমি অন্য একটা কথাও ভাবলাম। একত্রে বাস না করতে পারলে বাড়িঘর করার কোনও মানেই হয় না।

শুভময় ঠিক যেন ধরতে পারল না কথাটা। অস্ফুটে বলল, —মানে?

ঋতি হাত রাখল শুভময়ের বুকে। গাঢ় স্বরে বলল, —সোজা কথার সোজা অর্থটা বুঝলে না? তুমি থিতু না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ফ্ল্যাট ট্যাট করে কী হবে? মিছিমিছি কেন আমরা আরও এক কাঁড়ি দেনা ঘাড়ে চাপতে দেব? তার চেয়ে বরং এখনকার লোন আগে শোধ হোক, আমার বুটিকটাও দাঁড়িয়ে যাক, আর দু'-তিনটে পোস্টিং-এর পর তুমিও নিশ্চয়ই কলকাতায় আসবে, তখন দুজনে মিলে বাড়ি হয় বাড়ি, নয়তো ফ্ল্যাট, কিছু একটা করে ফেলব। কী, প্ল্যানটা কেমন?

এবার শুভময় আক্ষরিক অর্থে নির্বাক। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। এত নির্বোধ সে হয়ে গেল কী করে?

ঋতি আরও ঘন হয়েছে। মাথা রেখেছে শুভময়ের কাঁধে। ফিসফিস করে বলল, —কী গো, কিছু বলছো না কেন?

ঋতির গরম নিশ্বাস ছুঁয়ে যাচ্ছে শুভময়ের মুখ। ছুঁচ্ছে? নাকি বিঁধছে?

একটুক্ষণ স্থির থেকে ঋতি বলল, — তুমি আমায় আর ভালবাসো না। তাই না?

শুভময়ের গলা আবার শুকিয়ে কাঠ। উত্তর ফুটছে না।

—না বাসাটাই স্বাভাবিক। ঋতির স্বর ভেজা ভেজা, —আমি তোমায় কম কষ্ট দিয়েছি? আমি তো তোমার লক্ষ্মীছাড়া বউ।

শুভময় কোনওক্রমে বলল, —যাহ্, কী যে বল!

—ভুল কী বলেছি? কোনও দিন তোমার সঙ্গে সেভাবে ঘর করলাম না, কাছে থাকলাম না... যা খুশি তাই করি, যার তার সঙ্গে মিশি... তার পরেও তুমি আমায় ভালবাসো?

—তোমার এখনও সংশয় আছে?

—মুখ ফুটে বলো না কেন?

—এ আর বলার কী আছে?

—কিছু কিছু কথা আছে, বলতে হয়। মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতে হয়। শুভময়ের বুকে মুখ গুঁজে দিল ঋতি, —অ্যাই, পুরনো সব কিছু ভুলে আমরা কি আবার নতুন ভাবে শুরু করতে পারি না?

শুভময়ের হৃৎপিণ্ড থর থর কাঁপছিল। এইটুকু কথা শোনার জন্যই তো সে অপেক্ষা করে আছে এতকাল।

ঋতি ফের বলল, —কী হল, বলো? পারি না শুরু করতে?

শুভময় নির্জীব স্বরে বলল, —পারি তো।

—তা হলে আমায় আদর করো। ঋতি জড়িয়ে ধরল শুভময়কে। গালে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল, —কত দিন তুমি আমায় আদর করোনি।

ঋতির হাত তাকে বেড় দিয়ে আছে। ঋতির বুক তাকে পিষ্ট করছে। ঋতি তার সমস্ত উষ্ণতা ঢেলে দিচ্ছে শুভময়কে। তবু কেন কামনা জাগে না? পর পর তিন রাত্রির ভ্রষ্ট সুখ তাকে কি শীতল করে দিচ্ছে? পাপবোধে গুটিয়ে যাচ্ছে শুভময়?

আস্তে আস্তে সরে গেল ঋতি। পিছন ফিরে শুয়েছে। ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়।

ঋতিকে কাছে টেনে নিতে খুব ইচ্ছে করছিল শুভময়ের। কিছুতেই সাহস পেল না। মুনিয়ার কফিনটা সরে গেছে, মাঝে এখন অন্য দেওয়াল। শুভময় টের পাচ্ছিল।

রাতে কি ঘুমিয়েছিল ঋতি? শুভময় জানে না। কখনওই বা এক হল তার দু' চোখের পাতা? শুভময়ের মনে নেই।

পরদিন সকালেই ঋতি চলে গেল। থমথমে মুখে। বেরনোর আগে শুধু

বলে গেল, — আমি চার পা এগিয়েছি, বাকি তিন পা তোমাকেই এগোতে হবে। তুমি না ডাকলে আমি আর আসব না।

পাথরের মতো বসে আছে শুভময়। সারাটা সকাল, সারা দুপুর বিকেল সন্ধে। বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল বার বার। ঋতি ফিরে গেল! ঋতি ফিরে গেল!

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শুভময় স্টাডিতে ঢুকল। বই ঘাঁটছে। যন্ত্রমানবের মতো।

হঠাৎই দরজায় তাপসী, —স্যার?

শুভময় ঘাড় ফেরাল।

—অনেক রাত হল, শুতে যাবেন না?

—আমি ঠিক আমার সময় মতো শোব। শুভময় অসম্ভব গম্ভীর, — তুমি তোমার ঘরে যাও।

তাপসী মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল। শুভময় ডাকল, —শোনো, আজ থেকে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে শোবে।

ষোলো

—আপনার প্রেশার তো বেশ হাই মিস্টার মৈত্র!

—কত?

—যথেষ্ট অ্যালার্মিং। ওয়ান নাইন্‌টি বাই হানড্রেড টেন। আপনার ফ্যামিলিতে কি প্রেশারের হিস্ট্রি আছে?

—না তো। আমার মা মারা গেছেন ক্যানসারে। বাবা অলমোস্ট এইট্টি, তাঁরও প্রেশার এমন কিছু অ্যাবনরমাল নয়। বরং একটু লো-ই থাকে।

—হুম্, চিন্তায় ফেললেন। প্রৌঢ় চিকিৎসক নিখিল মিত্রর কপালে ভাঁজ, —আপনার বয়সটা তো ভাল নয়। ফরটি টু ফিফটি এজটাই বিপজ্জনক। আপনি কি খুব টেনশান করেন?

—হ্যাঁ, রিসেন্টলি একটু...। শুভময় মলিন হাসল, —চার রাত একদম ঘুম হয়নি ডাক্তারবাবু। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, মাঝে মাঝে আমি স্লিপিং পিল নিই। এখন পর পর কদিন খেলাম, কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। সারা রাত চোখ জ্বালা করছে, দিনভর নশিয়া, প্লাস ঘাড়েও একটা ব্যথা ডেভেলাপ করেছে...।

আর একটা বিশ্রী হেডেক। এক এক সময়ে মনে হয় মাথা বুঝি এক্ষুনি ফেটে পড়বে। কোর্টেও একদম কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না।

—আপনার তো এখন কোর্টে যাওয়াই উচিত নয়। ইউ নিড টোটাল রেস্ট। মাস খানেক ছুটি নিন। আপনার স্ত্রী তো শুনেছি কলকাতায় থাকেন, ছুটি নিয়ে স্ট্রেট বাড়ি চলে যান। ওষুধপত্র খেয়ে কদিন ভোঁস ভোঁস ঘুমোন। শুধু মাথায় রাখবেন, পাতে কাঁচা নুন বন্ধ, রান্নাতেও তেল নুন মশলা কম।

—কিন্তু এক্ষুনি এক্ষুনি আমার কোথাও যাওয়ার উপায় যে নেই ডাক্তারবাবু। শুভময় একটা শ্বাস ফেলল, —আমাদের ছুটি নেওয়ারও প্রচুর ফ্যাকড়া। কেসগুলো ডিস্ট্রিবিউশানের ব্যাপার থাকে...

—স্টিল, আই শ্যাল অ্যাডভাইস ইউ ফর রেস্ট। আপনার শরীর আগে, না চোরগুণ্ডাদের শায়েস্তা করা আগে? নিখিল মিত্র খচখচ প্রেসক্রিপশান লিখছেন, —কয়েকটা সিম্পল্ টেস্ট দিলাম, এখানেই করিয়ে নিন। ইসিজিটা মাস্ট। কাল আমি ইসিজি রিপোর্ট দেখতে চাই। আপনি নিজে আমার চেম্বারে না গেলেও চলবে, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলে নেব। টেনশান ফেনশান ভুলে যান। চিয়ার আপ, চিয়ার আপ।

—চাইলেই কি নিজেকে চিয়ার আপ করা যায় ডাক্তারবাবু? মন কি নিজের বশে থাকে?

—রাখতে হবে। মন তো কোনও আলাদা বস্তু নয়। আপনার ইন্দ্রিয়গুলো ডাটা কালেক্ট করছে, থ্রু নার্ভস পৌঁছে যাচ্ছে ব্রেনে, সে যত ভাবে পারে সেগুলোকে ইন্টারপ্রেট করছে, আর তার বেসিসেই নানা রকম রিঅ্যাকশান তৈরি হচ্ছে। কখনও গুড, কখনও ব্যাড। এখন ব্রেনকে ভাল ভাল তথ্য সাপ্লাই দিন, যেগুলো রিফ্রেশিং। টিভি দেখুন, গল্পের বই পড়ুন, গান শুনুন...। নিখিল মিত্র একগাল হাসল, —সঙ্গে ওষুধগুলো খান। নিয়ম করে।

ডাক্তার এত কিছু বলে যাওয়ার পরও তেমন উজ্জীবিত হল না শুভময়। বসে আছে কপাল টিপে। ইন্দ্রিয়কে ভাল ভাল খোরাক জোগালেই যদি তার সমস্যা মিটত!

বসন্ত ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে গেছিল। ফিরে এসে বলল, —প্রেসক্রিপশানটা দিন স্যার। ওষুধগুলো নিয়ে আসি।

শুভময় মুখ তুলল, — তুমি আজ বাড়ি যাবে বলছিলে না?

—তেমন কোনও তাড়া নেই স্যার, কাল যাব।

দু'-এক সেকেন্ড ভাবল শুভময়। ভেবে হাসিও পেল। ওষুধ আনানোটা

ব্যক্তিগত কাজের পর্যায়ে পড়ে বটে, কিন্তু শুভময় মৈত্রর কি আর এখন অত শুচিবাই শোভা পায়? রাত আটটার সময়ে তাপসীকেও নিশ্চয়ই বাজারে পাঠানোটা সঙ্গত নয়।

প্রেসক্রিপশান আর টাকা বসন্তকে বাড়িয়ে দিল শুভময়। জিজ্ঞেস করল, —এখানকার ভাল ল্যাবরেটরি চেনা আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আরোগ্য ক্লিনিকের খুব নাম।

—প্রেসক্রিপশান দেখিয়ে ওদের লোককে তা হলে আসতে বলে দিয়ো সকালবেলায়। ব্লাড কালেক্ট করে নিয়ে যাক।

—আচ্ছা স্যার।

বসন্ত বেরিয়ে গেল। ডাক্তারকে চা করে দিয়েছিল তাপসী, তখন থেকেই দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। এগিয়ে এসে কাপ-প্লেট তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, —আপনি আজ তাড়াতাড়ি খাবেন তো?

—খেতে পারি।

—ফ্রিজে মুরগি আছে, স্টু বানিয়ে দেব?

—লাগবে না। যা আছে তাই খাব।

তাপসী আর কথায় গেল না। বাধ্য পরিচারিকার মতো চলে যাচ্ছে। শুভময় তাপসীর যাওয়াটা দেখছিল। মেয়েটা আগে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তাও একটু জোর খাটাত, রবিবারের পর থেকে কোনও ব্যাপারেই আর নাক গলাচ্ছে না। তবে একই রকম যান্ত্রিক কুশলতায় কাজ করে যাচ্ছে। শুভময়ের মাঝে মাঝে ধন্দ জাগে, মেয়েটার মধ্যে আদৌ অনুভূতি বলে কিছু আর আছে কী? মান অভিমান? অনুরাগ বিরাগ? মানুকেও বেশি কাছে ঘেঁষতে দেয় না আজকাল। বোধহয় ভাবে শুভময় বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়িয়েও দিতে পারে। পেট আর আশ্রয়ের বাইরে এখন বুঝি আর কিছু ভাবার ক্ষমতাই নেই তাপসীর।

বাইরে গাড়ির আওয়াজ। শুভময় উৎকর্ণ হল। তার কাছে কেউ এল কি? নাকি ডাক্তারবাবু ঘুরে এলেন কোনও কারণে?

বাইরে পরিচিত কণ্ঠ। চন্দ্রচূড় চৌধুরী। স্যার স্যার বলে হাঁক পাড়ছিল, দরজা খোলা দেখে ঢুকেই পড়েছে।

—আসতে পারি?

শুভময় বিরস মুখে বলল, —এসেই তো গেছেন। আর পারমিশান নেওয়ার দরকার কী?

—আপনার শুনলাম শরীর ভাল নেই? পথে আপনার হোমগার্ড ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। বলল, ওষুধ কিনতে যাচ্ছে... মিত্তির ডাক্তার নাকি এসেছিল...?

—নাথিং সিরিয়াস। আপনাকে ওরিড হতে হবে না। শুভময়ের চোয়াল শক্ত, —আপনি হঠাৎ কী মনে করে? আপনার প্রথম কিস্তি তো আমি মাইনে পাওয়ার পর দেব বলেছি। তার জন্য আসারও প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসব।

—ছি ছি ছি, আপনি আমায় মহাজন ঠাওরালেন নাকি? সোফায় বসে কপাল মুছছে চন্দ্রচূড়। ভারী গলায় বলল, —আমি একটা অন্য ব্যাপারে এসেছি। আপনারই স্বার্থে।

শুভময়ের দৃষ্টি স্থির।

—আজ মামলা করতে সদরে গেছিলাম। সেখানে একটা খুব খারাপ সংবাদ পেলাম। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার নামে একটা কমপ্লেন গেছে।

—আমার নামে?

—আপনি নাকি আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে দুর্জয় সামন্তর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।

পলকে শুভময়ের মনে হল কেউ যেন এক খাবলা কাদা ছুড়ে মারল মুখে। তাকাতে কষ্ট হচ্ছে, কান ভোঁ ভোঁ, দুর্গন্ধময় পাঁকে আটকে আসছে নিশ্বাস। অপবাদটা লেগেই গেল শেষ পর্যন্ত? আর কি, এবার ধর্ষকের তকমাটাও গলায় ঝুলিয়ে নিলে হয়!

ফ্যাসফেসে গলায় শুভময় বলল, —কমপ্লেনটা কে করেছে? দুর্জয় সামন্ত?

—নিশ্চয়ই তাই। কেউ হয়তো উসকিয়েছে, তাই হয়তো গরম খেয়ে...। সি-জে-এম অবশ্য আমার কাছে সেভাবে ভাঙলেন না।

—আপনি সি-জে-এমকে মিট করেছিলেন?

—উনিই আমায় ডেকেছিলেন চেম্বারে। ইনফরমালি জিজ্ঞেস করছিলেন। চন্দ্রচূড়ের ঠোঁটে চিলতে হাসি ফুটল, —আপনি তো আমায় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মানেন না, আমি কিন্তু আপনার ভালই করে এসেছি। সাফ বলে দিয়েছি, অল বকোয়াস। আপনার মতো সাধুচরিত্র মানুষের সম্পর্কে এমন মিথ্যে অভিযোগ শুনতেও আমার গা রি রি করছে।

কাদাটা কি শুকোচ্ছে মুখে? চামড়া চড়চড় করে কেন?

চন্দ্রচূড়ের গলা খাদে নেমেছে হঠাৎ, —আমাদের টাকা দেওয়া-নেওয়ার প্রসঙ্গটাও আমি একদম চেপে গেছি স্যার।

—টাকা দেওয়া-নেওয়া বলছেন কেন? শুভময় ফুঁসে উঠল, —ইটস আ লোন। আই শ্যাল রিপে ইউ।

—বটেই তো। ধারই তো।... তবু আমি প্রসঙ্গটা আটার করিনি। কে কী কদর্য অর্থ করে, তার ঠিক কী! আপনিও কথাটা মাথায় রাখবেন স্যার। যদি প্রাইমা ফেসি এনকোয়ারি হয়ও, আপনি স্বচ্ছন্দে লোনের ব্যাপারটা ডিনাই করতে পারেন। তারপর দেখি সামন্তর পোর নালিশ কেমন টেকে!

শুভময় সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, —কিন্তু দুর্জয় সামন্ত আমাদের ট্রানজ্যাকশানের খবর পায় কী করে?

—আপনি ভুল ভাবছেন স্যার। আমি কাউকে কিচ্ছু বলিনি। চন্দ্রচূড় গম্ভীর, কথা গিলে রাখাটাই আমাদের এথিকস্। কিন্তু ... কিছু মনে করবেন না স্যার, এই নীতিজ্ঞান আপনাদের সরকারি লোকেদের নেই। আমি আপনাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম, পরেশ জানাকে টাকার কথা বলে আপনি ভাল করেননি।

শুভময়ের চকিতে মনে পড়ল, পরেশ মাঝেও একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল বটে শুভময়ের টাকাটার আর প্রয়োজন আছে কিনা। শুভময়ই তাকে জানিয়েছিল, দরকার মিটে গেছে। তাতেই কি দুয়ে দুয়ে চার করল পরেশ?

ঢোক গিলে শুভময় বলল, —তার মানে আপনি বলছেন পরেশই ...?

—হতেই পারে। পরেশ একটা স্ট্রং পসিবিলিটি। আপনাকে সে খুব একটা পছন্দও করে না। পরেশই হয়তো ওর আন্দাজের ঢিলটা মার্কেটে বিক্রি করেছে।

—কিন্তু পরেশ আন্দাজই বা করবে কী করে, আপনার থেকেই আমি ...?

—ছোট শহরের চোখ কান খুব শার্প হয় স্যার। আপনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ দেখেছে। নিজেকে আপনি যতই ক্ষুদ্র ভাবুন না কেন, মহকুমা শহরে আপনি একজন পাবলিক ফিগার, অনেকেই আপনাকে চেনে। সুতরাং খবরটা রটেওছে। হয়তো আমার মুহুরিই পরেশকে গপ্পো করেছে। যে মানুষ কস্মিনকালে কোনও ল'ইয়ারের বাড়ি যায় না, সে হঠাৎ কেন চন্দ্রচূড় চৌধুরীর চৌকাঠ পেরোল, তাই নিয়েও নিশ্চয়ই জল্পনা কল্পনা চলেছে কিছু। আপনার ভবানীকে বাজিয়ে দেখবেন, সেও হয়তো জানে। এই যে আমি এখন আপনার বাংলোয় এসেছি, এ খবরও কি কোর্ট চত্বরে খুব গোপন থাকবে? বসন্ত আমায় দেখল, সে হয়তো কিছু না ভেবেই

কাউকে গল্প করল, সেখান থেকে একজন শুনল, তারপর আর একজন ...। আপনি যদি ফ্রিলি সবার সঙ্গে মেশামেশি করতেন, তা হলে হয়তো এই আসা যাওয়া নিয়ে কেউ ভাবতই না ...। অর্থাৎ সততা বজায় রাখার জন্য নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রবণতাই আপনার বিপদের কারণ।

কীই তর্ক করবে শুভময়? অসহায় একটা ক্ষোভ গুড়গুড় করছে বুকে। আহত স্বরে বলল, —দুর্জয়বাবুরাই বা ভাবলেন কী করে, আমি ইচ্ছে করে ওদের এগেনস্টে রায় দিয়েছি? এভিডেন্স প্রুফ সবই তো...

—ওসব কে বোঝে! হারলে কি মাথার ঠিক থাকে? একে ফ্যামিলি প্রেস্টিজ, তায় আবার নিজের মেয়ের ব্যাপার। যে মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে টর্চারড হয়েছে।

—আপনিও স্বীকার করছেন নির্যাতন হয়েছিল?

—অবশ্যই। কোর্টের বাইরে মিছে কথা বলব কেন? আমি দুর্জয়ের হয়ে কেস লড়লে অধীর মাইতি আর তার বউ ছেলেকে মিনিমাম এক বছর জেলের ঘানি টানতে হত। তবে হ্যাঁ, সরকার পক্ষ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আপিল করলে আমি অধীরের হয়েই লড়ব।

—আর আমার রায়ের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? আমি আপনাকে ফেভার করেছি?

—তাই কখনও ভাবতে পারি? তা হলে তো আমার নিজের এবিলিটিকে ছোট করা হয়।

কথা শেষ করতে হল আচমকা। বসন্ত ফিরেছে। তার কাছ থেকে ওষুধপত্র বুঝে নিল শুভময়। উঠে পড়েছে চন্দ্রচূড়ও। যাওয়ার আগে বারংবার বলে গেল, শুভময়ের সামান্যতম অনিষ্ট সে করবে না, এখনও শুভময়কে সে শ্রদ্ধার আসনেই বসিয়ে রেখেছে, এবং বিপদে আপদে সে শুভময়ের পাশেই থাকবে। সুতরাং শুভময় নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোক।

শুভময়ের মাথার দপদপানিটা বাড়ছিল ক্রমশ। কী অসম্মান, কী অসম্মান! শুধু কোনও এক দুর্জয় সামন্ত তার দিকে অভিযোগের তির হেনেছে বলে নয়, চন্দ্রচূড়ের আশ্বাসবাণীও যেন বিষজ্বালা ছড়াচ্ছে শরীরে। সে সৎ, না অসৎ, তাও এখন নির্ধারিত হবে চন্দ্রচূড়ের সার্টিফিকেটে? যে লোকটার নীতিজ্ঞানের এমনই বহর, মেয়েটা অত্যাচারিত হয়েছে জেনেও, চোয়ালে চোয়াল কষে তার সুবিচার পাওয়ার আকুতিকে পিষে মারতে লড়াই চালায়! রাশি রাশি মিথ্যের মালা গাঁথে! ইশ, কেন যে সে উল্টো রায় দিল না! কী যে বিভ্রম জেগেছিল তখন!

ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল শুভময়। বুকের গহনে লক্ষ পিঁপড়ের ওঠানামা। কমপ্লেন্টের কপি কি হাইকোর্টে গেছে? চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অনিরুদ্ধ বসুর ওপর দায়িত্ব পড়েছে তদন্তের? নাকি অনিরুদ্ধদা নিজে থেকেই খোঁজখবর নিচ্ছেন? শুভময়ের অমলিন সার্ভিস রেকর্ডে কোনও দাগ পড়বে না তো? অনিরুদ্ধদা কী ভাবছেন শুভময় সম্পর্কে? বিশ্বাস করছেন অভিযোগটাকে? উঁহু, না করারই তো কথা। শুভময়কে তিনি ভালমতোই চেনেন, রামপুরহাটে একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন। কিন্তু যদি তাঁর ক্ষীণ সন্দেহও জাগে? উকিলদের তো অনিরুদ্ধদা হাড়ে মজ্জায় চেনেন, তাদের সত্যবাদিতার ওপর কতটা আস্থা আছে তাঁর? যদি ভেবে বসেন মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ! একবার কথা বলবে কি অনিরুদ্ধদার সঙ্গে? এখনই?

কিন্তু ... অনিরুদ্ধদা তো এখনও শুভময়কে অভিযোগের কথাটা জানাননি! যেচে ফোন করলে অনিরুদ্ধদা তো বুঝেই ফেলবেন চন্দ্রচূড় খবরটা দিয়ে গেছে শুভময়কে! এতেই কি ধরে নেওয়া যায় না চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে শুভময়ের দহরম মহরম আছে?

নাহ্, অন্য কোনও ছুতোয় ফোন লাগাতে হবে। পি-এফ লোনের অর্ডার সদর অফিসে এল কিনা জানার অছিলায় যদি ...? অনিরুদ্ধদা নিজে থেকে তখন কথাটা তুললেন তো তুললেন, নইলে শুভময়ও উচ্চবাচ্য করবে না। আর যদি কথাটা উঠেই যায়, শুভময় পরিষ্কার বলে দেবে, কখনই ঘুস নিয়ে সে কোনও জাজমেন্ট দেয়নি।

শুভময় ফের এল বাইরের ঘরে। টিপছে অনিরুদ্ধ বসুর বাড়ির নাম্বার। বোতাম টেপা শেষ হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। এ তো ঋতির ফ্ল্যাটের নাম্বার!

রিং বাজছিল। শুভময় রিসিভারটা ক্রেডলে চেপে ধরল। কাঁপছে।

সতেরো

বিকেল থেকেই ঈশান কোণে মেঘ জমছিল। সন্ধের মুখে ঘন হয়ে এল আকাশ। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে, ধেয়ে আসা বাতাস শীতল সহসা। তারপরই প্রমত্ত আঁধি। শুকনো পাতা উড়ছে ধুলোয়, কাঠিকুটি ভাসছে, কাগজের টুকরো, ছেঁড়া প্লাস্টিক নাচছে মাতালের মতো। দেখতে দেখতে ধুলোর ধোঁয়ায় দশ দিক অন্ধকার। পথচারীরা ছুটছে এলোপাথাড়ি, খুঁজছে নিরাপদ আশ্রয়। কোটি

কোটি ভারী জলকণা কাচের গুলির মতো আছড়ে পড়ছে পিচরাস্তায়, ভেঙে ছেতরে যাচ্ছে। ঝড়ের ঝাপটায় বারিধারা এতালবেতাল।

ঋতি গড়িয়াহাটের দোকানটায় দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছিল ঘন ঘন। কপালে উদ্বেগের ভাঁজ। চৈত্রের গোড়াতে এমন একটা কালবৈশাখী না এলে কি চলছিল না? পাপিয়া টুম্পাকে বলে রেখেছে নতুন দোকানের হাল দেখে ফিরবে পুরনো মায়াবিনীতে, কিন্তু এখন সে যায় কী করে? এই যে মুষলধারা নামল, এক্ষুনি কি থামবে?

কাঠের মিস্ত্রিদের আজকের মতো কাজ শেষ। দিনের দিন পেমেন্ট, আজকের মজুরি মিটিয়ে দিয়েছে ঋতি, এখন তারাও বেরনোর জন্য অধীর। দলনেতা সদানন্দ দোকানের বাইরে হাত মেলে বৃষ্টির তেজ পরখ করে নিল একবার, দামাল হাওয়ার ঝাপটা খেয়ে সরে এল পরক্ষণে।

মেঝেয় অর্ধসমাপ্ত কাঠের ফ্রেম। বাহারি শোকেস হবে পিছনের দেওয়ালে। ঋতি কোমরে হাত দিয়ে কাজটা দেখছিল। টাকায় কুলোনো যাবে না বলে অঙ্গসজ্জার পরিকল্পনা অনেকটাই ছেঁটে ফেলেছে, তবু এখনও কত কী বাকি। এরকম আরও দুটো কাঠামো তৈরি হবে, পালিশ পড়বে, কাচ লাগবে ...। আরও কিছু সূক্ষ্ম কাজ আছে, তারাও সময় খাবে। নাহ্, চৈত্রসেলটা এবার আর ধরা গেল না। দোকান উদ্বোধন হতে হতে সেই বৈশাখ। আপন মনে বিষণ্ণ হাসল ঋতি। তার মতো নিষ্ফলা মেয়ের কোনও মনোবাসনাই কি সফল হয় শেষ পর্যন্ত? হয়েছে কোনওদিন?

হঠাৎ হুড়মুড় করে কে একজন ঢুকে পড়ল দোকানে! চমকে ঋতি দেখল, সোমদত্ত! বৃষ্টিতে একদম ভিজে জাব, জামাকাপড় সপসপে, জল বাইছে গা মাথায়।

শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর সোমদত্তর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমে গেছে। মুখোমুখি হলে সোমদত্ত যেন খানিকটা আড়ষ্ট থাকে। হয়তো বা ঋতিও। এখনও দিনে তিন চারটে এস-এম-এস করে বটে সোমদত্ত, তবে উচ্ছ্বাসের বহর অনেকটাই স্তিমিত। বন্ধুত্বের মধ্যিখানে শরীর ঢুকে পড়লে আর কি অবিকল পুরনো অবস্থানে ফেরা যায়?

তবু ঋতি সহজ থাকে সাধ্যমতো। আজ আগের মতোই চোখ পাকাল, —তুই কোত্থেকে?

সোমদত্ত অপ্রতিভ মুখে বলল, —আন্দাজে আন্দাজে। ভাবলাম তুমি হয়তো এখনও এই দোকানেই আছ ...

—তার জন্য কাকভেজা হয়ে আসতে হবে? কোথাও একটা দাঁড়াতে পারতিস না?

—আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগে। তোমার লাগে না?

তিন মিস্ত্রি ড্যাবডেবিয়ে দেখছে সোমদত্তকে। দৃষ্টিটা সোমদত্তকে নয়, ঋতিকে বিঁধছিল। গলা ভারী করে বলল, —আমার অত বিদ্‌ঘুটে শখ নেই, ওসব তোর মতো বাচ্চাদেরই মানায়।

সোমদত্ত গোমড়া হয়ে গেল। নীরবও। জিনসের পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘষে ঘষে মাথা মুছছে। রুমাল পলকে ন্যাতা, দোকানের বাইরে হাত বাড়িয়ে নিংড়োল রুমালটা। গেঞ্জির ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিল মোবাইল, বার করে দেখল একবার। হাতেই রাখল। আঙুল চালাচ্ছে চুলে, চিরুনির দাঁড়ার মতো। চোখ ঘুরছে ঘরময়, ঋতিকে এড়িয়ে।

ঋতির হাসি পেয়ে গেল। বাচ্চা বললে সোমদত্ত ভারী ব্যথিত হয়, কী করবে তার দিশা পায় না। প্রাজ্ঞজনোচিত হাবভাব দেখাতে গিয়ে তার ছেলেমানুষি যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনের সেই ভোরের সোমদত্তকে তখন খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

কালবৈশাখীর বৃষ্টি আসতে যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। ধারাপাত কমেছে, তবে এখনও পড়ছে ঝিরঝির। সদানন্দ বলল, —এবার তা হলে আমরা যাই দিদি?

—পুরো থামা অব্দি অপেক্ষাও করতে পারো।

—এই বৃষ্টি গায়ে লাগবে না। দিনভর যা গরম ছিল, ঝড়জল এসে তাও তাপ জুড়োল।

—কাল তোমরা আসছ কখন? পাক্কা নটায়?

—আমরা কোনও দিন লেট করি?

—তোমরা লেটলতিফ তো কাজে। ঋতি স্বরে গাম্ভীর্য আনল, —কালকের মধ্যে ফ্রেম আমার রেডি চাই। কাচের সাইজগুলোও দেবে, দোকানে অর্ডার দিয়ে কাটাতে হবে।

—সানমাইকার শেড কার্ড আনব?

—এনো।

ব্যাগ ঝোলা গুছিয়ে রওনা দিল তিন মূর্তি।

ঘর ফাঁকা হতেই চাপা গুমোট। ঋতি বাইরেটা দেখছিল। অল্প ভিজে ভিজে চলে যাবে? কিন্তু ঘাম বসে সর্দি মতো হয়েছে, দুম করে বিছানায় পড়ে গেলেই চিত্তির, কাজের একেবারে দফারফা।

সোমদত্তও বুঝি কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। আচমকা বলে উঠল, —দেওয়ালের রং-টা তো বেশ হয়েছে! অয়েল পেন্ট করালে?

ঋতি অকারণে হেসে উঠল জোরে, —তুই কি কিছুই চিনিস না? এটা ডিসটেম্পার।

সোমদত্ত আড়চোখে হাসিটা দেখল। কপাল কুঁচকে বলল, —অয়েল করালেই পারতে। আরও গ্লেজ মারত।

—দুৎ, আমার অত পয়সা কোথায়? মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই ঋতি সাবধানী হল। তাড়াতাড়ি বলল, —ডিসটেম্পারই বা মন্দ কী। বেশি চকচকে আমার পছন্দ হয় না।

সোমদত্ত সরাসরি ঋতির চোখে চোখ রাখল, —আমার কিন্তু লোনটা স্যাংশান হয়ে গেছে।

ঋতি চোখ সরিয়ে নিল। হালকা স্বরেই বলল, —ভাল তো। তবে এক্ষুনি এক্ষুনি তুলিস না। দরকার হলে চেয়ে নেব।

—আমি কিন্তু কালই তোমায় এনে দিতে পারি।

—বললাম তো, এখন থাক। লাগলে নিশ্চয়ই নেব।

—তুমি আমার টাকাটা বোধহয় আর নিতে চাইছ না, তাই না?

অপ্রিয় প্রসঙ্গটা এসেই গেল। ঋতি নখ খুঁটছে। দৃষ্টি মেলল বাইরে, মুখে ব্যস্ততার ভান।

সোমদত্ত বলল, —আমি কিন্তু এখনও তোমার বন্ধুই আছি ঋতি।

বাইরে তাকিয়েই ঋতি বলল, —জানি তো। আমি কি অস্বীকার করেছি?

—তা হলে আমায় পর পর ভাবছ কেন?

কী করবে ঋতি, কাউকেই যে এখন তার তেমন আপন বলে মনে হয় না! শুভময়ই তাকে দূরে ঠেলে দিল, আর এ তো সোমদত্ত! তবু যেন সোমদত্তকে দেখে মায়া জাগছিল ঋতির। কষ্ট হচ্ছিল। আহা রে, ছেলেটার সরল আবেগকে কেন সে আঘাত করবে? প্রত্যাখ্যানের জ্বালা তো এখন তার অজানা নয়।

চোখ ফেরাল ঋতি। হাত ধরেছে সোমদত্তর, —তুই ওভাবে নিচ্ছিস কেন? ... দ্যাখ্, সারাটা জীবন তো পরের ঘাড়ে চেপেই কাটিয়ে দিলাম। এবার নয় নিজের মতো করে একটু চেষ্টা করি। অনেক তো হাত পাতলাম, আর কেন! গয়নাগুলো বেচে কিছু টাকা এসেছে। ভেবেছিলাম পুরনো মায়াবিনীটাও রেখে দেব, টুকটাক অন্য কিছু করব ওখানে, আলটিমেটলি ছেড়েই দিচ্ছি। বাড়িঅলার কাছে কুড়ি হাজার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট ছিল, ফেরত নেব।

ওখানকার ফার্নিচার টার্নিচারগুলো বিক্রি করেও পাব কিছু। এসব মিলিয়ে যদ্দূর পারি, তাই না হয় করি আপাতত। ঋতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, —আমার বরের সব টাকাও শোধ করে দেব আস্তে আস্তে। এই মায়াবিনীর, পুরনো মায়াবিনীর ...। আমি স্থির করে ফেলেছি, কারও কাছে ঋণ রাখবও না, নতুন করে ঋণ বাড়াবও না। ... আমার এই মাথা তোলার ইচ্ছেটাকে তুই একটুও সমর্থন করবি না?

সোমদত্ত কী বুঝল কে জানে, চুপ করে ঋতিকে দেখল একটুক্ষণ। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, —তুমি এখন যাবে কোথায়? বাড়ি?

—একটু বুড়ি ছুঁয়ে যেতে হবে রে। মেয়ে দুটো বুটিকে আমার জন্য ওয়েট করছে। ... তুইও আজ কেটে পড়। বাড়ি গিয়ে জামাকাপড় চেঞ্জ কর আগে। ঠান্ডা লেগে শেষে মরবি নাকি!

বাষ্পমাখা বাতাসের মতো হাসল সোমদত্ত, —হুঁ। যাই।

—দু' মিনিট দাঁড়া। একসঙ্গে বেরোব।

বাইরে পৃথিবী ভারী নরম হয়ে গেছে এখন। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা, তবে যেন গায়ে লাগে না। বাতাস শান্ত অনেক, বইছে ঝিরঝির। জলবিন্দুর প্রলেপ মেখেছে নাগরিক আলো, মায়াবী দ্যুতির প্রতিফলন সিক্ত পথঘাটে। এমন সন্ধেয় মনটাও বড় ভেজা ভেজা হয়ে যায়।

গড়িয়াহাট মোড়ে এসে ঋতি রাস্তা পার হল। একটু হেঁটে অটোরিকশা ধরবে কসবার। উল্টো ফুটপাথে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়েছে। ওপারে অপেক্ষমাণ বাসযাত্রীর ভিড়। থইথই লোকারণ্যের মাঝে সোমদত্তকে দেখতে পেল ঝলক। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোথ্থাও তার যাওয়ার নেই!

আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল ঋতির। সোমদত্ত তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। শান্তিনিকেতনে খোয়াইয়ের সেই ভোরই তো তাকে বোঝাল শুভময় এখনও তার কাছে কতখানি। সোমদত্ত তাকে দুঃখও কম দেয়নি। নিজেকে চিনতে না পারলে ঋতি কি সেদিন স্বয়মাগতা হয়ে শুভময়ের কাছে যেত! অত বড় অপমানটাও তাকে সইতে হল তো! শুভময় তাকে ছুঁল না পর্যন্ত!

ঋতি এগোচ্ছে অবসন্ন পায়ে। ভেজা পথ মাড়িয়ে। ঠোক্কর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে।

সোমদত্ত পড়ে রইল পিছনে। হয়তো বা শুভময়ও।

টিভিতে খেলা চলছে। পুরনো একটা ক্রিকেট ম্যাচ। ভারত নিউজিল্যান্ডের। টেস্ট খেলা। ঢিমে তেতালা মেজাজ। ওভারের পর ওভার

মেডেন যাচ্ছে। অলস পায়ে রান-আপে পৌঁছচ্ছে বোলার, দৌড়তে হয় বলেই যেন দৌড়তে দৌড়তে এসে কাঁধ ঘোরাচ্ছে, নিখুঁত ব্লক করছে ব্যাটসম্যান, হেঁটে হেঁটে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে ফিল্ডার। ঠিক যেন স্লো মোশানের ছবি, এমনই শম্বুকগতি।

শুভময় খেলাটা দেখছিল। পাশে খালি প্লেট, চিকেন সুপের শূন্য বাটি। রতন যে দেশ থেকে ফিরেছে, সুপের স্বাদেই মালুম হয়। কাল এসেই জেনে ফেলেছে এখন একেবারেই তেলমশলা খাচ্ছে না শুভময়, তাই কোর্ট থেকে ফেরার পরও এই ট্যালটেলে খাদ্যবস্তুটির আয়োজন।

এখন অবশ্য শুভময়ের শরীর বেশ চাঙ্গা। মাথার যন্ত্রণাটা গেছে, ঘাড় ব্যথাও ভোগাচ্ছে না আর, ঘুমও হচ্ছে মোটামুটি। একটু হয়তো ছেঁড়া ছেঁড়া, তবু হচ্ছে। ই-সি-জি রিপোর্টেও হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকলাপে কোনও দোষ ধরা পড়েনি, সুগার কোলেস্টেরলও বিপদসীমার নীচে, প্রেশারও নিম্নমুখী। বসন্ত স্থানীয় এক কম্পাউন্ডারকে ঠিক করে দিয়েছিল, সে এসে দেখে যায় রক্তচাপ। কালও প্রেশার মাপা হল। একশো চল্লিশ বাই নব্বই।

শুভময়ের মনও থিতু হয়েছে একটু। তাকে আর ফোন করতে হয়নি, অনিরুদ্ধ বসুই মেদিনীপুর থেকে দূরভাষে যোগাযোগ করেছিলেন শুভময়ের সঙ্গে। তিনিই জানিয়েছেন, একটা অভিযোগ তাঁর কাছে পৌঁছেছিল ঠিকই, তবে তিনি আদৌ আমল দেননি। কাকে কান নিয়েছে বললেই কাকের পিছনে দৌড়তে হবে! বিচার বিভাগের অত ফুরসত নেই। তা ছাড়া চন্দ্রচূড় যখন স্পষ্ট ভাষায় টাকার কথা অস্বীকার করছে, প্রমাণ টমাণও নেই কোনও, তবে আর কীসের এনকোয়ারি!

প্রভিডেন্ড ফান্ডের চেকটাও পেয়ে গেছে শুভময়। এক লক্ষ সতেরো হাজার। পুরো টাকাটাই শুভময় ধরে দিয়েছে চন্দ্রচূড়কে। এখন থেকে মাসে সাত সাড়ে সাত হাজার করে শোধ করলে দু' বছরে দেনা শেষ। এককলপ্তে এতটা দিয়ে দিতে পারল, এতেও তো অনেকটা মুক্তি।

অর্থাৎ সবই এখন ভালর দিকে। তবু পুরোপুরি শান্তি আসে কই? কেন যে বুকের গভীরে শুকনো বাতাস বয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ? ঋতির কারণে কী? এখান থেকে যাওয়ার পর একবারও ফোন করেনি ঋতি। না করারই কথা অবশ্য। তবু যে কেন ক্ষীণ আশা জাগে মাঝে মাঝে? সে নিজেই বা কী করছে? কতবার তো রিসিভার তুলল, ফোনটা করতে পারল কী? সেদিন রিং শুনেই ত্রস্ত হাতে কেটে দিল! কীসের ত্রাস? নাকি এ পাপবোধের গ্লানি?

শুভময় কিছুতেই ঠিক চিনতে পারছে না প্রতিবন্ধটাকে। ঋতি কোনও দিন কি জানতে পারবে তার স্খলনের কাহিনী? তবে কীসের দোলাচল?

একটা চার মারল ভারতীয় ব্যাটসম্যান। নিউজিল্যান্ডের ফাঁকা গ্যালারিতে হাই তুলতে তুলতে হাততালি দিচ্ছে জনা কুড়ি দর্শক। বাউন্ডারি হাঁকিয়েই খেলোয়াড় ক্লান্ত, ছুটে তাকে জল দিয়ে গেল একজন। পরদায় ভেসে উঠল স্কোর কার্ড, রানটা পড়ার চেষ্টা করল শুভময়। পারছে না, ধেবড়ে যাচ্ছে লেখা।

অভ্যাসবশত তাপসীকে ডাকতে গিয়েও শুভময় সামলে নিল। গলা ওঠাল, —রতন ...? আমার চশমাটা দিয়ে যা তো।

রতন এনেছে চশমা। পরে নিয়ে ফ্রেমটা একটু নাড়ল শুভময়। বাইফোকাল লেন্স, দূরের পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ। এইটুকুর জন্যই অসুবিধে হচ্ছিল? এবার থেকে সারাক্ষণই চশমা পরে থাকতে হবে নাকি?

পাশে দাঁড়িয়ে আছে রতন। গলা খাকারি দিয়ে বলল, —একটা কথা ছিল স্যার।

কাল ফেরার পর থেকেই কিছু না কিছু কথা থাকছে রতনের। এসেই তো জানাল চৈত্র মাসে কাজে ফিরছে বলে বাবা মা নাকি খুব রাগারাগি করেছে, বাংলা বছরের শেষ তেরাত্তির তাকে নাকি দেশের বাড়ি গিয়ে থাকতেই হবে। আর একবার বলল, পরের বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়িতে কী পুজো টুজো আছে, এক বেলার জন্য তার না গেলেই নয় ...!

শুভময় চোখ তেরচা করল, —আবার কী হল? শালির বাড়ি নেমন্তন্ন?

—না স্যার। তাপসীদি খুব চলে যাওয়ার জন্যে জেদ করছে। কাল ভোরেই।

ঈষৎ নাড়া খেয়ে গেল শুভময়, —সে কী? আমায় কিছু বলেনি তো!

—জানাবে স্যার। বলছিল, আপনার অনুমতি নিয়ে নেবে।

ওকে একবার ডেকে দে তো বলতে গিয়েও শুভময় কোঁত করে গিলে নিল কথাটা। রতনের উপস্থিতিতে তাপসীকে কিছু জিজ্ঞেস করা কি সমীচীন? তাপসী এতদিন নীরব ছিল, যাওয়ার সময়ে যদি ফুঁসে ওঠে? একান্তই অবাস্তব ধারণা, তবু ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী! তা ছাড়া শুভময়ের ইচ্ছে আছে তাপসীকে বাড়তি কিছু টাকা দেওয়ার, সেটা রতনের সামনে ...!

শুভময় গলা সহজ রেখে বলল, —সে গেলে যাবে, আমার বলার কী আছে! ... তুই আমার পার্স আর প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে আয় তো। প্রেশারের ওষুধ বোধহয় ফুরিয়ে গেছে, এনে দে।

রতন যেতেই তাপসীকে তলব। গুটিগুটি পায়ে এসেছে তাপসী। দাঁড়িয়ে আছে মাথা নামিয়ে।

শুভময় সোফায় ঠেসান দিল, —মানু কোথায়? তাকে দেখছি না যে?

—বসন্তদার ঘরে। খেলা করছে।

—তুমি নাকি কালই চলে যেতে চাইছ?

—হ্যাঁ।

—এত তাড়াহুড়োর কী ছিল? তোমার মা তো এখনও ফেরেননি?

—আমি হাউরেই যাব। ছোড়দিদির বাড়ি। মাকে ডেকে আনব।

—এত হ্যাঙ্গাম হুজ্জোতের প্রয়োজন ছিল কী? আরও কিছু দিন থেকে যেতে পারতে।

—রতনভাই তো এসে গেছে, আপনার অসুবিধে হবে না।

—আমার কথা নয়, আমি তোমার সম্পর্কে বলছি।

—ব্যবসাটার খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে স্যার। মাকে এনে আবার ভাবছি কাজটা শুরু করি। তা ছাড়া মানুর বাবা যদি মানি অর্ডার পাঠায়, ঘর বন্ধ দেখে টাকা ফিরে যাবে ...

—তোমার কি মনে হয় মা থাকলে ঘরে আর হামলা হবে না?

—হলে তো আপনি আছেন।

কথাটা এমন অকপটে উচ্চারণ করল তাপসী, শুভময়ের গা শিরশির করে উঠল। একটুক্ষণ স্থাণু বসে থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল, —এক সেকেন্ড। আমি আসছি।

শোওয়ার ঘরের আলমারি থেকে চারটে পাঁচশো টাকার নোট নিয়ে ফিরল শুভময়। তাপসীকে ধরিয়ে দিয়ে বলল, —এটা রাখো।

টাকাটা হাতে নিয়ে যেন কেঁপে গেল তাপসী, —এত কেন?

—বেশি কী দিলাম! ওর মধ্যে হাজার টাকা তো তোমার মাইনে। রতনকেও তাই দিই।

—আর বাকিটা?

—ওটা থাক তোমার কাছে। ... কবে তোমার বর টাকা পাঠায়, না পাঠায়...

এই প্রথম শুভময়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াল তাপসী। দুটো পাঁচশো টাকার নোট টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, —মাপ করবেন স্যার। আমি নষ্ট মেয়েমানুষ নই।

স্বর একই রকম নম্র, তবে ইস্পাতের ফলার মতো দৃঢ়। শুভময়ের প্রখর

ব্যক্তিত্বও কুঁকড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, —আহা, আমি কি তাই বলেছি? ওটা থাক না।

—চিন্তা করবেন না স্যার। আমি কখনই আপনার বদনাম করব না। তাপসী একটু থমকে থেকে বলল, —কিছু ঘটে গিয়ে থাকলেও না।

শুভময় আমূল নাড়া খেয়ে গেল। আশ্চর্য, এই ভয়ংকর সম্ভাবনার কথাটা তো দুঃস্বপ্নেও মাথায় আসেনি!

নার্ভাস গলায় শুভময় বলল, —কী হবে তা হলে ... তখন ...?

—ও ভাবনাটাও আমারই থাক স্যার।

কী অকম্পিত স্বর! একটা দরিদ্র অশিক্ষিত স্বামীপরিত্যক্ত মফস্সলের দুঃখী মেয়ে কোত্থেকে এত মনের জোর পায়? এ কি শুভময়ের প্রতি শ্রদ্ধা? কৃতজ্ঞতা? প্রেম?

শুভময় অস্থির বোধ করছিল। বসল একবার, দাঁড়াল, আবার বসল। আচমকা খপ করে টাকাটা তুলে নিয়ে আবার গুঁজে দিয়েছে তাপসীর হাতে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, —আমি তোমায় নষ্ট করেছি তাপসী। টাকাটা তুমি রাখো। ধরে নাও, এ আমার পাপের খেসারত।

—পাপ পুণ্য আমি বুঝি না। পাপ তো মানুষের মনে। আপনার অন্তর যদি বলে, আপনি কোনও পাপ করেছেন, তবে আপনি তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। আমাকে কেন আপনার পাপের ভাগী করছেন?

টাকা রেখে, নত মুখে, শান্ত পায়ে চলে গেল তাপসী।

শুভময়ের সর্বাঙ্গে কেউ যেন চাবুক মারছিল। সপাং। সপাং।

আঠারো

রাত গভীর।

স্টাডিতে বসে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে এক মনে চিঠি লিখছিল শুভময়। একটা নয়, পরপর দুটো।

প্রথমটা অনিরুদ্ধ বসুকে। শুভময় মৈত্র জানাচ্ছে, সরকারি বিধির পরিপন্থী জেনেও ক্রিমিনাল লইয়ার চন্দ্রচূড় চৌধুরীর কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নিয়েছে সে। উৎকোচ নয়, ধার হিসেবে। দুর্জয় সামন্তর মেয়ের ওপর নির্যাতনের বিচারকালে এই অর্থ গ্রহণের কোনও প্রভাব পড়েছে কিনা সে ব্যাপারে শুভময়

মৈত্র নিশ্চিত নয়। রায়দান পর্বে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চন্দ্রচূড় চৌধুরীর কথা তার মাথায় অবশ্যই ছিল, এই সত্য সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করছে।

কী হবে এই চিঠির পরিণাম? চাকরি জীবনে কালো ক্ষত? তাতেই বা শুভময়ের এখন কী আসে যায়?

এবার দু' নম্বর চিঠি। ঋতিকে। ঠান্ডা মাথায় শুভময় লিখছে তার পতনের উপাখ্যান। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করছে তার ব্যভিচারের কাহিনী। কীভাবে সে কামার্ত জন্তুর মতো ভোগ করেছে একটি সরল মেয়েকে। এ চিঠিতে কণামাত্র মিথ্যে থাকলে শান্তি পাবে না শুভময়।

এর পর ঋতি কি আর ফিরবে? যদি তার সমস্ত বৃত্তান্ত জানানোর পরও ঋতি সম্পর্ক বজায় রাখে, তবেই তো সরবে পাঁচিলটা।

আর ঋতি যদি আরও আরও দূরে সরে যায়?

শুভময় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। নাহ্, আর ভাববে না। কাল সকালেই পোস্ট করতে হবে চিঠি দুটো। এখন ঘুম চাই। শান্তির ঘুম।